কবীর সুমন

নিশানের নাম তাপসী মালিক

নিশানের নাম তাপসী মালিক

কবীর সুমন

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৪১৭, ডিসেম্বর ২০১০
চতুর্থ সংস্করণ, মাঘ ১৪১৭, জানুয়ারি ২০১১
পঞ্চম মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪১৮

— একশ আশি টাকা —

প্রচ্ছদপট আলোকচিত্র : অরুণ চট্টোপাধ্যায়
প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা : মানস বাগ
গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত আলোকচিত্র : অভিজিৎ কুণ্ডু

NISHANER NAAM TAPASI MALIK

A socio-political treatise by Kabir Suman.
Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd.,
10 Shyama Charan De Street, Kolkata 700 073

Price Rs. 180 /-

ISBN : 978-93-5020-016-2

॥ বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ॥

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনও রকম পুনর্মুদ্রণ বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনর্ব্যবহার বা পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘন করলে লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও অটোটাইপ ১৫২ মানিকতলা মেন রোড,
কলকাতা ৭০০ ০৫৪ হইতে তপন সেন কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

- বন্ধু, গণ-আন্দোলনকর্মী অসীম গিরি।
- সব সংসদীয় দলের অতি সাধারণ সমর্থকদের যাঁরা দলীয় সংঘর্ষে প্রাণ হারান, ইজ্জত হারান, ঘর হারান।
- ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)'র নেতা কিষেণজিকে যিনি ভারত সরকারের সঙ্গে মাওবাদীদের প্রস্তাবিত শান্তি আলোচনায় একজন মধ্যস্থ হিসেবে আমার নাম ঘোষণা করে আমাকে সম্মানিত করেছেন।

ভূমিকা

পশ্চিমবাংলায় তিন দশকের ওপর রাজত্ব করতে পেরেছেন সি পি আই এম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট। ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থার জবাবে বাংলার মানুষ অনেক প্রত্যাশা নিয়ে বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতায় এনেছিল। প্রথম দিকে এই সরকার ও তাঁদের প্রধান দল সি পি আই এম রাজ্যের সাধারণ মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর ব্যাপারে রাজনৈতিক সদিচ্ছা দেখালেও ক্রমশই তাঁদের ক্রিয়াকলাপ ও মানসিকতা জনবিরোধীই হয়ে ওঠে। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবিরাম দলীয়করণ ঘটিয়ে, যে-করে হোক প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা চালিয়ে, কর্তৃত্বপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে এবং পেটোয়া লোকদের পাইয়ে দেওয়ার নীতি অনুসরণ করে সি পি আই এম দল ও তাঁদের সরকার ধীরে ধীরে একটা বড় লোকস্তর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে থাকেন, হারাতে থাকেন তাঁদের প্রথম দিকের জনপ্রিয়তা।

অপরদিকে বিরোধী দলগুলি থেকে যায় দুর্বল, কোন্দল-পরায়ণ, বিভক্ত এবং অসংগঠিত। তাছাড়া, সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বামপন্থীদের বিরোধীরা এত নিষ্প্রাণ, নিষ্ক্রিয়, কার্যক্রমহীন ও আবেদনহীন যে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কাজকর্মের বাইরে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে তাঁরা বামপন্থীদের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করবেন, সাংস্কৃতিকভাবে বামফ্রন্টের বিরোধিতা করবেন সেই ক্ষমতাও বিরোধীদের একেবারেই ছিল না। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পুলিশকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিজেদের হাতে এনে এবং ভোটার তালিকায় এদিক ওদিক থেকে শুরু করে পুরোপুরি দলীয় তত্ত্বাবধানে ভোট করানোর নিজস্ব পদ্ধতি তৈরি করে নিয়ে সি পি আই এম দল একটানা অনেকগুলি বছর শাসন-ক্ষমতায় থাকতে পারলেন। বিধানসভার নির্বাচনে বামবিরোধী ভোটের হার বেড়ে গেলেও আসনের হিসেবে বামফ্রন্টই থাকতে পারলেন ক্ষমতায় এবং বিপুল

ব্যবধানে। এর ফলে সি পি আই এমের নেতাদের কথায় ও আচরণে বেপরোয়া দাম্ভিকতার মাত্রা যেমন বাড়ল তেমনি বৃদ্ধি পেল নিজেদের অবস্থান ও জনপ্রিয়তা সম্পর্কে অতি-আস্থা। দীর্ঘকাল ধরাকে সরা জ্ঞান করতে করতে বাম নেতারা, বিশেষ করে সি পি আই এম নেতারা হারিয়ে ফেললেন পরিপ্রেক্ষিতবোধ ও পরিমিতিবোধ। শেষকালে তাঁদের প্রকাশ্য বক্তব্য ও মন্তব্য শুনে মনে হচ্ছিল তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে তাঁরা অজেয়, অনন্তকাল শাসন ক্ষমতায় থাকবেন তাঁরাই। এক ধরনের রাজনৈতিক-সামাজিক মনোবিকলনে তাঁরা আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। ওদিকে শিক্ষা থেকে শুরু করে কারিগরি উন্নয়ন পর্যন্ত সব ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ বছর বছর এত পিছিয়ে পড়তে থাকল যে বামফ্রন্ট সরকার, বিশেষ করে সি পি আই এম সম্পর্কে বিরক্তি ও ক্ষোভ বাংলার সমাজে রেড়েই চলল। কিন্তু উপযুক্ত বিরোধী না থাকায় এবং বিরোধীদের মধ্যে অনৈক্যের কারণে অনেকে প্রায় ধরেই নিলেন যে সি পি আই এমকে বোধহয় কোনদিনই শাসনক্ষমতা থেকে সরানো যাবে না। মনে মনে যাঁরা নিশ্চিতভাবে সি পি আই এম বিরোধী এমনকি তাঁদের মনেও কায়েম হতে থাকল হাল-ছেড়ে-দেওয়া ভাব, অবসাদ ও জাড্য।

এমন সময়ে ঘটে গেল সিঙ্গুর, ঘটে গেল নন্দীগ্রাম। বামফ্রন্ট সরকার ও সি পি আই এমের বিরুদ্ধে সিঙ্গুরের কৃষিজীবীদের বিদ্রোহ এবং নন্দীগ্রামের জনগণের বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থান তামাম বাংলার জনমানসে লাগিয়ে দিল ঝড়ের হাওয়া। ভারত সরকার তাঁদের অর্থনৈতিক নব-উদারনীতির নামে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ), কেমিকাল হাব ইত্যাদি গড়ে তোলা, পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, যেভাবে হোক দেশি-বিদেশি লগ্নি বাড়ানো এবং সেই স্বার্থে সুফলা আবাদী জমি অধিগ্রহণ, কৃষির ক্ষেত্রে দেশের কৃষকস্বার্থবিরোধী বিভিন্ন আইন প্রণয়ন ও ব্যবস্থা গ্রহণের যে কার্যক্রম হাতে নেন, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারও সেটি মেনে নিয়ে তার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হঠাৎ জোরেসোরে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। এই ব্যাপারটির দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে প্রাক্তন আই এ এস এবং বামফ্রন্টের ভূমি সংস্কারের এক অন্যতম স্থপতি দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় 'তারা' চ্যানেলে 'মতামত' অনুষ্ঠানে একবার বলেছিলেন : দীর্ঘকাল হাত পা গুটিয়ে বসে থাকার পর মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর হঠাৎ উন্নয়নের একটা বেগ এসেছে যেন।

রাজ্য জুড়ে বেশ কিছু হাজার কারখানা বন্ধ। জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের চোটে অনেক পুঁজিপতি, কারখানার মালিক পগারপার। বন্ধ হয়ে যাওয়া কলকারখানাগুলো, ইন্ডাস্ট্রিগুলো সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে ফের খুলে নতুন উদ্যমে চালানোর কোনও চেষ্টাই না করা। বছরের পর বছর বেশ গুছিয়ে পরিকল্পনা করেই যেন রিয়েল এস্টেট ব্যবসা বা প্রোমোটার-রাজ লাগামহীনভাবে বাড়তে দেওয়া (আর প্রোমোটার-রাজ মানেই পার্টির ও পার্টির দাদাদের আয়)। যেখানে সেখানে ছোট বড় আবাসন প্রকল্প তৈরি হতে দিয়ে আর অন্যান্য ইমারতি কারবারকে আস্কারা দিয়ে আপন মনে পুকুর বোজানো, পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করা। এবং সব ক্ষেত্রেই পার্টির স্থানীয় নেতাদের আয়ের পথ সুগম করা। নদীগুলির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে নদী, প্রকৃতি ও জনসমাজের ব্যাপক ক্ষতি ডেকে আনা। জলসেচ ব্যবস্থায় ঢিলেমি এমনকি পার্টিবাজি (কোনও এলাকায় একটি কৃষিপ্রধান গ্রামও সি পি আই এমের বিরুদ্ধে চলে গেলে সেখানে সেচের জল না আসতে দেওয়া)। ভুলভাল পরিসংখ্যান বানিয়ে অর্থনীতি, শিল্প, কৃষি, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রশ্নে ভাঁওতা দেওয়া। সি পি আই এমের প্রিয় খান দুই তিন জেলার দিকে বিশেষ নজর দিয়ে আদিবাসীদের অঞ্চলগুলিকে সম্পূর্ণ অবহেলা করা, আদিম অন্ধকারে ফেলে রাখা, যেন ঐ অঞ্চলগুলিতে মানুষ থাকে না। আর শেষবেশ, ভারতের পুঁজিপতি টাটা এবং ইন্দোনেশিয়ার হাফ-গেরস্থ পুঁজিপতি (crony capitalist) সালেমের সঙ্গে (যে সালেম ধ্রুপদী, আধুনিক বা উত্তর-আধুনিক কোনও অর্থেই 'ক্যাপিটালিস্ট' নন, বড় বড় স্প্যাগেটি (সিমাই) কারখানা ও রিয়েল এস্টেটের মালিক) বাণিজ্যিক চুক্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী কলকাতার সর্বত্র সরকারি স্লোগান-বিজ্ঞাপন সেঁটে দেওয়া : 'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ।'

সি পি আই এম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের ধেয়ানে কৃষি এতই আমাদের জব্বর ভিত্তি যে বহু-ফসলা সিঙ্গুরের জমি নেতারা এক-ফসলা ও পতিত আখ্যা দিয়ে টাটার হাতে তুলে দিতে পারেন। প্রায় গোটা নন্দীগ্রামটাই চলে যেতে পারে সিমাই-ইমারতি-কারবারী দুরন্ত সালেমের হাতে। বাংলার তালুক দেশি-বিদেশি শ্রেষ্ঠীর শ্রীচরণে নিবেদন করে আর নন্দীগ্রামের অসংখ্য কৃষিজীবীকে তাঁদের জমি থেকে উৎখাত করে ব্যারাকে পাঠিয়ে দিয়ে

তমলুক-হলদিয়ার একুশ-শতকী মনসবদার কমরেড লক্ষ্মণ শেঠ উন্নয়ন ও দেশপ্রেম-মানবহিতৈষণার নতুন মহাকাব্য রচনার তোড়জোড় করতে পারেন। শিল্পকে ভবিষ্যৎ মেনে কৃষিকে আমাদের ভিত্তি হিসেবে স্বীকার করা ও গড়ে তোলার এক ঐতিহাসিক ও রাজকীয় উদ্যোগই বটে।

অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক দিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ এমনিতেই ধুঁকছিল, ফলে নানান চাপের মধ্যে ছিলেন এই রাজ্যের জনগণ। সিঙ্গুরের বহুফসলা জমিতে টাটার ন্যানো মোটরগাড়ির কারখানা তৈরি এবং নন্দীগ্রামে বিদেশি বিনিয়োগকারীর হাতে বিপুল পরিমাণ জমি তুলে দেওয়ার জন্য জমি-অধিগ্রহণ—এই দুটি ব্যাপার যেন দুটি জ্বলন্ত দেশলাই কাঠির মতো পড়ল দুই বিশাল বারুদের স্তূপে। গ্রামবাসীরা বিদ্রোহ করলেন। এতে কোনও *একটি* বিশেষ রাজনৈতিক দল বা কোনও *বিশেষ* রাজনৈতিক নেতার ভূমিকা ছিল না। কোনও সংসদীয় দলের নেতা ঐ দুই জায়গায় গিয়ে বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে দিয়ে আসেননি এবং প্রথম থেকেই সেখানে নেতৃত্ব দেননি। বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠী এবং দলহীন অনেক মানুষ সেই বিদ্রোহে অংশ নেন।

সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের পর বিদ্রোহ করলেন লালগড়ের জনসাধারণ। কেউ বলতে পারবেন না যে বিশেষ কোনও নেতা বা বিশেষ একটি দল কলকাতা থেকে গিয়ে এইসব জনবিদ্রোহ সংঘটিত করেছিলেন বা সেগুলিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। যদি কেউ তা বলে তো সেটা হবে মিথ্যা কথা। কলকাতার কোনও সংসদীয় দল বা কোনও সংসদীয় দলের নেতা সেখানে একক গুরুত্ব পাননি অথবা এমনকি এককভাবে আন্দোলনের পুরোভাগেও ছিলেন না। কোনও একটি সংসদীয় দলের প্রভাব ও নেতৃত্ব উল্লেখযোগ্য মাত্রায় দেখা যায় গণবিদ্রোহ ও গণ-অভ্যুত্থান ঘটে যাওয়ার পরে। সেই নতুন পর্যায়েও কিন্তু নানান দল, নানান গোষ্ঠী এবং দলহীন বহু মানুষের সক্রিয় সমর্থন ছিল।

সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম লালগড়ের অভিন্ন বৈশিষ্ট ছিল। কোণঠাসা গ্রামবাসীরা চরম বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে ভয় পেয়ে ও ক্রুদ্ধ হয়ে একজোট হচ্ছেন এবং সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন, বিদ্রোহ করছেন, অভ্যুত্থান করছেন।

আমি সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম যাই টেলিভিশনকর্মী ও সাংবাদিক হিসেবে

এবং আরও কোনও কোনও সাংবাদিকের মতো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে গিয়ে বিদ্রোহী জনসাধারণের পক্ষে নিই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয় সিঙ্গুর আন্দোলন চলাকালে, নন্দীগ্রামে অভ্যুত্থানের আগে। অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা হয়ে উঠি গণ-আন্দোলনের সহযোদ্ধা। তার আগে আমি কোনওদিনই মমতার রাজনীতি নিয়ে গুরুত্ব দিয়ে কিছু ভাবিনি। তাঁর সম্পর্কে বা কোনও সংসদীয় রাজনৈতিক দলের কোনও নেতা সম্পর্কেই আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। কোনও দল সম্পর্কেই ছিল না আমার কোনও কৌতূহল। গণ-আন্দোলনের জোয়ারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও বন্ধুতা হয়।

অনেকেই আমায় 'বামপন্থী' ভেবে এসেছেন। আমার মতো একজন কী করে এবং কেন মমতার পাশে গেলেন এবং তাঁর সঙ্গে থাকলেন এটা হয়তো অনেকেরই প্রশ্ন। মমতার মতো একজন phenomenon-কে অত কাছ থেকে দেখা, তাঁর সঙ্গে কাজ করা আমার মতো একজন মানুষের জীবনে এক মূল্যবান অভিজ্ঞতা। তেমনি তিন দশকেরও ওপর শাসনক্ষমতায় থাকা সি পি আই এম দল ও তাদের নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকারকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানানো যে বিপুল গণ-আন্দোলন তারও অংশীদার হতে পারা আমার জীবনের এক বিরাট ঘটনা। এই অভিজ্ঞতা আমায় কিছুটা হলেও পাল্টে দিয়েছে। আমার জীবন বরাবরই ঘটনাবহুল। তারই পটভূমিতে এই ঘটনাগুলি ও অভিজ্ঞতাগুলি নিয়ে আত্মজীবনীধর্মী একটি বই লেখার কথা আমার মাথায় ছিল। বিশেষ করে ভেবেছিলাম মূল ফোকাসটা রাখব মমতার ওপর। এই বই-এ সেই চেষ্টাই করেছি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরামহীন পীড়াপীড়িতে অবশেষে ২০০৯ সালের লোকসভা ভোটে দাঁড়ানোর পর এবং যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে সি পি আই এম প্রার্থীকে হারিয়ে সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর যে সব অভিজ্ঞতা আমার হয় সেগুলি নিয়ে একটি আলাদা বই লেখার ইচ্ছে আমার থেকে গেল। এই বইটিতেও নির্বাচনের প্রস্তুতিকালীন কয়েকটি অভিজ্ঞতা এবং ভোটে জেতার পর অর্জিত দু-একটি অভিজ্ঞতার উল্লেখ আমায় করতে হয়েছে বিশেষ একটি দুটি প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য পাঠকদের সামনে মেলে ধরার স্বার্থে।

আমার কাছে আমার আত্মমর্যাদা সবকিছু আর সবার ওপরে। তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য আমি হয়েছিলাম যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রতীক চিহ্নে প্রার্থী হিসেবে ভোটে দাঁড়ানোর অল্প কিছুক্ষণ আগে। তার আগে কোনওদিনই কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলাম না, সে-কথা কষ্টকল্পনাতেও আসেনি কখনও। এই দুনিয়ার কোনও কিছুই বেশি মূল্যবান নয় আমার আত্মমর্যাদা, আত্মসম্মানের চেয়ে। কোনও ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা দার্শনিক মতবাদ, কোনও নেতা বা কোনও দলের স্থান আমার কাছে আমার আত্মমর্যাদার ওপরে নয়। কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতার একটি লাইন আমার মানসিকতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য : 'আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।'

অপরের কথা ভেবে, অন্য কোনও 'বৃহত্তর স্বার্থে', বিনা দোষে নানান অপমান হজম করে যাবো এমন হিসেবী বা পরার্থবাদী মানুষ আমি নই। সাংসদ হওয়ার বা কোনও পদ পাওয়ার বিন্দুমাত্র বাসনা আমার ছিল না। ভীষণ চাপে পড়ে ভোটে দাঁড়িয়েছি, দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছি। কিভাবে ভোট লড়েছি তা আমি জানি, আর জানেন আরও কেউ কেউ। সি পি আই এমের বিরুদ্ধে আমি আগেও লড়েছি, আবার (নিজের নয়) অপরের স্বার্থে তাঁদের ছাত্রশাখার হয়ে প্রচারমূলক গান বেঁধে গেয়ে দিতেও বাধ্য হয়েছি। এই বইতে তার কাহিনী আছে। তেমনি, তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে আমার স্থানীয় বিরোধের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতি ঘনিষ্ঠ এক নামজাদা শিল্পী অযাচিতভাবে আমার বাড়িতে এসে—তাঁর সম্পর্কে আমি কোনও কটূক্তি, তাঁকে কোনওরকম আক্রমণ না করা সত্ত্বেও—আমায় আরও অনেকের সামনে এই বলে শাসিয়েছিলেন : '২০১১-র পর তোমার চরম সর্বনাশ হয়ে যাবে, বলে দিলাম।'

অতীতে সি পি আই এম সহ একাধিক প্রতিষ্ঠান আমায় এবং আমার সৃষ্টি করা সঙ্গীতকে বিভিন্ন সময়ে অপমান করেছেন আমার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনচেতা মনোভাবের কারণে। ভোটে জেতার পর, কয়েকটি ব্যাপারে তৃণমূল নেতৃবৃন্দের একাংশের সঙ্গে আমার বিরোধ হওয়ায়, 'ছত্রধরের গান' নামে আধুনিক গানের একটি গানের এলবাম আমি বানানোয় এবং ছত্তিশগড় ও জঙ্গলমহল থেকে যৌথবাহিনী প্রত্যাহার করা হোক এই দাবি তোলায়

আমায় অপমানিত ও আক্রান্ত হতে হল মমতাপন্থী তৃণমূলপন্থী শিল্পী, লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীদের হাতে। ২০১১ সালে কী হবে না হবে তাই ভেবে, আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে মুখ বুজে সব সহ্য করা বা হজম করে যাওয়া আমার স্বধর্ম নয়। অনেক ভেবে দেখেছি, তারপরে লিখেছি এই বই, যাতে কেউ কেউ অন্তত জানতে পারেন ২০০৬ সাল থেকে ঘনিয়ে ওঠা সি পি আই এম ও বামফ্রন্ট সরকার বিরোধী গণ-আন্দোলন, সেই আন্দোলনের বেশ কিছু যোদ্ধা এবং বিশেষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে। এটা ইতিহাসের বই নয়। এ হল আমার তিন সাড়ে তিন বছরের আত্মজীবনীর একটি অংশ।

বইটির বিভিন্ন জায়গায় সংলাপ আছে। দীর্ঘকাল সাংবাদিকতা করেছি বলে কে কী বলেছিলেন বা বললেন তা আমার প্রায় হুবহু মনে থাকে। স্মৃতিশক্তি দুর্বল নয় আমার। এই উপমহাদেশে আমি সেই বিরল পেশাদার কণ্ঠশিল্পীদের একজন যে বছরের পর বছর গানের খাতা না দেখে অসংখ্য গান গেয়ে যাচ্ছে অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠানে। কাজেই কে আমায় কী বললেন, কার সঙ্গে আমার কী কথা হল তা আমার প্রায় হুবহু মনে থাকে যদি সেই ব্যক্তি ও সেই সংলাপের গুরুত্ব থাকে আমার জীবনে।

যেমন, আমার মনে আছে, প্রার্থী হিসেবে আমার নাম ঘোষণা করার আধ ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমায় তাঁর অফিস ঘরে বসে বলেছিলেন : কবীরদা, তুমি নাকি কোন্ টিভি চ্যানেলে ক্যামেরার সামনে গায়ের জামা খুলে বলেছ— 'আমি মাওবাদী'?

(এই দারুণ খরবটি যিনি মমতাকে দিয়েছিলেন, আমার ও মাওবাদীদের সম্পর্কে তাঁর কল্পনামিশ্রিত মানসিক অবস্থানটি কৌতূহলোদ্দীপক। আমি মাওবাদী এই কথাটা আমি শুধু এমনি এমনি ক্যামেরার সামনে বলছি না। বলতে গিয়ে গায়ের জামা খুলে ফেলছি। তবু ভাল সেই সুধী আমার গায়ের জামাতেই থেমে গিয়েছেন, আর নামেননি। খেয়াল করা দরকার, ঝোলা ব্যাগ থেকে ছোট পিস্তল বের করে নয়, কমরেড চারু মজুমদারের নামে প্রশস্তিসূচক শ্লোগান বা জয়ধ্বনি দিয়ে নয়,ভাঁজ করা একটা লাল নিশান এক টানে প্যান্টের পকেট থেকে বের করে সেটি হাত দিয়ে দোলাতে দোলাতে নয়, মুঠো-পাকানো ডান হাত তুলে নয়, এই বুড়ো বয়সে গায়ের জামা খুলে, অর্থাৎ আমার উত্তর-নেয়াপাতি ভুঁড়ি সাড়ম্বরে ক্যামেরায় প্রদর্শন করে আমি

ঘোষণা করছি যে আমি মাওবাদী। সেই পরম কল্পনাপ্রবণ সুধী কেন যে জুড়ে দিলেন না : ক্যামেরার সামনে গায়ের জামা খুলে পাঁচের দশকে হলিউডের চলচ্চিত্রে দেখা কিং কং-এর মতো দুই হাতে বুকে সশব্দে চাপড় মারতে মারতে আমি বলেছি যে আমি মাওবাদী—আর সেই চাপড়ের তালেতালে আমার ভুঁড়ির র‍্যাডিকাল কম্পন, মায় ঈষৎ দুলুনি!)

আমি : না, মমতা, অমন কোনও কথা আমি কখনও কোনও চ্যানেলের ক্যামেরার সামনে বলিনি।

মমতা : সামনের দু-মাস তুমি কিচ্ছু বোলো না। তারপর তুমি যা খুশি তাই বোলো আর কোরো।

না, আমি যা খুশি তাই বলিওনি, করিওনি। যা খুশি তাই বলবই বা কেন, করবই বা কেন। যেটা চিন্তার কথা, মমতাকে আমার সম্পর্কে ঐ কথাটা বলেছিলেন নিশ্চয়ই কেউ একজন। তিনি সম্ভবত সি পি আই এমের কেউ নন। সি পি আই এমের তথাকথিত বিরোধীদের মধ্যেই কেউ একজন, আমাদেরই কেউ একজন, বলা বাহুল্য, নয়তো মমতার কাছে গিয়ে আমার সম্পর্কে তাঁকে কিছু বলার সুযোগ বা অধিকার তিনি পাবেন কী করে। এই হচ্ছে রাজনীতির দুনিয়া। কে যে কখন কার সম্পর্কে কোন্ মিথ্যে বা অতিরঞ্জিত কথা কার কাছে গিয়ে বলবে তার কোনও ঠিক নেই। মিথ্যে কথা রটিয়ে বেড়ানো ও সত্য গোপন করার মোচ্ছব চলেছে চারদিকে। এর ঘটা ক্রমশ বাড়বে বৈ কমবে না। সেই কারণেও আমার দিক থেকে ২০০৬ থেকে ২০১০ সালের মার্চ মাস অবধি সময়ের একটি আলেখ্য লিখে যাওয়াটা জরুরি ছিল।

এই বই তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে আছে আত্মপরিচিতি। দ্বিতীয় অংশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, গণ-আন্দোলন, ভোটে দাঁড়ানো ইত্যাদি প্রসঙ্গ এবং তৃতীয় ভাগে পরিশিষ্ট।

কবীর সুমন

১৯/জি, বৈষ্ণবঘাটা বাই লেন
কলকাতা ৭০০ ০৪৭

বারুইপুরে বিভিন্ন গ্রামে মানুষের কথা শুনতে

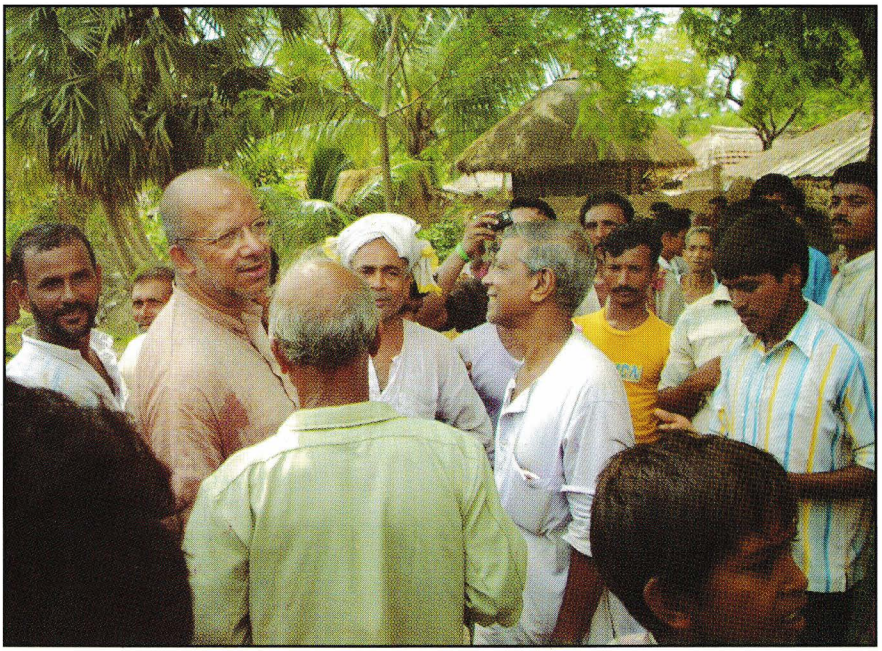

বারুইপুরে বিভিন্ন গ্রামে মানুষের কথা শুনতে

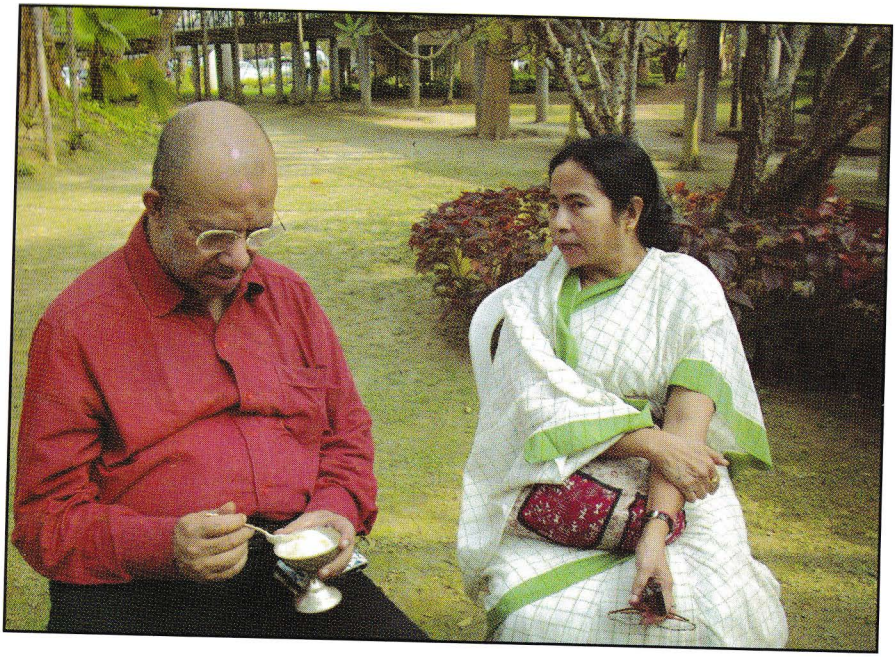

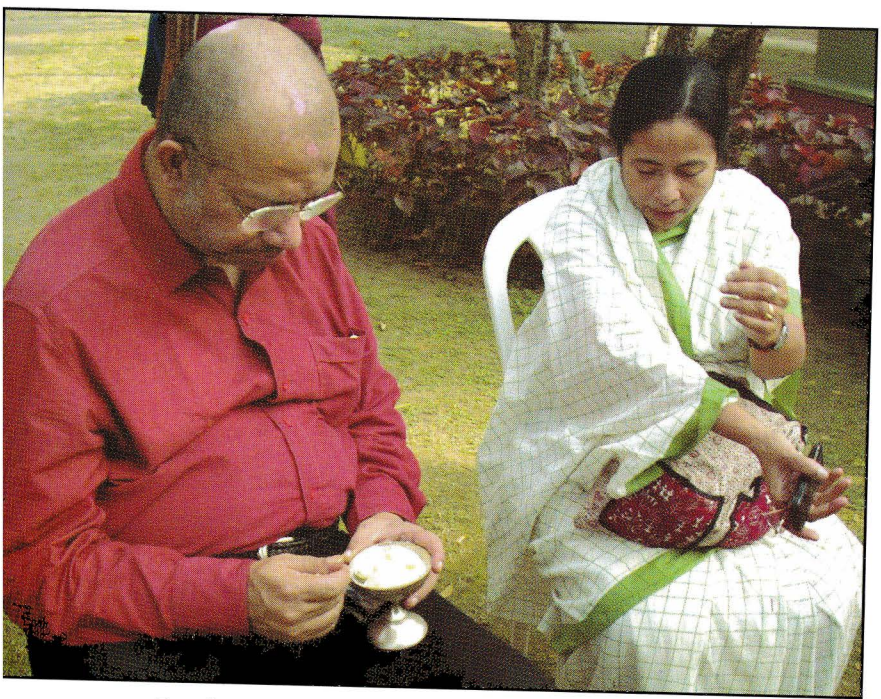

মাননীয়া শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায়

মাননীয়া শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায়

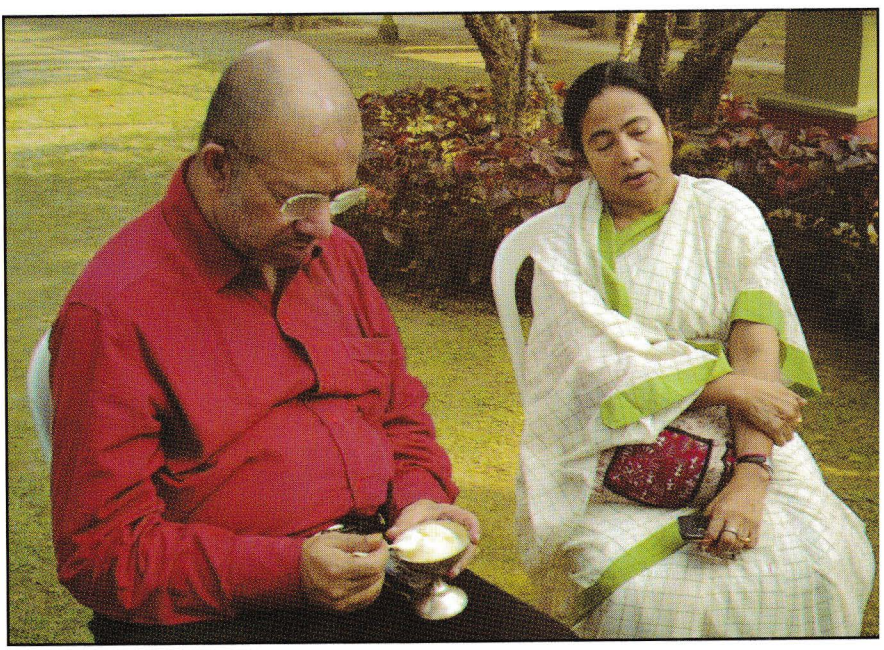

মাননীয়া শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায়

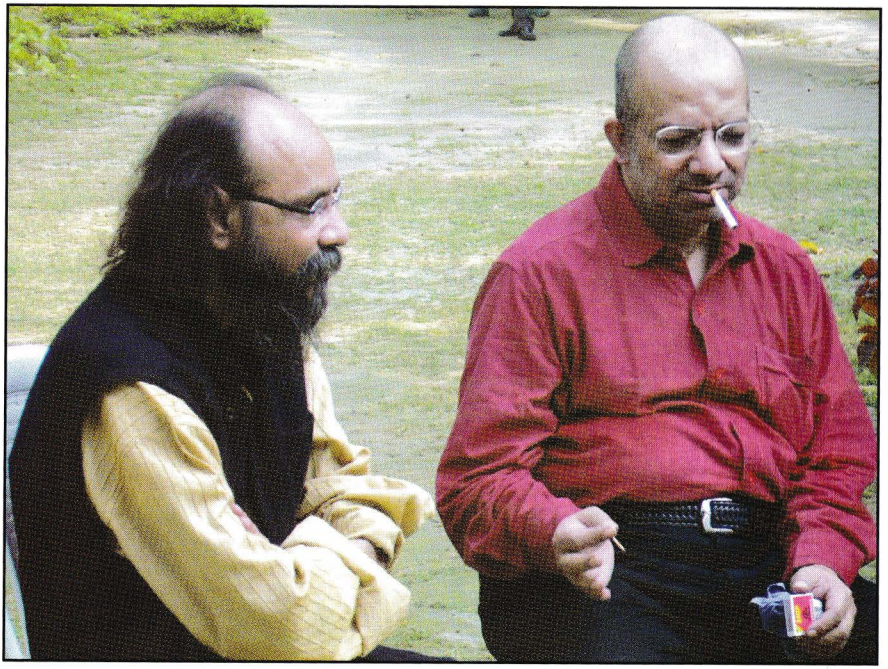

কবি জয় গোস্বামীর সঙ্গে

মাননীয়া তৃণমূল নেত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অতিথিদের সামনে সংগীত পরিবেশনে

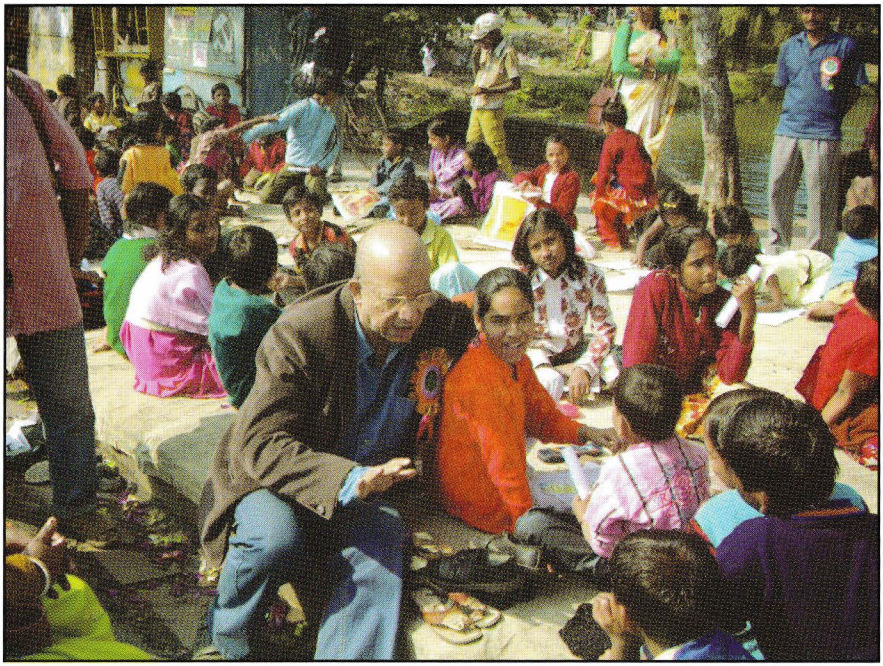

ফুটপাথে বসে আঁকো-তে বস্তিবাসী শিশুদের সঙ্গে

মাননীয়া রেলমন্ত্রী তৃণমূল নেত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে সংগীত পরিবেশনে

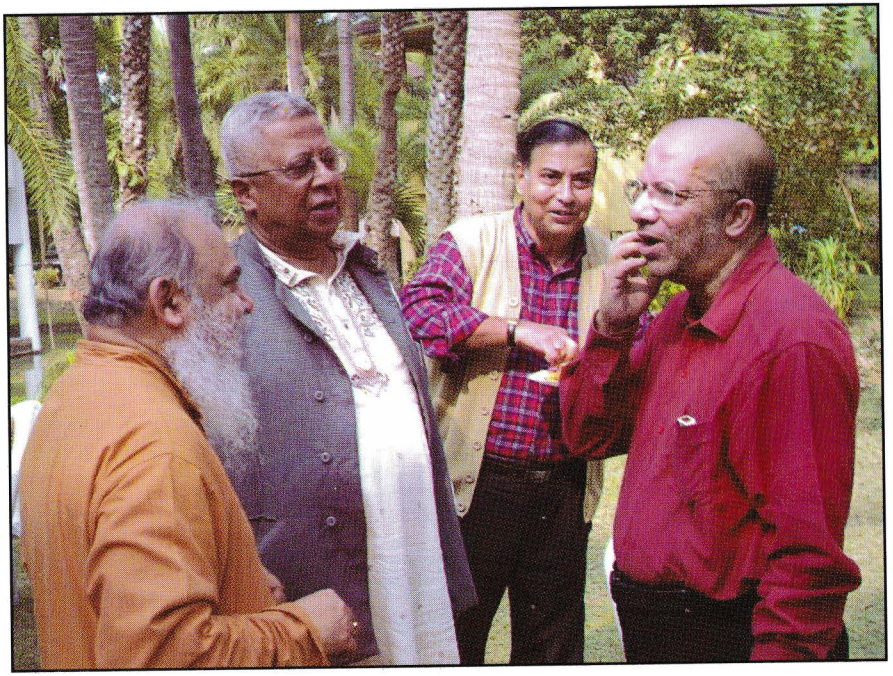

শিল্পী শুভাপ্রসন্ন, বি.জে.পি নেতা তথাগত রায় ও জনৈক সাংবাদিকের সঙ্গে

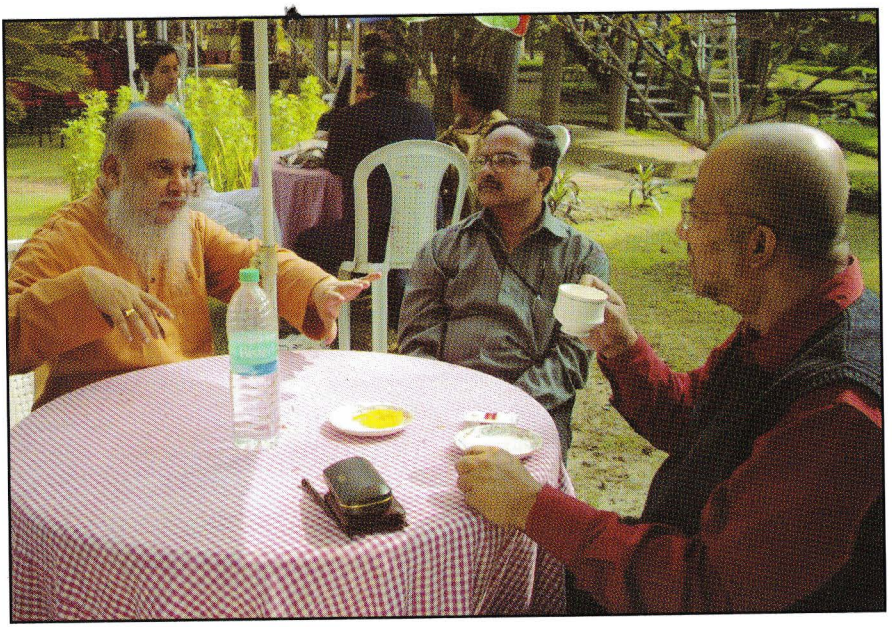

শিল্পী শুভাপ্রসন্ন ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তরুণ নস্করের সঙ্গে

রায়চকে শিল্পী শুভাপ্রসন্নর বাগানবাড়িতে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি

গানে মশ্‌গুল গানওলা

নাট্যকার ও চলচ্চিত্রকার সুমন মুখোপাধ্যায় (ডানদিকে) ও কবি জয় গোস্বামীর সঙ্গে আড্ডায়

২০০৯-এর লোকসভা ভোটের প্রচারে আরাবুল ইসলামের সঙ্গে

মাননীয়া তৃণমূল নেত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অতিথিদের সামনে সংগীত পরিবেশনে

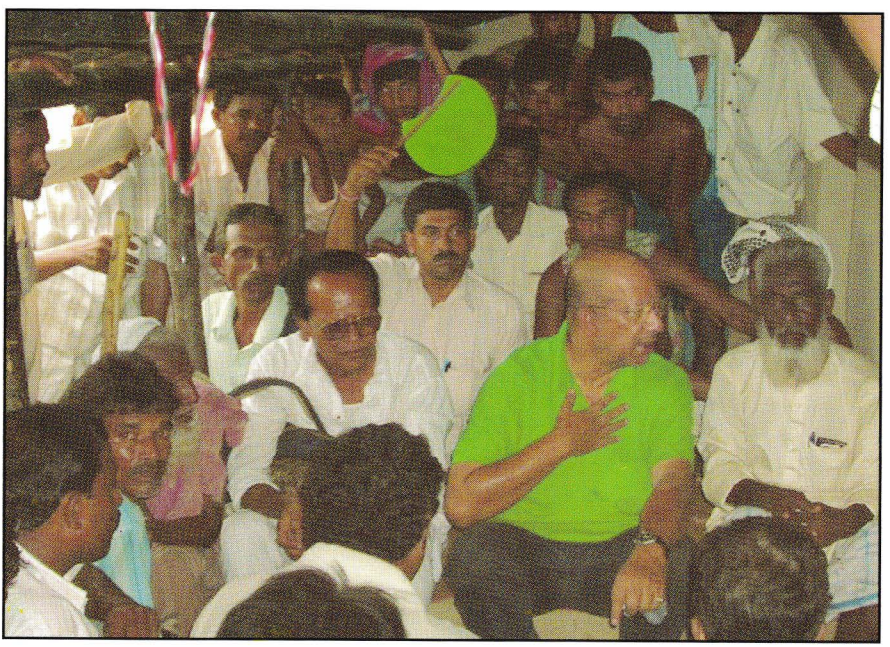

বারুইপুরে সি.পি.আই.এম-এর হাতে নিহত তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে

একটু বিরতি নাকি ভাবনার বিস্তার

মিডিয়ার মুখোমুখি

নিশানের নাম তাপসী মালিক

গোড়ার কথা

'Use Dipper By Night'

আমি আমার হাই বীম নিভিয়ে দিলাম। আপনাদের হাই বীমের আলোয় ভাল করে দেখে নিন, মেপে নিন আমাকে।

রাজনীতিতে আমার আগ্রহ বরাবরই কম। স্কুলে যখন পড়তাম, রাজনীতি নামে কোনও বিষয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কেই পুরোপুরি সচেতন ছিলাম না। ১৯৬৬ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে কলেজে ঢুকে আরও কিছু বিষয়ের সঙ্গে রাজনীতিও এসে পড়ল আমার পরিসরে। কিন্তু সে সম্পর্কে আমার মনে আলাদা কোনও উৎসাহ জাগেনি। তখন নকশালপন্থী রাজনীতির যুগ। সাম্যবাদের দিকে ঝোঁক ছিল, একাধিক নকশালপন্থী সহপাঠীর সঙ্গে বন্ধুতাও ছিল, কৃষিপ্রধান এই দেশে কৃষি-বিপ্লবই যে দরকার তাও মনে হত, মার্ক্স লেনিন ও মাও-এর অল্প কিছু লেখা পড়ে ভেতরে ভেতরে একটা টানও অনুভব করতাম। তেমনি, 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান'— এই বাক্যটা দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা হচ্ছে দেখতে ভাল লাগত না। আমাদের দেশের কি কেউ নেই? কিন্তু কোনও রাজনৈতিক মতবাদ নিয়েই আমি তেমন চিন্তা করিনি। ব্যস্ত ছিলাম সঙ্গীত নিয়ে, ওস্তাদ আমীর খানের খেয়ালের আঙ্গিক, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতার নিয়ে, দেশ-বিদেশের সাহিত্য নিয়ে। স্কুলের ছাত্র হিসেবে আমার কোনও ধারণাই ছিল না অনেক বিষয়ে, সাহিত্য যার একটি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর মস্ত বড় একটা দুনিয়া যেন

আমার সামনে খুলে গেল। গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম নানান ধরনের বই। সে-সময়ে বিদেশি পেপারব্যাক বই-এর দাম বেশ কম ছিল। টিউশনির টাকা থেকে প্রতি মাসেই অন্তত দুটি পেঙ্গুইন, পেলিকান, মেন্টর বা ডেল-এর বই কিনতে পারতাম, কিনতামও। পড়ার পাশাপাশি ছিল নিয়মিত রেয়াজ, বাংলা গান চর্চা, আকাশবাণীর আধুনিক বাংলা গানের অনুষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন গীতিকারের লিরিকে সুর দেওয়া, রবীন্দ্রসঙ্গীত, হিমাংশু দত্তর গান শেখা দুই গুরুর কাছে। এত কিছুর মধ্যে রাজনীতির স্থান ছিল নেহাতই নগণ্য।

রাজনীতি, নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বিশ্বরাজনীতি নিয়ে আমার আগ্রহ জাগতে শুরু করে ১৯৭৫ সালে ইউরোপে চলে যাওয়ার পর, বেতার সাংবাদিকতা শুরু করার পর। দীর্ঘকাল মোটামুটি বিদেশেই ছিলাম, হয়ত সেই কারণেই ভারত বা বাংলার রাজনীতি নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাইনি। আর সত্যি বলতে, ভারত বা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির জগৎটা আমায় আকর্ষণও করত না। অথচ, ১৯৭৬ সাল থেকেই আমি মার্ক্সীয় মতবাদের প্রভাবে পড়ি, যদিও তার আগে নিজেকে 'রাসেলপন্থী' মনে করতাম এবং বার্ট্রান্ড রাসেল যে বলেছিলেন "In our sad century of dogma" সেই মার্ক্সীয় 'ডগমা'য় হোঁচটও খাচ্ছিলাম থেকে থেকেই। কিন্তু তা হলে কী হবে। ইউরোপে গিয়ে দুনিয়াটাকে আরও বড় করে এবং আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখতে শুরু করলাম।

কাজের সুবাদে এবং তার বাইরেও নানান দেশের মানুষদের সঙ্গে আলাপ হল, আলোচনা চলতে লাগল, চলতে লাগল সারা পৃথিবী সম্পর্কে শিক্ষা। বিভিন্ন ও বিচিত্র সব খবরকাগজ, পত্রিকা, বই চলে এল নাগালের মধ্যে। বিশ্ব সম্পর্কে, গরীব আর বড়লোক দেশগুলি সম্পর্কে রাশি রাশি খবর, তৃতীয় বিশ্বের কোন্ দেশে কী ঘটছে, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে কী ঘটছে, তারা গরীব দেশগুলির সঙ্গে কী করে এসেছে, করে চলেছে, ভবিষ্যতেও করতে চাইছে সেই সব বিষয়ে প্রচুর তথ্য গিজগিজ করতে লাগল আমার মাথায়। আফ্রিকার কোনও দেশ বা ইরান, ইরাক, মিশর, তুরস্ক, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, পেরু, চিলি বা ট্রিনিডাড সম্পর্কে বই পড়া এক জিনিস। সেই সব দেশের যুবক যুবতী বা বয়স্ক মানুষদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, তাঁদের কাছ থেকে তাঁদের দেশ সম্পর্কে জানা কিন্তু

একেবারেই অন্য ব্যাপার। বই বা পত্রিকা পড়া, ডকুমেন্টারি বা ফিচার ফিল্ম দেখার পাশাপাশি সেই অন্য ব্যাপারটাও তখন ঘটে চলেছে আমার জীবনে। ফলে মানুষ হিসেবে (বিশেষ করে একজন যুবক হিসেবে) আমি প্রতিনিয়তই পালটে যাচ্ছিলাম তখন। বের্ট ব্রেশ্‌ট্‌, লুই আল্‌থুসার, গ্রাম্‌শি বা গেয়র্গ লুকাচের লেখা পড়ে সেই বয়সে নিজেকে মার্ক্সবাদী মনে করে এক ধরনের সুখ পেতাম। আমার চেয়েও বছর ছয়েকের ছোট (বেচারি) জার্মান বান্ধবীর কাছে পণ্ডিতি ফলানোর লোভটাও তো ছিল। প্রতিটি বিষয়েই মত জাহির করা, ভিন্নমতের মানুষদের কিঞ্চিৎ করুণার চোখে দেখা, গম্ভীর মুখে লম্বা চওড়া কথা বলা, সমানে এঁড়ে তর্ক করে যাওয়া এবং পাঁচজনের মাঝখানে বসে কথার জাল বোনার লক্ষ্যেই বোধহয় প্রচুর বই পড়ে ফেলা—এই সব নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। এটা অবশ্যই চাকরির বাইরের জগৎ। এই দুই জগতের মধ্যে ভারত বা আমার রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার ফুরসত ছিল কমই।

ভারতে জরুরি অবস্থা শেষ হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের নির্বাচনী সাফল্য ইউরোপপ্রবাসী আমার ও আমার কিছু বন্ধুর মনে স্বস্তি এনে দিয়েছিল। এমনিতেই লাল নিশান দেখলে মনটা হয়ে যেত ফুরফুরে। একটা সময় ছিল যখন মনে হত পৃথিবীর সব দেশের পতাকাই লাল হলে বেশ হয়। অথচ নিজেকে কমিউনিস্ট বলিনি কখনও। পুঁজিবাদের সমর্থনে কেউ কথা বললে তেড়েফুঁড়ে মার্ক্সবাদী অর্থনীতি ও সমাজনীতির পক্ষ নিতাম, মহা তর্ক জুড়ে দিতাম। সোভিয়েত ইউনিয়ন বা পূর্ব ইউরোপীয় কোনও দেশ বা চীনের সমালোচনা বরদাস্ত করতাম না। কিউবার বিরুদ্ধে কোনও কথা শুনলে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। পেরুর 'শাইনিং পাথ' গেরিলাদের মনে হত আপন জন। সহকর্মী বন্ধু আবদুল্লাহ্‌ আল ফারুক সে-সময়ে বলতেন—'বুঝলি, কালাশ্‌নিকভ হল তৃতীয় বিশ্বের মুক্তি সংগ্রামের প্রতীক।' ১৯৭৯ সালে নিকারাগুয়ায় যখন সানদিনিস্তা বিপ্লবীরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করলেন, আমাদের সে কী আনন্দ। তখন থেকেই তাল করতাম, একদিন নিকারাগুয়া যাব।

'এক একটা দিন দারুণ রঙিন
প্রেমিকার ঠোঁট আর নিশানের লাল।'

—নিশানের লালে আমার স্বপ্ন মিশিয়েও নিজেকে কোনদিন কমিউনিস্ট বলতে পারিনি। একদিকে মনে হত, কমিউনিস্ট হওয়া সহজ নয়। হতে গেলে অনেক দায়িত্ব নিতে হয়। অন্যদিকে মনে হত কমিউনিজমের 'রেজিমেন্টেশন' আমার পোষাবে না। বিপ্লব, তারও আগে বিদ্রোহ জরুরি।

'বন্দী পাখিটা তার সাহসী ডানার
ঝাপটায় বলে এই ঝড় দরকারি'।

কিন্তু 'কমিউনিজম'? সত্যি বলতে, পুঁজিবাদের সমর্থক আর কমিউনিজমের বিরোধীদের সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে কমিউনিস্টতন্ত্রের জয়গান গাইলেও পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট দেশগুলি আর সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে যেসব খবর সাতের দশকে ইউরোপে আর আটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসে পেতাম (পুঁজিবাদী বার্তামাধ্যম থেকে নয়, প্রগতিশীল কাগজপত্র ও নানান বই থেকে) তাতে কমিউনিস্টতন্ত্র সম্পর্কে নানান সন্দেহই জাগত।

১৯৭৭ সালে একবার পূর্ব জার্মানিতে গিয়ে দেখেছিলাম সেখানে 'ইন্টারশপ' নামে এক ধরনের দোকানে পূর্ব জার্মানির মুদ্রা দিয়ে কিছু কেনা যায় না। জিনিস (পশ্চিমী দুনিয়ার জিন্‌স্‌, ডিজাইনার পোশাক, প্রসাধনের নানান সরঞ্জাম, ক্যামেরা, হাতঘড়ি ইত্যাদি) কিনতে হয় মার্কিন ডলার, ব্রিটিশ পাউন্ড, পশ্চিম জার্মান মার্ক, জাপানের ইয়েন এইসব মুদ্রা দিয়ে। খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম শাসক কমিউনিস্ট দলের লোকজন ও তাঁদের পেটোয়া লোকদের হাতে ঐসব বিদেশি মুদ্রা এসে পড়ে। বিদেশি পর্যটকরা শুধু নন, এই ধরনের (শাসকদলের প্রসাদপুষ্ট) পূর্ব জার্মান নাগরিকরাও 'ইন্টারশপ' দোকান থেকে প্রকাশ্যে কেনাকাটা করে থাকেন। পূর্ব জার্মানির সাধারণ মানুষ তাকিয়ে থাকেন ফ্যালফ্যাল করে।

একদিন, সেই ফ্যালফ্যাল দৃষ্টি রূপান্তরিত হল 'কমিউনিস্ট সরকারটাকে ফ্যালোফ্যালো' স্লোগানে। ফ্যালফ্যাল থেকে ফ্যালোফ্যালোয় রূপান্তর সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে শুরু করে পূর্ব ইউরোপের সবকটি কমিউনিস্ট দেশেই দেখা গিয়েছে। তেমনি, যে দেশে দীর্ঘ গেরিলা যুদ্ধের পর বিপ্লবীরা অবশেষে মার্কিন-ভজা একনায়কতন্ত্রের নিকেশ করে ১৯৭৯ সালে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিলেন সেই নিকারাগুয়ায় ১৯৮৫ সালে গিয়ে বিভিন্ন

জায়গায় দেয়াললিখন দেখেছিলাম—'রেভোলুসিয়ন সি, কমুনিস্‌মো ন।'—'বিপ্লব—হ্যাঁ; কমিউনিজ্‌ম্‌—না'। কেউ মুছে দেয়নি সেই লেখাগুলো। আমরা, উপমহাদেশীয়রা, আবার বিপ্লব আর কমিউনিজ্‌ম্‌কে মোটামুটি সমার্থক ভাবি। বিজ্ঞজনে হয়ত বলবেন তার কারণও আছে। যাই হোক, নিজের মনেরই বেশ কিছু অমীমাংসিত প্রশ্নের ঠ্যালায় নিজেকে কোনওদিন 'কমিউনিস্ট' বলিনি, বলতে চাইনি। কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই (তার দরকারও নেই) যে বেশ কিছু বছর মার্ক্সবাদী ও কমিউনিস্টদেরই 'natural ally' মনে করতাম। ভারতের রাজনীতির প্রেক্ষিতে, কংগ্রেস দলকে 'স্বাভাবিক বন্ধু' মনে করিনি।

১৯৯১ সাল থেকে আমার প্রতি ভারতের মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কোনও কোনও মহলের মনোভাব টের পেয়ে বুঝতে পেরেছিলাম, জি হুজুর জি হুজুর না করলে এঁরা মানুষকে শত্রু ঠাওরান। অথচ এই পার্টিরই কোনও কোনও নেতা আমাকে তাঁদের নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিতে ডেকেছিলেন। বুঝতে পারছিলাম—আমার ব্যাপারে পার্টির ভেতরে সকলে একমত নন। কেউ ভাবছিলেন আমায় কাজে লাগানো যাবে। কেউ কেউ আবার ভাবছিলেন আমাকে এড়িয়ে যাওয়াই মঙ্গল। বাংলা গানবাজনাকে পেশা করার পর আরও বুঝেছি এই রাজ্যের সরকারি উৎসবগুলি তো বটেই, এমনকি বেশিরভাগ জলসাও সি পি আই এম দল নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। তাঁদের ছাত্রসংগঠন এস এফ আই অনেক কলেজের ইউনিয়ন চালিয়েছেন দীর্ঘকাল। সি পি আই এমের পছন্দ না হলে, কোনও বিষয়ে সি পি আই এমের বিরোধিতা করলে ঐ কলেজগুলির উৎসবে ডাক পড়বে না। সব মিলিয়ে, বিশ্বের যে কোনও কমিউনিস্ট পার্টির মতো (বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির পরিচয় আমি আমার জীবনে পেয়েছি) ভারতের মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিও মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে গভীর সন্দেহের চোখে দেখেন। কেউ তাঁদের মতের বিরোধী দেখলেই তাঁরা অসহিষ্ণু হয়ে পড়েন, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তার সঙ্গে শত্রুতা করতে থাকেন।

১৯৯২ সালে 'তোমাকে চাই' বেরোনোর পর যখন নাম করে গেলাম, দু'একটি (আক্ষরিক অর্থেই দু'একটি) এস এফ আই নিয়ন্ত্রিত কলেজের অনুষ্ঠানে ডাক পেলেও এই সংগঠন আমাকে এড়িয়েই

গিয়েছেন। বেশ মজা পেতাম এস এফ আই-এর কাণ্ডকারখানা দেখে। কয়েকবারই হয়েছে, কোনও কলেজের এস এফ আই ছাত্র ইউনিয়ন থেকে একজন ফোন করলেন, অমুক তারিখে তাঁদের অনুষ্ঠান। আমি রাজি হতেই তিনি বলে উঠলেন—তার আগে আমাদের একটা 'ক্লিয়ারেন্স্' নিতে হবে। সামান্য একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে একজন পেশাদার সঙ্গীতশিল্পীকে আমন্ত্রণ জানাতে গেলেও 'ক্লিয়ারেন্স' নিতে হয়! সবার ওপরে পার্টি সত্য, তাহার ওপরে নাই। পার্টি! পার্টির গুরুরা বা এস এফ আই-এর বড়দাদারা অনুমতি দিলে তবেই গানবাজনার জন্য আমাকে নিয়ে যেতে পারবেন ছাত্রছাত্রীরা।

একবার বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের নেতারা কাঁচুমাচু মুখে আমার কাছে এসেছিলেন। তখন 'তোমাকে চাই' সবে বেজায় নাম করে গিয়েছে। হুলুস্থুল কাণ্ড চারদিকে। সায়েন্স কলেজের ইউনিয়ন এস এফ আই-এর দখলে। ভারী ভদ্রভাবে তাঁদের একজন নেতা বললেন, 'দেখুন, এমনিতে আমাদের নেতাদের আপত্তি আছে আপনার ব্যাপারে। কিন্তু আমাদের ইউনিয়নের ইলেকশান সামনেই। ছাত্রছাত্রীদের দাবি—আপনাকে আনা হোক। অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছে যে আপনাকে না নিয়ে গেলে আমরা বোধহয় ভোটে হেরেই যাব। তাই আপনাকে আমরা আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি। আমাদের অনুরোধ, আপনি প্লীজ সি পি আই এমের বিরুদ্ধে কিছু বলবেন না বা গাইবেন না।'

আমি বললাম—সি পি আই এমের বিরুদ্ধে তো আমার কোনও গান নেই।

বেচারি এস এফ আই নেতা সলজ্জ ভঙ্গিতে বললেন, 'না, মানে ইয়ে, আপনার ঐ অনীতা দেওয়ানের গানটা না গাইলেই ভাল হয়।'

খুব হেসেছিলাম। ছেলেটি আমার পুত্রতুল্য। তাকে কী বলব। গাইনি গানটি তাঁদের অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠান করতে গিয়ে দেখেছিলাম, হলের নানান জায়গায় আমার গানের কথা লিখে লিখে পোস্টার বানিয়ে টাঙিয়ে বা সেঁটে দিয়েছেন ছেলেমেয়েরা। খুব মায়া হয়েছিল ছাত্রছাত্রীদের জন্য। এমন সোজাসাপ্টা 'আপনাকে না নিয়ে গেলে ভোটে হেরে যাব'—স্বীকারোক্তি আর কখনও শুনিনি।

এর পর এস এফ আই নিয়ন্ত্রিত আর একটিমাত্র কলেজে গান গাইতে

গিয়েছিলাম—বিধাননগরে। সেই অনুষ্ঠানের জন্য সুভাষ চক্রবর্তী মহাশয় ছাত্রদের হাতে আমায় একটি ছোট চিঠি পাঠিয়েছিলেন। এস এফ আই-এর গল্প সেইখানেই শেষ। যা বুঝেছিলাম, 'ক্লিয়ারেন্স্' দিচ্ছেন না পার্টি আর ইউনিয়নের দাদারা।

অনেক বছর পরে, তারা চ্যানেলে কাজ করতে গিয়ে এক তরুণ ক্যামেরা প্রকৌশলীর সঙ্গে বন্ধুতা হয়। তিনি দুর্গাপুরের ছেলে। আমায় তিনি বলেছিলেন...তিনি যখন ছাত্র তখন তিনি আরও কিছু সহপাঠীর সঙ্গে মিলে আমায় আমন্ত্রণ জানানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন দুর্গাপুরে, সম্ভবত তাঁদের কলেজে বা স্কুলে। তিনি নিজেও এস এফ আই-ই করতেন। কিন্তু এস এফ আই প্রবল আপত্তি জানান। সুমন চলবে না।

এরই পাশাপাশি আবার অন্য একটা ব্যাপার হয়েছিল দু'একবার সেই প্রথম দিকে। সন্ধেবেলা এক লাজুক যুবক এসে হাজির। সসঙ্কোচে আমতা আমতা করে তিনি বললেন, 'আমি নিউ আলিপুর কলেজে পড়ি। আমাদের ইউনিয়ন ছাত্র পরিষদ।' বলেই তিনি সভয়ে আমার দিকে তাকালেন।

আমি সস্নেহে হাসায় তিনি বলে চললেন, 'আমরা শুনেছি আপনি বামপন্থী, আমাদের পছন্দ করেন না। তাই ভয় পাচ্ছিলাম আপনার কাছে আসতে। জানেন, বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম অনেকক্ষণ। তারপর সাহস করে কড়া নাড়লাম। আপনি কি আমাদের কলেজে গান গাইতে আসবেন?'

আমি তাঁকে বলেছিলাম—আমি বামপন্থী কিনা জানি না; নিশ্চিতভাবে জানি যে আমি গানবাজনাপন্থী। কাজেই আমার গান যদি আমায় গাইতে দেওয়া হয় তো আমার কোনও আপত্তি নেই তাঁদের অনুষ্ঠানে যেতে।

যুবকটি আরও দু'একবার এসেছিলেন। ভারি মার্জিত, স্বাভাবিক, শিক্ষিত ছেলে। কিন্তু শেষবেশ তাঁদের অনুষ্ঠানটি যথাসময়ে হল না। কাজেই—।

১৯৯২ ও ১৯৯৩ সালের গোড়া পর্যন্ত ছাত্র পরিষদের ইউনিয়ন-গুলিই বরং আমায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন—শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে, যেমন। তেমনি আর জি করে, ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে, যেখানে এস এফ আই ছিল না। অসামান্য শ্রোতা পেয়েছিলাম এই কলেজগুলোয়। ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে আমার অনুষ্ঠান চলা কালে কারা যেন বাইরে থেকে এসে হল্লা জুড়ে দিলেন। আমার আমন্ত্রণকারীরা বললেন—সি পি আই

এম। এস এফ আই। ওরা এসেছে আপনার অনুষ্ঠান বানচাল করে দিতে। আমায় এক কাপ কফি খেতে দিয়ে ন্যাশনালের ছাত্ররা বেশ গুছিয়ে ঠ্যাঙাতে শুরু করলেন বাম হল্লাকারীদের। মিনিট কুড়ি চলল সেই প্রতিরোধ ও প্রহার। আমি মঞ্চে বসে কফি খেতে খেতে দেখলাম, বুঝলাম—না ঠেঙিয়ে কোনও উপায় নেই। হল্লাকারীদের মধ্যে কেউ কেউ আমার নাম ধরে কাঁচা গালাগালও দিচ্ছিলেন। আহা, বাম, মার্ক্সিস্ট মতবাদ-নিঃসৃত খিস্তি। তার বদলা নিলেন ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ছেলেরা। আমায় কিছু করতে হল না। হল্লাকারীদের মেরে হটিয়ে দিলেন তাঁরা। তারপর আবার সবাই শান্ত হয়ে বসলেন। মনে আছে, দু'ঘণ্টা গানবাজনা শুনিয়েছিলাম তাঁদের।

অন্যদিকে আবার ১৯৯১ সালে এবং ২০০৩-০৪ সালে এস এফ আই এর গানের ক্যাসেটে আমাকে নতুন গান বেঁধে গেয়ে বাজিয়ে রেকর্ডও করে দিতে হয়েছে। ১৯৯১ সাল। তখনও আমি এই দেশ ও এই রাজ্যের অনেক কিছু ভাল বুঝতাম না। দীর্ঘকাল বিদেশে ছিলাম, ১৯৮৯ সালের একেবারে শেষ দিকে কলকাতায় ফিরে এসেছি পাকাপাকি। এর ওর মারফৎ এস এফ আই-এর আহ্বান এসেছিল একটি সময়োপযোগী গান তৈরি করে দেওয়ার। বস্তুত, সি পি আই এমের একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে আমার পরিচয়ও হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে সেই সময়ে কয়েকজন সহৃদয় মানুষকেও দেখেছিলাম, যেমন অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু মাইতি। বামফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচার অভিযানে গানও গেয়েছিলাম ১৯৯১ সালে। আমার তখন মূল লক্ষ্য ছিল শুধু একটি গিটার নিয়ে একজন বাংলা গান গাইছে এই ব্যাপারটা মানুষ কিভাবে নেয়। বাইরে গান গাওয়ার সুযোগই পাচ্ছিলাম না। তাছাড়া, নিজেকে কংগ্রেস দলের বিরোধী এবং বামপন্থীদের পক্ষে বলেই মনে করতাম। কাজেই বাধা কোথায়। কেউ কেউ পরে বলেছেন, আমি বামফ্রন্টের মঞ্চটা ব্যবহার করেছিলাম। একই যুক্তিতে বলা যায় বামফ্রন্টও আমার প্রতিভা ও সাংগীতিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য হল, নির্বাচনী প্রচারে তিনটি সভায় গিটার নিয়ে গান গাইলেও সি পি আই এম দলের কোনও কোনও মহল বোধহয় ভাল চোখে দেখেননি আমাকে।

১৯৯২/৯৩ সালেই সি পি আই এমের এক নেত্রী তাঁদের পত্রিকায়

একটি অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আমার বিরুদ্ধে আজেবাজে কথা বলে একটি নিবন্ধ লেখেন। অনুষ্ঠানটির আয়োজকরা (আমার বন্ধুস্থানীয়) সেই নেত্রীকে খুবই চিনতেন, সম্মান করতেন। আয়োজকদের মধ্যে দু'জন সি পি আই এম দলের কার্ডধারী সদস্যও ছিলেন। ভদ্রমহিলা তাঁদের পার্টির মুখপত্রে আমার অনুষ্ঠান সম্পর্কে লিখতে গিয়ে আমার নিন্দে করলেন একগাদা। লেখার সে কী উদ্ধত ভঙ্গি। যেন সবাই নেহাত তাঁর পায়ে পড়েছে বলে দয়া করে তিনি কথার প্রসাদ বিতরণ করেছেন আকাশ থেকে। মনে হচ্ছিল তিনি হীরাবাঈ বরোদেকর + বেগম আখতার + লতা মঙ্গেশকর + কার্ল মার্ক্সের স্ত্রী + লেনিনপত্নী ক্রুপস্কায়া + মার্ক্সবাদের ঈশ্বর জানেন আর কে কে! বেরসিকের মতো যা তা লিখলেন, কেবল, সম্ভবত বঙ্গমধ্যবিত্ত—মার্ক্সবাদী অনুপ্রেরণার আতিশয্যে ভদ্রমহিলা লিখতে ভুলে গেলেন যে সেই অনুষ্ঠানটি আমি বিনা পারিশ্রমিকে করছিলাম এক দুঃস্থ কীর্তনশিল্পীকে সাহায্য করার জন্য। এককালের নামজাদা সেই কীর্তনশিল্পী তখন নিদারুণ অর্থকষ্টে ছিলেন এবং তাঁকে সাহায্য করার জন্য সেই সময়ে আমি দুটি চ্যারিটি শো করেছিলাম, যার একটিতে 'গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি'র এই নেত্রী-তথা-লেখিকা ছিলেন আমন্ত্রিত। আমার বিরুদ্ধে তাঁর এবং তাঁর মতো সি পি আই এম নেতা ও সদস্যদের প্রধান অভিযোগ ছিল : আমি বানতলার ঘটনার ওপর একটি গান বেঁধে গাইছি। 'অনীতা দেওয়ান ক্ষমা ক'রো' গানটিতে কোথাও শাসক দল সম্পর্কে কোনও উল্লেখ ছিল না। অথচ সি পি আই এমের গোঁসা। অর্থাৎ, শাসক দলের আপত্তি থাকতে পারে এমন কোনও বিষয়ে গান-বাঁধা চলবে না। গানের বিষয় তাঁদের মনঃপূত, অনুমোদন-ধন্য হতে হবে। এই হল 'ডগমা'র গেরো। বুড়ো বয়সে আবার যৌবনের দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের ইস্কুলেই নাম লিখিয়েছি : "In our sad century of dogma."—বিংশ শতাব্দী চলে গিয়েছে, কিন্তু 'ডগমা' গেল কই?

১৯৮৩ সালে সলিল চৌধুরি যখন আমেরিকায় গিয়ে কিছুদিন আমার কাছে ছিলেন তখন তাঁর মুখে শুনেছিলাম তাঁর যৌবনে তাঁর দু'একটি গান সম্পর্কে কমিউনিস্ট নেতা ও দাদাদের কী ধরনের আপত্তি ছিল। 'গাঁয়ের বধূ'র শেষ দিকে সলিল লিখেছেন : 'আজও যদি তুমি কোনও গাঁয়ে দেখো ভাঙা কুটিরের সারি/জেনো সেইখানে সে-গাঁয়ের বধূর আশাস্বপনের

সমাধি।' পার্টির কোনও কোনও দাদা গানের এই জায়গাটা শুনে মহা খাপ্পা হয়ে বলেছিলেন—'বাংলার কৃষকরমণী লংকার গুঁড়ো হাতে লড়াই করছে, আর তুমি কিনা লিখে বসলে সে-গাঁয়ের বধূর আশাস্বপনের সমাধি?' —'গাঁয়ের বধূ' গানটির ওপর পড়েছিল এক ধরনের নিষেধাজ্ঞার কোপ। এই কাহিনী সলিল চৌধুরির কাছেই শোনা, নয়ত আমি আর জানব কোথা থেকে। ঠিক যেমন, কমিউনিস্ট পার্টির 'সিধে পথে মোক্ষ'র জ্ঞান শুনে শুনে অতিষ্ঠ হয়ে সলিল বেঁধেছিলেন 'পথ হারাব বলেই এবার পথে নেমেছি/সোজা পথের ধাঁধায় আমি অনেক ধেঁধেছি।'—এই কথাটাও আমি জানতে পেতাম না যদি না সলিল চৌধুরি আমায় বলতেন। কমিউনিস্ট মতবাদে যাঁরা বিশ্বাসী এবং যাঁরা মার্ক্সবাদী তাঁদের অনেকের মনেই একটা মোহ কাজ করে দেখেছি, যেটা ধর্মান্ধতার সমগোত্রীয়। অথচ রোজা লুক্সেমবুর্গের মতো মার্ক্সবাদী বলে গিয়েছেন— "Freiheit ist immer die der Andersdenkenden."— 'অন্যরকম ভাবনাচিন্তা যারা করে, তাদের স্বাধীনতাটাই স্বাধীনতা।' বিশ্বের অধিকাংশ মার্ক্সবাদীর কথাবার্তা শুনে, কাজকর্ম দেখে মনে হয় না তাঁরা রোজা লুক্সেমবুর্গের ঐ কথাটি মানেন। নিকারাগুয়ার বিপ্লবীরা কিন্তু দেখেছিলাম, ভিন্নমতাবলম্বীদের ক্ষেত্রে রোজাপন্থী।

বিপ্লবী সরকারের সংস্কৃতিমন্ত্রী ফাদার এর্নেস্তো কার্দেনালের আমন্ত্রণে নিকারাগুয়ার বিপ্লবের ওপর বাংলায় একটি বই লেখার জন্য ১৯৮৫ সালে মানাগুয়ায় পৌঁছনোর পরের দিন যে বিপ্লবী কমাণ্ডার আমার সঙ্গে বিপ্লব ও আমার কাজকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন তিনি স্পষ্ট বলেছিলেন, 'আপনার বইতে এ-দেশের বিপ্লববিরোধীদের বক্তব্য যদি যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে স্থান না পায় তাহলে বুঝব আমাদের বিপ্লবের আপনি কিছুই বোঝেননি।' পশ্চিম জার্মানির এক পরিচালক নিকারাগুয়ার বিপ্লবের বিরুদ্ধে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করেছিলেন। সংস্কৃতিমন্ত্রী ফাদার এর্নেস্তো কার্দেনাল সেই ছবিটির কয়েকটি কপি সরকারকে দিয়ে কিনিয়ে দেশের চারদিকে দেখান, যাতে নিকারাগুয়ার জনগণ বিরুদ্ধ মতটাও জানার সুযোগ পান। আফশোসের বিষয়, আমাদের দেশের অধিকাংশ বিপ্লববাদী কমিউনিস্ট ও মার্ক্সবাদীর মধ্যে এই গুণটি দেখিনি, দেখি না। অন্যদিকে, কমিউনিস্ট বা

মার্ক্সবাদী যাঁরা নন তাঁদের মধ্যেও সচরাচর দেখি না এই বৈশিষ্ট্য। পরমত-অসহিষ্ণুতা আমাদের মধ্যে অনেকেরই বৈশিষ্ট্য।

যাই হোক, 'অনীতা দেওয়ান' গানটি নিয়ে সি পি আই এম দলের সঙ্গে আমার গোলমাল শুরু হয়ে যায়। তাঁদের কেউ কেউ ফোঁস করায় আমিও পালটা ফোঁস করতে থাকি। সেই সময়ে সি পি আই এম বিরোধী মার্ক্সবাদীদের মধ্যে কেউ কেউ আমায় সমর্থন জানান। মোটের ওপর তখন থেকেই দূরত্ব তৈরি হয়ে যায় ঐ দলটির সঙ্গে আমার। শুনতে পেতাম, অনেক সি পি আই এম-প্রধান এলাকায় ক্যাসেটের দোকানে আমার ক্যাসেট সাজিয়ে রাখতে দেওয়া হয় না। তার অনেক পরে, ২০০৬/২০০৭ সালে আমার 'নন্দীগ্রাম' অ্যালবামটি এবং সেই সঙ্গে আমার যে কোনও অ্যালবাম অনেক পাড়ায়, জেলা শহরে দোকানদাররা সাজিয়ে রাখতে গিয়ে সি পি আই এম কাডারদের বিরাগভাজন হয়েছেন, কাডাররা তাঁদের হুমকি দিয়ে গিয়েছেন। এই খবরটি আমায় দিয়েছেন নন্দীগ্রাম অ্যালবামটির প্রকাশক সংস্থা এবং কয়েকজন সাংবাদিক। কিছুদিন আগে মহাশ্বেতা দেবী আমায় জানান, তাঁর কাছে খবর আছে কোনও এক গ্রামে এক যুবকের কাছে আমার 'নন্দীগ্রাম' অ্যালবাম এবং 'কেমিকাল হাব—এক নিঃশব্দ ঘাতক' এই গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকাটি পাওয়া গিয়েছে বলে যুবকটিকে নাকি মাওবাদী সন্দেহে গ্রেফতার করা হয়েছে। খবর পাওয়া যায়, অজয় বাগদি নামে ঐ যুবককে কয়েদে পোরা হয় এবং সেখানেই তাঁর ঝুলন্ত মৃতদেহও পাওয়া যায়। তাঁর পরিবারের অভিভাবকস্থানীয় কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া হয় যে অজয় বাগদি পারিবারিক অশান্তির কারণে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন। আমার গানের একটি অ্যালবাম শোনা ও বন্ধুদের শোনানোর 'অপরাধে' যদি গ্রামের এক যুবককে 'মাওবাদী' সন্দেহে এইভাবে মেরে ফেলা যায় তাহলে আমিও মাওবাদীই বলব নিজেকে। আমার 'নন্দীগ্রাম' শোনার কারণেই তো প্রাণ দিতে হল আমার পুত্রতুল্য এক যুবককে। আমার তাহলে কী করা উচিত?

১৯৯৩ সালের পর থেকে সি পি আই এম এল লিবারেশন দলের দু'একজন সদস্য ও নেতার সঙ্গে আমার পরিচয়, এমনকি বন্ধুতাও হয়। তাঁদের অনুরোধে আমি বিনা পারিশ্রমিকে একক অনুষ্ঠান করে দিয়েছিলাম তাঁদের দলীয় কোনও একটি কার্যক্রমের স্বার্থে টাকা তোলার জন্য। —এস

ইউ সি আই দলের দু'একজন সমর্থকের সঙ্গেও আমার বন্ধুতা হয়েছিল। এত নিষ্ঠাবান সদস্য-সমর্থক বাংলার আর কোন্ দলে আছে আমি জানি না। এই কথাটি পড়ে অনেকেই হয়ত রেগে যাবেন আমার ওপর। কিন্তু আর কোনও সংসদীয় দল দেখিনি যার সদস্যরা এত কায়মনোবাক্যে তাঁদের দলের হয়ে কাজ করে যান। তেমনি, সি পি আই দলের দু'একজন নেতাও আমায় স্নেহের চোখেই দেখেছেন বলে মনে হয়েছে, যেমন নন্দগোপাল ভট্টাচার্য। ১৯৯২ সালেই তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল।

১৯৯৭/১৯৯৮ সালে আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তৎকালীন 'পীপ্‌ল্‌স্ ওয়ার'-এর গণশিল্পী গদর ও কবি ভারাভারা রাও-এর। আমি কস্মিনকালে কমিউনিস্ট না, বরং এক ধরনের অ্যানার্কিস্ট, তাও 'পি ডবলিউ'-এর কোনও কোনও নেতা ও সদস্য বোধহয় আমার বাঁধা গানের জন্য আমায় পছন্দ করতেন। সি পি আই এম দলের সঙ্গে আমার প্রকাশ্য বিরোধও হয়ত তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল আমার দিকে। শুনেছি আমার কোনও কোনও গানের বিষয় তাঁদের ভাল লেগেছিল। যেমন 'কার জঙ্গল কাদের দখলে।' এই গানটি লেখার পেছনে এক পি ডব্‌লিউ অ্যাক্‌টিভিস্টের কাছ থেকে পাওয়া কিছু তথ্যের ভূমিকা ছিল। আমার এই ধরনের গান একজন ইংরিজিতে অনুবাদ করে ঐ দলের নেতাদের দিয়েছিলেন শুনেছি। 'পি ডবলিউ'-এর অন্ধ্র-নেতাদের কাউকে কাউকে, বিশেষ করে গদরকে আমি একাধিকবার বলেছি—তোমরা যদি কখনও রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করো তাহলে আমাকে, আমার মতো লোককে তোমরা আগে জেলে পুরবে। শুনে তাঁরা সকলেই হেসেছেন। অস্বীকার করব না, একমাত্র এই দলের অন্ধ্র-নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল। অত লেখাপড়া জানা, শিক্ষিত ও রসিক পরিহাসপ্রিয় 'কমিউনিস্ট' আমি আর দেখিনি। পরে 'মাওবাদী' ফর্মেশনটি তৈরি হওয়ার পর আমার সঙ্গে কারুরই বিশেষ যোগাযোগ হয়নি। মাঝে একবার ভারাভারা রাও-এর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আর গদরের সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছিল কলকাতায় একটি গানের অনুষ্ঠানের ব্যাপারে। এক দল যুবক ভাবছিলেন গদর আর আমাকে দিয়ে একটি অনুষ্ঠান করাবেন, সেই টাকাটা দেওয়া হবে নন্দীগ্রামের সংগ্রামে। গদরের শরীরে এখনও বুলেট বিঁধে আছে, নানান শারীরিক কষ্টের মধ্যে তাঁর দিন কাটে,

গানও তিনি আর সব সময়ে গাইতে পারেন না। তাই তিনি সেই সময়ে অনুষ্ঠান করতে চাইছিলেন না। তাও তিনি বলেছিলেন, কিছুদিন পরে আমি অবশ্যই চেষ্টা করে দেখব, তোমার সঙ্গে মঞ্চে অনুষ্ঠান করব।

আমি কোনও বাদী নই। তবে এটা অস্বীকার করতে পারি না যে যত দিন যাচ্ছে তত মহাত্মা গান্ধীর অনেক নীতির প্রতি, বিশেষ করে অনেক ক্ষেত্রে অহিংস সত্যাগ্রহের ভূমিকার প্রতি আমার আকর্ষণ যেমন বাড়ছে, তেমনি এই ধারণাও আরও বেশি পোক্ত হচ্ছে যে শাসক যদি অস্ত্রের সাহায্য নিয়ে গণ-আন্দোলন ও অবহেলিত, নিপীড়িত মানুষের জাগরণকে শেষ করে দিতে চান তাহলে তার জবাব অস্ত্র দিয়েই দিতে হবে। সশস্ত্র প্রতিরোধ ছাড়া সে-ক্ষেত্রে আর কোনও উপায়ই থাকবে না। সত্তর দশকের গোড়ায় কলকাতার দেয়ালে দেয়ালে দেখতাম মাও-এর উদ্ধৃতি : 'রাজনৈতিক ক্ষমতা বন্দুকের নল থেকে বেরিয়ে আসে।' কথাটা যে কত সত্যি তা আজ হাড়ে হাড়ে টের পাই। আমার সময়ই আমায় টের পাইয়ে দিয়েছে, সমানে দিচ্ছে।

২০০৩ সালে আমি তারা টেলিভিশন চ্যানেলে 'লাইভ দশটা'য় নামে একটি লাইভ আলোচনা অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্ব নিই। সেই প্রথম আমি এই রাজ্যের বিভিন্ন দলের রাজনীতিকদের স্বচক্ষে দেখি, তাঁদের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ পাই। এই অনুষ্ঠানটি করতে গিয়ে আমার নানান শিক্ষা হয়। যেমন কংগ্রেস ও তৃণমূল দলের একাধিক নেতার সঙ্গে দিব্যি তর্ক করা যায়, তাঁদের বিরুদ্ধে কথা বলা যায়, অথচ তাঁরা গোঁসা করেন না। তৎকালীন তৃণমূল নেতা (পরে কংগ্রেস নেতা) নির্বেদ রায় ও তাঁর সতীর্থ অরুণাভ ঘোষের সঙ্গে তো আমার বন্ধুতাই হয়ে গেল। আজ যদি আমায় কেউ বলেন—বাংলার রাজনীতিকদের মধ্যে কার সঙ্গে আড্ডা দিতে চাও, আমি প্রথমেই বলব নির্বেদ রায়। অরুণাভবাবুও চমৎকার মানুষ। তেমনি তৃণমূল নেতা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও হল এক ধরনের বন্ধুতা। বাল্যবন্ধু পরশ দত্তর সঙ্গেও আবার দেখা হয়ে গেল। তিনি তখন তৃণমূল কংগ্রেসে। পরে তিনি কংগ্রেসে যান। সৌগত রায়ের সঙ্গে পরিচয় হল, পরিচয় হল রসিক ও তুখোড় রাজনীতিক সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সুব্রতবাবুর সঙ্গে কখনও আড্ডা দিইনি, সে সুযোগ পাইনি, কিন্তু

একাধিকবার ক্যামেরার সামনে তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে, তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে এই মানুষটির সঙ্গে দিব্যি আড্ডা দেওয়া যায়। বিজেপি দলের নেতা তথাগত রায় হয়ে ওঠেন আমার এক প্রিয় অতিথি। রাজনৈতিক মতবাদের দিক দিয়ে আমাদের মধ্যে কোনও মিলই নেই। কিন্তু অমন রসিক, শিক্ষিত, মজাদার ও তুখোড় তর্কনিষ্ঠ মানুষ এ-জীবনে কমই দেখেছি। রাজনৈতিক মতবাদের নিকুচি করেছে—পরিহাসপ্রিয়, তির্যক-বাক্যবাণ-নিক্ষেপে সিদ্ধ, লেখাপড়া করা, বাক্‌পটু মানুষদের একটি তালিকা যদি আমায় কেউ তৈরি করতে বলেন তো প্রথমেই আমি লিখব তথাগত রায়ের নাম। যে-কোনও অবস্থায়, যে-কোনও মুহূর্তে পরশুরাম ও সুকুমার রায়ের রচনা থেকে জুৎসই উদ্ধৃতি, যা দেখেছি, একজনই অনায়াসে দিতে পারেন। তথাগত রায়।

বামপন্থী নেতাদের মধ্যে খোলামেলা সম্পর্ক হয়েছে আর এস পি নেতা মনোজ ভট্টাচার্যর সঙ্গে। আর-এক আর এস পি নেতা ক্ষিতি গোস্বামীর মধ্যেও দেখেছি এক পরিশীলিত আলোচনাকারীকে যিনি দরকার হলে সি পি আই এমের সমালোচনা করতে পিছপা হন না। সি পি আই নেতা মঞ্জুকুমার মজুমদার যে কত স্নেহশীল একজন মানুষ তার পরিচয় পেয়েছিলাম 'লাইভ দশটা'য় সঞ্চালনা করতে গিয়েই। ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা জয়ন্ত রায়, দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কেও ভাল লেগেছিল। ভাল লেগেছিল হাফিজ আলম সৈরানিকে। তাঁর সঙ্গে আলাপ ও বন্ধুতা হয়েছিল আল আমীন মিশনে। মিশুকে, সজ্জন মানুষ। তেমনি সি পি আই এমের বর্ষীয়ান নেতা বিনয় কোঙারের সঙ্গে আলাপ করেও ভাল লেগেছিল। আমার মনে আছে, প্রথম আলাপে তিনি আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন—ছেলেমেয়ে কটি? বাবা-মা এখনও আছেন? এই ধরনের স্বাভাবিক প্রশ্ন আজকাল কেউ করে না। বিনয় কোঙার আরও একটি কথা আমায় একাধিকবার বলেছিলেন সেই প্রথম সাক্ষাতেই : 'আপনার গানের একটা ইনস্টিটিউট তৈরি করুন, নয়ত এরা কিছুই রাখবে না।' এই 'এরা' যে কারা তা আর জানতে চাইনি তাঁর কাছে সেদিন। জানি না, বিনয় কোঙার মহাশয়ের মনে আছে কিনা। মোট কথা তাঁর সঙ্গে নানান কথাই হয়েছিল অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে। একটু আগে আগেই এসে গিয়েছিলেন তিনি। ভাল লেগেছিল তাঁকে।

কথা বলে ভাল লেগেছিল সি পি আই এম নেতা বিমান বসুকেও। এক সময়ে তিনি আমায় বলেছিলেন—বিদ্যাসাগর আর বেগম রোকেয়ার ওপর কিছু কাজ করার ইচ্ছে আছে, আপনাকে পাব? আমি তাঁকে কথা দিয়েছিলাম। তারপর আর তাঁর কাছ থেকে ঐ মর্মে কিছু শুনিনি। সুভাষ চক্রবর্তী মহাশয়ের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়েছিল ১৯৯১ সালে শুভেন্দু মাইতি মারফৎ। ভাল লেগেছিল তাঁর খোলামেলা কথাবার্তা। 'লাইভ দশটা'য় তাঁকেও অতিথি হিসেবে পেয়েছি। চাঁচাছোলা কথা বলেন। কাউকে রেয়াত করেন না। মিশুকে মানুষ। এখানে রাজনৈতিক মতবাদ বা মন্ত্রী হিসেবে তিনি কতটা দায়িত্বশীল সেই সব প্রসঙ্গের কোনও ভূমিকাই নেই।

'লাইভ দশটা'য় অনুষ্ঠানটি করতে গিয়ে আমি দেখতে পেয়েছিলাম—১৯৯২ সাল থেকে সি পি আই এম দল আর আমার মধ্যে যে বিরোধাভাস ছিল এবং কালক্রমে যা বেড়েছিল বৈ কমেনি, ২০০৩ সালে তারা চ্যানেলের স্টুডিওতে কিন্তু তার কোনও জের টেনে আনছেন না সি পি আই এম দলের কোনও নেতা। আমার দিক থেকেও তাঁরা কোনও বৈরিতা দেখেছেন বলে আমার মনে হয় না। তবে, ২০০৫ সাল থেকে তারা নিউজের দপ্তরে শুনতে পাচ্ছিলাম সি পি আই এমের কোনও নেতা নাকি আমার সঙ্গে 'মতামত' অনুষ্ঠানে বসতে চাইছেন না। ২০০৬ সালে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের আন্দোলন তুঙ্গে ওঠার পর সি পি আই এম দল আমার লাইভ অনুষ্ঠানটি একরকম বয়কটই করলেন। ফলে বামফ্রন্টের দৃষ্টিভঙ্গির জন্য আমরা বারবার বামফ্রন্টের অন্য শরিকদের শরণ নিয়েছি।

কোনও দলের কোনও নেতার সঙ্গেই তারার কোনও লাইভ অনুষ্ঠানে আমার সমস্যা হয়নি কেবল কংগ্রেসের প্রদীপ ভট্টাচার্য আর এস এফ আই-এর এক নেতার (কী যেন নাম, ভুলে গিয়েছি, ঐ ব্যক্তির নাম জেনে নেওয়ার জন্য আর একে তাকে বিরক্ত করতে ইচ্ছে করে না) ক্ষেত্রে ছাড়া। দু'জনেই ভিন্ন ভিন্ন কারণে আমার সঙ্গে মহা চোটপাট করেছিলেন। তাঁরা বিজ্ঞজন, পোড় খাওয়া পলিটিশিয়ান, নিশ্চয়ই আমারই দোষ ছিল, কী আর বলব। তবে দুজনের হাবভাব দেখেই আমার কষ্ট হচ্ছিল। হাসি চাপতে গিয়ে মাঝেমাঝে এক ধরনের কষ্ট হয় না?

কংগ্রেস নেতা আবদুল মান্নান একবার আমার ওপর খুব রেগে

গিয়েছিলেন। রেগেমেগে তিনি ক্যামেরার সামনে বেশ কড়াকড়া কথা বলেছিলেন আমাকে লক্ষ্য করে। অনুষ্ঠানটি রেকর্ড করা হচ্ছিল। আমি এডিটরকে বলে দিয়েছিলাম—মান্নান সাহেবের একটি কথাও যেন বাদ না দেওয়া হয়। আমার বিরুদ্ধে তাঁর করা প্রতিটি উক্তি সম্প্রচার হয়েছিল তারা চ্যানেল থেকে। তারপর একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়। তিনি এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে বলেন, 'আপনি আর তারা চ্যানেল সত্যিই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ মেনে চলেন। আপনার সম্পর্কে যা যা বলেছিলাম তার একটি কথাও আপনি কেটে বাদ দেননি।'

কেন জানি না, লোকে যাঁদের 'দক্ষিণপন্থী' বলে থাকে, তাঁদের অনেকেই দেখেছি রাগ পুষে রাখেন না, অতীত তিক্ততা ভুলে যান, হাসাহাসি করেন, এমনকি ভুল কবুল করেন। কতকগুলো মৌলিক দিক দিয়ে তাঁরা আরও স্বাভাবিক। 'বামপন্থী' সুনাম যাঁদের, তাঁদের কারও কারও মধ্যে দেখেছি উল্টোটা। অপরের মত মান্য না করার একটা প্রবণতা। 'Let us agree to disagree'—এই নীতিতে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ঠিক যেন বিশ্বাসী নন। তেমনি, সি পি আই এম এল লিবারেশন দলের নেতা দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের মধ্যে দেখেছিলাম এক পরিশীলিত, যুক্তিনিষ্ঠ, শিক্ষিত ও পরিমিতি বোধ সম্পন্ন মানুষকে। তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ ও ধ্যানধারণার সঙ্গে আমার মতামতের হয়ত ফারাক আছে। তবু তাঁর প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল। লিবারেশনের দীপঙ্করবাবুর সঙ্গে যখনই দেখা হয়েছে, তিনি আমায় জোরেসোরে বলেছেন—আরও গান তৈরি করুন, প্লীজ। আর সবকিছু ছেড়ে দিয়ে গান তৈরি করুন, গান করুন।

যাই হোক, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকদের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়া, তাঁদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম 'লাইভ দশটা'র সুবাদেই। তার আগে এমন সুযোগ পাইনি। 'লাইভ দশটা'য়-এর পর তারা নিউজের মতামত অনুষ্ঠান করতে গিয়েও বিভিন্ন দলের রাজনীতিকের সঙ্গে আলাপ হয়।

২০০৩/২০০৪ সালে আমার এক পরিচিত সরকারি কর্মকর্তা আমায় জানান, এস এফ আই-এর একটি নির্বাচনী ক্যাসেটের জন্য আমাকে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী একটি গান তৈরি করে দিতে হবে। প্রথমে আমি রাজি হইনি। বলেছিলাম—এমনিতে তো সি পি আই এম আর এস এফ আই

অনেক পেছনে লেগেছেন আমার, সে তো অনেক বছরের গপ্প। এখন আবার গান বাঁধা কেন। ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা। শেষে বলেই ফেললেন, আপনার একটু অসুবিধে হবে।

তখন তারা চ্যানেলের 'লাইভ দশটা'য় অনুষ্ঠানে 'ইলেকশান স্পেশাল' চলছে। তিনি আমায় প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিলেন আমি রাজি না হলে ঐ অনুষ্ঠানে সি পি আই এম থেকে তেমন কেউ হয়ত আসবেন না।

আমার মাথায় বাজ পড়ল। ঐ অনুষ্ঠানটির ওপর তারার কর্তারা বাজি ধরে বসে আছেন। বেশ কয়েকজন প্রকৌশলীর চাকরিও সম্ভবত অনুষ্ঠানটির সঙ্গে জড়িত। সি পি আই এম যদি বয়কট করে তো সর্বনাশ। নির্বাচনী প্রস্তুতির বাজারে এ-রাজ্যের শাসকদল যদি আমাদের স্টুডিওয় না আসেন তাহলে চলবে কী করে। আমি বাধ্য হলাম বরাত বা নির্দেশ অনুযায়ী সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী একটি গান বেঁধে, সেটি গেয়ে বাজিয়ে রেকর্ড করে দিতে। আমার গানের সঙ্গে আমিই বাজনা বাজাই, ফলে আমায় দিয়ে কাজ করালে 'প্রোডাকশন কস্ট' শূন্য, কেবল স্টুডিয়ো ভাড়াটা লাগে। আর আমাকে পারিশ্রমিক দেওয়া? বলেন কী? শাসকদল বলে কথা। আমাদের দেশের শাসকদের কাছে, সাধারণভাবে যা দেখলাম, রাজনীতিকদের কাছে গানবাজনা কতকটা চীনে বাদামের মতো। ফাটালেই বেরিয়ে পড়ে। এবার মুখে পুরে ফেললেই হল। তাছাড়া, বাম শাসকদল। তার ওপর 'লাইভ দশটা'য়। ঠেকায় পড়ে আমি লক্ষ্মী ছেলের মতো সুড়সুড় করে কাজটা করে দিলাম। 'রুখে দাও ধর্ম নিয়ে রাজনীতি এই দেশটা জুড়ে' গানটি বাঁধতে, মিউজিক ট্র্যাকগুলি কয়েকদিন ধরে বাজিয়ে বাজিয়ে রেকর্ড করতে এবং স্টুডিয়োয় গিয়ে গানটি গেয়ে সবকটি ট্র্যাক 'মিক্স' করতে আমার কতটা পরিশ্রম হয়েছিল (সৃজনশীলতার দিকটি না হয় ছেড়েই দিলাম, কারণ এই বস্তুটি নিয়ে ডান-বাম কোনও রাজনীতিক বা নেতাই আদৌ চিন্তা করেন বলে আমার মনে হয় না) তা আমিই জানি।

রেকর্ডিং-এ সেই সরকারি কর্মকর্তা এবং আমার অনুজপ্রতিম এক গান-কারিগর ও শিল্পী উপস্থিত ছিলেন। আমাকে একটি পয়সাও দিতে হয়নি তাঁদের অথবা এস এফ আই বা সি পি আই এম বা বামফ্রন্ট সরকারকে। চাপ দিয়ে বিনি পয়সায় কাজও আদায় করে নিলেন, আবার

পরবর্তী কালে অন্য পরিস্থিতিতে আমার নামে এঁরাই কুৎসিত গালাগালিও দিয়ে বেড়ালেন সর্বত্র।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। রেকর্ডিং-এর পরেই একদিন 'লাইভ দশটা'য় বিজেপির তথাগত রায় আমার অতিথি ছিলেন। সঞ্চালক হিসেবে কোনও পক্ষের দিকে ঝোঁকা উচিত নয়। কিন্তু এস এফ আই-এর নির্বাচনী প্রচার-ক্যাসেটের জন্য একটি গান বেঁধে গেয়ে দিয়ে আমি হয়ত একটি পক্ষ নিয়েই ফেলেছি।

এই খবরটা তথাগতবাবুকে দিলাম— একটু লজ্জিত-লজ্জিত মুখ করে। তথাগতবাবু কিন্তু গা করলেন না। বললেন, 'তাই? আমাদের দলেও এসব করার লোক আছে।' এই নিয়ে তথাগত রায় কোনওদিন অনুষ্ঠান চলাকালে আমায় খোঁচা দিয়ে কোনও কথা বলেননি।

মনে আছে, সেই সরকারি ভদ্রলোককে টেলিফোনে সম্মতি জানানোর একটু পরেই তারা স্টুডিয়োতে আমাদের সাংবাদিক অরূপ কালীর সঙ্গে দেখা। এক গাল হাসি নিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে তিনি জানালেন—'সুমনদা, আর কোনও সমস্যা নেই। "অমুক জায়গা" থেকে "তমুক" আমায় এইমাত্র ফোন করে জানালেন যে সি পি আই এমের নেতারা আমাদের অনুষ্ঠানে আসবেন।'

এই হলেন সি পি আই এম। এত দ্রুত তাঁরা কাজ করতে পারেন। এতটাই ঠাসবুনোট তাঁদের সংগঠন, এত দ্রুত তাঁদের খবর এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পৌঁছে যায়। বেচারি অরূপকে সেদিন বোধহয় বলিনি এ জন্য আমায় কী করতে হচ্ছিল। সরকারের সেই ভদ্রলোক আমার সম্মতি পেয়েই বলেছিলেন—খবরটা তাহলে প্রেসে দিয়ে দিই—যে কবীর সুমন এস এফ আই-এর নির্বাচনী ক্যাসেটের জন্য গান তৈরি করছেন এবং গাইছেন?—খবরটা তার পরের দিনই একটি বামপন্থী পত্রিকায় বেরিয়েছিল। প্রফেশনাল কাজ। শুধু, পারিশ্রমিক নেই। হেঁ হেঁ, চীনে বাদাম যে! ২০০৬ সাল থেকে এই এস এফ আই দল আমার সম্পর্কে চমৎকার চমৎকার সব কথা পোস্টার বানিয়ে লিখতে থাকেন, ইন্টারনেটেও ছেড়ে দেন।

এক

তাঁকে প্রথম দেখেছিলাম কানোরিয়া শ্রমিক আন্দোলনের সময়ে উলুবেড়িয়ার ময়দানে। তিনি রাজনীতির মানুষ। নেত্রী। আমি একজন সঙ্গীতশিল্পী ও অ্যাকটিভিস্ট। তিনি যখন মঞ্চে ছিলেন আমি ছিলাম বাইরে। কারণ, আন্দোলনের নেতাদের আমি বলে দিয়েছিলাম কোনও রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে আমি মঞ্চে থাকব না। ১৯৯৪ সালের গোড়া। তার আগেই শুনেছিলাম তিনি অসম্ভব লোকপ্রিয়। তাঁকে সামনে থেকে দেখিনি কোনওদিন। দূর থেকেও না। সত্যি বলতে, রাজনীতিকদের সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ আমার কোনওদিনই ছিল না, এখনও নেই। বামপন্থীরা, দেখতাম, এই মানুষটিকে একদম পছন্দ করছেন না। অথচ, এও দেখতাম, এ-রাজ্যের সাধারণ মানুষ, আমার চেনাজানা সাধারণ মানুষ এঁকে দারুণ পছন্দ করছেন। পরিচিত বামপন্থীরা এঁর সম্পর্কে নানান খারাপ মন্তব্য করতেন। কাউকে কাউকে আমি বলেছি সে সময়ে—এত রাগ কেন? মেয়ে বলে? একটি বাঙালি মেয়ে রাজনীতির ময়দান কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছেন, তোমাদের পছন্দ হচ্ছে না, তাই তো?—কিন্তু তাঁর রাজনীতি যে কী সে-সম্পর্কে বিশদ জানার কোনও আগ্রহ আমার ছিল না। মোদ্দা কথা, যা বুঝতাম, তিনি সি পি আই এমের ঘোর বিরোধী এবং এই দলের পতন চান। সি পি আই এম দলটি ১৯৯২ সালে থেকে নানান ভাবে আমার পেছন লাগায়, মিথ্যে বলব না, এই মানুষটির সি পি আই এম বিরোধী লড়াই আমার ভাল লাগত, যদিও এও মনে হত যে তিনি খুব আবেগপ্রবণ, নাটকীয়তার দিকেও ঝোঁকেন তিনি কখনও-সখনও। রাজনীতিতে পারফর্মেন্স একটা বড় ব্যাপার। অনেক বড় রাজনীতিক বড় পারফর্মারও। কিন্তু আমার মনে হয় রাজনীতিতে ঠাণ্ডা

মাথা, সুকৌশলেও অনেক কিছু করা দরকার। এই বৈশিষ্ট্য আমার নেই, তাই রাজনীতি আমার ক্ষেত্র নয়। শিল্পী, স্রষ্টা চিরকালই অধৈর্য, ছটফটে। আমার এই বৈশিষ্ট্য আবার রাজনীতিকের থাকলে মুশকিল। সেই সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাবার্তায়, আচরণে স্থৈর্য ও চাতুরিপূর্ণ রণকৌশল পেতাম না। পেতাম সারল্য ও প্রত্যক্ষতা যা কয়েকটা দিক দিয়ে আধুনিক রাজনীতির সঙ্গে সব সময় সংগতি রাখে না। কিন্তু সেই সঙ্গে, সাধারণ মানুষজনের কথা শুনে, তাঁদের প্রতিক্রিয়া থেকে এও মনে হত যে এই মানুষটির গণ-আবেদন তাঁর ঐ সোজাসাপ্টা অনাড়ম্বর আবেগপ্রধান বৈশিষ্ট্যেই। ব্যাস। এর বেশি তাঁকে নিয়ে ভাবিনি। এক দম্পতি ছিলেন, আমার বেশ বন্ধু। তাঁরা ছিলেন সি পি আই এমের সদস্য। একবার কলকাতার এক পুলিশ একটি মেয়েকে থানায় তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। পরে জানা যায় সেই আইনরক্ষকটি সি পি আই এমের সঙ্গে কিভাবে যেন যুক্ত। যেদিন ঘটনাটি ঘটে তার পরের দিন ঐ দম্পতি আমার বাড়িতে আসেন এবং আমায় বোঝাতে চেষ্টা করেন—ওটা আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ষড়যন্ত্র।

আমি জানতে চেয়েছিলাম—এমন অভিযোগ করছ কিসের ভিত্তিতে?

তাঁরা গম্ভীর মুখে বলেছিলেন, তুমি তো বিদেশে ছিলে, জানো না ইনি আসলে কেমন। সি পি আই এমকে অপদস্থ করতে ইনি সব পারেন।

আমি বলেছিলাম—তোমরা বলতে চাইছ ঐ পুলিশটা, যে কিনা তোমাদের পার্টির কী যেন একটা হয়, ঐ মমতার প্রভাবে বা টাকা খেয়ে ধর্ষণ করেছে?

আমার দুই সি পি আই এম পার্টি মেম্বার বন্ধু একযোগে বলে উঠলেন—এক্‌জ্যাক্টলি। আমাদের পার্টির সঙ্গে বিন্দুমাত্র যোগ যার আছে সে কখনও এমনিতে ধর্ষণ করতে পারে না।

আমি বলেছিলাম—এমনিতে পারে না বলছ, ওমনিতে?

ঐ দুই ব্যক্তির সঙ্গে আমার সম্পর্কের ওপর সেই মুহূর্তেই একটা বড় চোট পড়ল—এমনিতে এবং ওমনিতেও। বামপন্থীদের সঙ্গে বন্ধুতা করতে গিয়ে এ-জীবনে বারবার তাঁদের অদ্ভুত 'ধর্মান্ধতা'র মুখোমুখি হতে হয়েছে।

তেমনি, র‍্যাডিকাল রাজনীতিতে বিশ্বাসী দু'একজনের সঙ্গে ১৯৯৩ সালে বন্ধুত্ব হওয়ার পর দেখেছি তাঁরা কিন্তু মমতাকে অন্য চোখে দেখছেন।

তাঁদের একজনের সঙ্গে গ্রামবাংলার পরিচয় ছিল নিবিড়। তিনি আমায় বলেছিলেন—মমতাকে বাদ দিয়ে এ-রাজ্যে সি পি আই এম বিরোধী রাজনীতি সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য, গ্রামবাংলায় এঁর আবেদনের পরিচয় পেয়েই তিনি এই মত পোষণ করছিলেন। আমি কিন্তু তেমন আগ্রহী ছিলাম না এই মানুষটি বা সংসদীয় রাজনীতির অন্য কোনও নেতা বা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে। বস্তুত, ২০০৩ সালে তারা চ্যানেলে লাইভ দশটায় সঞ্চালনা করার আগে এ-রাজ্যের বেশিরভাগ রাজনৈতিক নেতাকে আমি চোখেও দেখিনি, দেখেছি পত্রিকার ছবিতে। ১৯৯১ সালে শুভেন্দু মাইতি আমায় নিয়ে গিয়েছিলেন বামফ্রন্টের মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর কাছে। ১৯৯০ সালের শেষ দিনে লোকমুখে আমার কথা শুনে আমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিলেন শুভেন্দু মাইতি। তাঁকে আমি বলেছিলাম পীট সীগার আমায় চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন তিনি একবার কলকাতায় অনুষ্ঠান করতে চান, সে-ব্যাপারে আমি তাঁকে কোনও দিক দিয়ে সাহায্য করতে পারব কিনা। আমি কী করে সাহায্য করব! শুভেন্দু মাইতি আমায় বলেছিলেন শাসক দল ও মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর ভাল সম্পর্ক এবং আমায় তিনি, পীট সীগারের চিঠি সমেত, নিয়ে যাবেন মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে। ঐভাবে সুভাষ চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার আলাপ। সে আলাপও বেশি দূর গড়ায়নি, কারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার পীট সীগারকে কলকাতায় আনার ব্যাপারে বিশেষ কিছু করতে পারেননি। পীট কলকাতায় গাইতে আসেন ১৯৯৬ সালে, ভারতের সংস্কৃতি দপ্তরের আমন্ত্রণে। সংস্কৃতি দপ্তরকে তিনি আমেরিকা থেকেই জানান যে কলকাতায় তিনি আমার সঙ্গে অনুষ্ঠান করতে চান। সংস্কৃতি দপ্তর তখন দস্তুরমত অবাক হয়ে (কারণ আমি কে হরিদাস পাল রে বাবা, পীট সীগার যার সঙ্গে অনুষ্ঠান করতে বদ্ধপরিকর!) আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ভাগ্যিস ব্যাপারটা পশ্চিমবঙ্গের সি পি আই এম দলের হাতে ছিল না। থাকলে ওঁরা হয়ত আমার সঙ্গে অনুষ্ঠান করার শর্তে পীট সীগার অনড় থাকলে ওঁর সফরটাই বাতিল করে দিতেন, এতই ঘৃণা করতেন আমায় ওঁরা ততদিনে। 'সোনার বাংলা' নামে এক সি পি আই এম-ঘেঁষা দৈনিক পত্রিকায় প্রায়ই আমার সম্পর্কে নানান কু মন্তব্য, ঠাট্টা বিদ্রূপ থাকত, সেই সঙ্গে থাকত আমার কার্টুন। বেচারি অঞ্জন দত্ত আমার

সম্পর্কে ভাল কথা বলে ফেলায় সোনার পত্রিকা 'সোনার বাংলা' তাঁকেও আক্রমণ করতে শুরু করে। তেমনি সি পি আই এম-র বশংবদ যে গায়ক ১৯৯৩ সালের গোড়া থেকে নানান পত্রিকার সাক্ষাৎকারে আমার সম্পর্কে ঠেস দিয়ে কথা বলতেন, সি পি আই এম মন্ত্রীবর সুভাষ চক্রবর্তীর বদান্যতায় নিয়মিত সেই দলের ছাত্র ও যুব শাখার জলসা করে বেড়াতেন রাজ্য জুড়ে, এমনকি তাঁদের গানের অনুষ্ঠানেও কোথাও কোথাও 'তোমাকে চাই চাই না' বলে হুংকার ছেড়েছিলেন তাঁর সম্পর্কে থাকত ভূয়সী প্রশংসা। এক বিশিষ্ট সাংবাদিক, লেখক, ভাবুক, দার্শনিক, শিল্পবোদ্ধা, রসচূড়ামণি সেই 'সোনার বাংলা'র সোনার সম্পাদক ছিলেন। উলুবেড়িয়ার ময়দানে দূর থেকে যাঁকে প্রথম দেখেছিলাম সেই তৃণমূলনেত্রী সম্পর্কেও এই পত্রিকায় ভারি মুখরোচক সব কথা ছাপা হত যা পড়লে যে-কোনও স্বাভাবিক মানুষের খারাপ লাগার কথা।

এই মুহূর্তে অবশ্য সেদিনের সি পি আই এম-বশংবদরা কেউ কেউ তৃণমূলনেত্রীর আশেপাশে ভালই আছেন। বেচারা সি পি আই এম। বেচারি সুভাষ চক্রবর্তী। বেচারি পশ্চিমবঙ্গ। যাই হোক, পীট সীগারকে আনার ব্যাপারে সুভাষ চক্রবর্তী মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ। পরেও দেখা হয়েছে। আন্তরিকভাবেই কথা বলেছেন তিনি আমার সঙ্গে। প্রবীণ মার্ক্সবাদী নেতা জ্যোতি বসু যখন খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন তাঁর খবর নিতে গিয়েছিলাম একটি হাসপাতালে। সেখানে শ্রীমতী রমলা চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সুভাষ চক্রবর্তী তখন আর নেই। মন খারাপ লাগছিল শ্রীমতী চক্রবর্তীকে দেখে। পুরনো দিনের দু'চার কথা হচ্ছিল তাঁর সঙ্গে। আমাদের বয়স বেড়েই চলেছে। সিনিয়ররা ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছেন। ক'দিন পরে আমিও বিদায় নেব।

১৯৯৪ সালে উলুবেড়িয়ার ময়দানে দূর থেকে যাঁকে দেখেছিলাম তিনি ঐ শ্রমিকসভায় আসছেন জেনে হাজার হাজার মানুষ এ-গ্রাম ও-গ্রাম থেকে পিলপিল করে আসছিলেন। মনে আছে আমি বেশ খানিকটা দূরে একটা গাড়িতে বসে ছিলাম। অপেক্ষা করছিলাম তিনি মঞ্চ থেকে নেমে গেলে আমি মঞ্চে যাব, গান গাইব, পয়সা তুলব আন্দোলনের জন্য। গাড়ি থেকে দেখছিলাম মানুষ আসছে। হাজারে হাজারে। নানান বয়েসের মানুষ।

ছোট্ট ছেলেমেয়ে থেকে শুরু করে বৃদ্ধ বৃদ্ধা। অনেকেই প্রায় ছুটতে ছুটতে আসছিলেন। এত মানুষ আসছিলেন যে শুকনো ময়দানে ধুলো উড়ছিল প্রচুর। এত মানুষ যে আমাদের রাজ্যের কোনও রাজনৈতিক নেতার ভাষণ শুনতে অমন স্বতঃপ্রণোদিতভাবে আসতে পারেন তা আমার জানা ছিল না।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ভাষণ দিতে শুরু করলেন। বড় বড় লাউড-স্পীকারে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল দূর থেকেও। একটিবারের জন্য তিনি তাঁর দলের নাম করলেন না। তাঁর দলের দিক টেনে কোনও কথাই বললেন না। সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি বললেন শ্রমিকদের দুর্দশার কথা, গ্রামবাংলার দুর্দশার কথা, খেটে খাওয়া মানুষের অনটনের কথা। তাঁর ভাষণ আমি সেই প্রথম শুনছি। একটু পরেই ভাষণ শেষ হয়ে গেল। আন্দোলনের নেতা প্রফুল্ল চক্রবর্তী ঘোষণা করলেন—মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চ থেকে নেমে গিয়েছেন, এবারে সুমন মঞ্চে আসতে পারেন।

মমতা তখনও মঞ্চের নিচে। আমার খারাপ লাগল। প্রফুল্ল চক্রবর্তীর কোনও দরকার ছিল না ঐভাবে ঘোষণাটি করার। কারণ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিপুল জনপ্রিয়তার অধিকারী দলনেত্রী, আর আমি নেহাতই এক সাধারণ সঙ্গীতশিল্পী যে কানোরিয়া শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে রয়েছে। প্রফুল্ল চক্রবর্তী যদি বলতেন, 'এবারে মঞ্চে গান শোনাবেন সুমন' তাহলেই যথেষ্ট, সংগত ও স্বাভাবিক হত। কিন্তু না, তিনি যে এক বামপন্থী শ্রমিক-নেতা, তাই তাঁকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে একটু ঠেস দিয়ে কিছু বলার সুযোগটা যেন বানিয়ে নিতেই হবে। প্রফুল্লবাবু যে কী ধরনের নেতা তা বুঝতে আমার একটু সময় লেগে গিয়েছিল, তার প্রধান কারণ আরও কিছু বিষয়ের মতো রাজনীতির ব্যাপারেও আমি নেহাতই নির্বোধ। বাংলার রাজনীতিকরা কেমন, শ্রমিক নেতারাই বা কেমন সে-সম্পর্কে কোনও ধারণাই আমার ছিল না। বেশ অল্প বয়সে ইউরোপে চলে গিয়েছিলাম। তারপর কলকাতায় একাধিকবার এলেও এখানকার লোকজনের সঙ্গে বিশেষ মিশিনি। বন্ধুবান্ধব ছাড়া কারও সঙ্গেই যোগাযোগ ছিল না। বাস্তবে এখানকার অনেক মানুষ যে কেমন, সাতের দশক থেকে এই রাজ্যে, এই শহরে মানুষের মধ্যে যে কতটা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে তার কিছুই প্রায় জানতাম না।

১৯৮৯-এর একেবারে শেষদিকে কলকাতায় পাকাপাকি ফিরে যে সিস্টেম, যে শ্রেণী, যে ধরনের মানুষের মুখোমুখি অনেক বছর পর দাঁড়ালাম তাদের আমি চিনি না, জানি না। তারাও আমায় চেনে না, জানে না, বোঝে না। আমাদের মধ্যে তফাত হল—আমি জানি তাদের আমি চিনতাম না, চিনতে শুরু করেছি ধীরে ধীরে, যত চিনেছি ততই শিহরিত হয়েছি, যত চিনছি শিহরণ বাড়ছে ততই। আর 'তাদের' ধারণা তারা আমায় আগাগোড়া চেনে, জানে। বেচারিরা। আহা, কৃষ্ণের জীব। যাই হোক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চ থেকে চলে যাওয়ার পর দেখলাম সমাগত অনেকেই চলে গেলেন। ময়দান অনেকটা ফাঁকা হয়ে গেল। বুঝলাম, এত মানুষ এসেছিলেন শুধু এই মানুষটির জন্যে, তাঁকে দেখবেন বলে, তাঁর কথা শুনবেন বলে।

আন্দোলনেরই এক নেতার কাছে শুনেছিলাম, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রমিকদের রান্নাঘরের জন্য দশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। আমার পরিবারের তরফ থেকে যৌথ-হেঁসেলের জন্য দেওয়া হয়েছিল দশ হাজার টাকা। কেউ যখন এমনিতেও বলে না, ওমনিতেও না, তখন নিজেই বলি—কানোরিয়া আন্দোলনের জন্য আমি বারবার গানের অনুষ্ঠান করে প্রচুর টাকা তুলে দিয়েছিলাম। একটি পয়সাও পারিশ্রমিক নিইনি। ১৯৯৪ সালের কলকাতা বইমেলার বাইরে আমি একটি অতি সাধারণ মাইক্রোফোন, অ্যাম্পলিফায়ার ও একটি লাউডস্পীকারের সাহায্যে কয়েক ঘণ্টা গান গেয়েছিলাম গিটার বাজিয়ে। সমবেত সকলে, পথচারীরা, গাড়ি করে যাওয়া মানুষজন, এমনকি বাস মিনিবাসের যাত্রীরাও গান শুনতে শুনতে প্রচুর টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন। কানোরিয়ার শ্রমিকরা চাদর পেতে সেই টাকাপয়সা সংগ্রহ করছিলেন। বইমেলা প্রাঙ্গণে যাঁরা আমার অটোগ্রাফ নিতে আসছিলেন এমনকি তাঁদের কাছেও আমি অটোগ্রাফ বিক্রী করেছিলাম। কানোরিয়ার দু'জন শ্রমিক সেই টাকা নিচ্ছিলেন। কত টাকা যে আমি একাই তুলে দিয়েছিলাম তার কোনও ইয়ত্তা ছিল না। তেমনি আরও কত সহৃদয় মানুষ যে কত টাকা তুলে দিয়েছিলেন হিসেব ছিল না তারও।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ শুনতে এরপর ১৯৯৫/৯৬ সালে একবার নিজের আগ্রহেই গিয়েছিলাম আনোয়ার শাহ রোডে লর্ডসের

মোড়ে। আমি তখন ঐ অঞ্চলেই থাকতাম। শুনলাম তিনি সভা করতে আসছেন। পাড়া ঝেঁটিয়ে লোক গেল। আমার প্রতিবেশীরা সকলেই প্রায় গেলেন। আমিও গেলাম। আমি চাইছিলাম মমতা তাঁর ভাষণে কী বলেন একবার শুনতে। কানোরিয়ার শ্রমিকদের সভায় তাঁর ভাষণ ছিল সংক্ষিপ্ত। তাছাড়া সেখানে তিনি প্রধানত শ্রমিকদের বিষয়ে এবং কানোরিয়া আন্দোলন নিয়েই বক্তব্য রেখেছিলেন। লর্ডসের মোড়ের এই সভায় তিনি নিশ্চয়ই আরও বড় করে ভাষণ দেবেন নেত্রী হিসেবে। সেই ভাষণটি কেমন হতে পারে জানতে আগ্রহী ছিলাম আমি। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার আমি নিজের থেকে কোনও রাজনৈতিক নেতার ভাষণ শুনতে গেলাম। প্রথম গিয়েছিলাম জ্যোতি বসুর ভাষণ শুনতে গড়িয়া কলেজের মাঠে, ১৯৮৯-এর শেষ দিকে বা '৯০ সালের গোড়ায়। তারপর লর্ডসের মোড়ে এই জনসভা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার মনে আছে বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চে ছিলেন। সব বক্তাই সি পি আই এমের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখছিলেন। আমার ধারণা ছিল পাড়াটা সি পি এম। কিন্তু দেখলাম সকলেই সি পি এমের বিরুদ্ধে কিছু বলা হলেই হাততালি দিচ্ছে। আমার একটু মজাই লাগছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ভাষণ দিতে উঠলেন জনসমুদ্রে লাগল জোয়ার। উদ্বেল হয়ে উঠল জনতা। আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। বেশ কিছু তরুণ 'দিদি দিদি' করে ছুটে যেতে গিয়ে আমায় ধাক্কা মারলেন। একটু বকলেনও আমায়—তাঁদের পথে আমি বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছি বলে। খুব খারাপ লাগল না আমার। এত জন মানুষ তাহলে সি পি আই এমের বিরুদ্ধে। আমায় যাঁরা ধাক্কা মেরে গেলেন তাঁরাও নিশ্চয়ই সি পি আই এম বিরোধী। মন্দ নয়। শাসক দলের বিরুদ্ধে এত মানুষ তাহলে আছে, এটা তো স্বাস্থ্যের লক্ষণ। তাও ভাবছিলাম—তবে যে শুনতে পাই এই অঞ্চলটা সি পি আই এমের!

মমতার ভাষণ কিন্তু সেদিন বিশেষ ভাল লাগেনি আমার। খুব তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ভাষণ দিচ্ছিলেন তিনি। লক্ষ্য করলাম নিতান্ত মৌলিক বিষয়ে তিনি সরাসরি কথা বলছেন। ইনিয়ে বিনিয়ে নয়, সরাসরি। সে জন্যেই হয়ত সাধারণ মানুষ এত সহজে বুঝতে পারছিল তাঁর কথা। কিন্তু অস্বীকার করব না, আমার পাশ্চাত্য-প্রভাবাচ্ছন্ন শহুরে, আধুনিক বোধে তেমন কোনও

তরঙ্গ তুলতে পারছিল না তাঁর ভাষণ। মাঝেমাঝে খুব সহজ সরল কিছু ঠাট্টা করছিলেন তিনি। সকলে হৈ হৈ করে উঠছিল। লক্ষ্য করছিলাম, মাঝে মাঝে তিনি কোনও শব্দ বা কারও নাম নিয়ে খেলছেন, মজা করছেন, একটু সময়ও নিচ্ছেন, টানা কথা বলে যাচ্ছেন না। তাঁর ঐ যতিগুলো যেন মেপেই দেওয়া। সাধারণ লোক যাতে সঙ্গে থাকতে পারে। তারপরেই তিনি হঠাৎ কথার, অভিযোগের, প্রতিবাদের তুবড়ি ছোটাচ্ছিলেন। স্বর তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর। শ্রোতারা উদ্বেল হয়ে উঠছিলেন।

বুঝলাম, এই মানুষটি সরাসরি ছুঁতে পারছেন এতজন সাধারণ মানুষের হৃদয়কে। এঁরাই তো আমাদের দেশের জনসাধারণ। তাঁর ভাষণের একটি কথাও আমার মনে থাকেনি। বরং জ্যোতি বসুর ভাষণের দু'একটি কথা আমার আজও মনে আছে। কিন্তু তা হলেও আমি সম্যক বুঝতে পারছিলাম যে বাংলার সাধারণ মানুষের মনে এই মানুষটির স্থান অনেক অন্তরঙ্গ জায়গায়। তাঁর ভাষণের কোনও অংশ আমার মনে দাগ কাটল কিনা সেটা বড় কথা নয়। সাধারণ মানুষ বিশেষ করে মেয়েরা তাঁর উক্তিগুলি নিয়ে কথা বলছেন, সভার দু'দিন পরেও পাড়ার দোকানে দোকানে মানুষজন কথা বলছেন, মন্তব্য পালটা-মন্তব্য করছেন এটাই আসল। এটাই গণতন্ত্র। বের্টোল্ট্ ব্রেশটের একটি লেখায় এককালে পড়েছিলাম— "Wie soll die grosse Ordnung aufgebaut werden, ohne die Weisheit der Massen."—'জনতার প্রজ্ঞা ছাড়া বিশাল ব্যবস্থাটি গড়ে তোলা হবে কী করে?'

আমাদের দেশের রাজনীতিকরা জনতার ভোট চান, তাঁদের প্রজ্ঞা নিয়ে তাঁরা ভাবেন বলে মনে হয় না। আর 'বিশাল ব্যবস্থা' ট্যাবস্থা চুলোর দোরে গিয়েছে কোন কালে কে জানে। ব্যবস্থা মানেই তো শাসনব্যবস্থা, শাসন-ক্ষমতায় কায়েম থাকা অথবা সেই ক্ষমতা হাতে আনা। আমাদের শাসক দল এবং অন্য অনেক বামপন্থী কী আর ব্রেশটকে মনে রাখেন? অবশ্য কিছুই তো আর অবিমিশ্র নয়। ব্রেশটের কবিতা, নাটক আর ব্রেশট এক নন। পঞ্চাশের গোড়ায় পূর্ব জার্মানীর শ্রমিকরা যখন কিছু দাবিদাওয়া নিয়ে রাস্তায় নামলেন, পূর্ব জার্মানির 'এস ই ডি' (সোৎসিয়ালিস্টিশে আইনহাইট্স্পার্টাই ডয়েট্শ্লান্ড—জার্মানির সমাজতান্ত্রিক ঐক্য দল)

সরকারের পুলিশ তখন নির্দ্বিধায় গুলি চালাল। ছাত্রছাত্রী ও শ্রমিকরা ব্রেশ্‌টকে গিয়ে ধরলেন প্রতিবাদ করার জন্য। ব্রেশ্‌ট কিন্তু টুঁ শব্দটি করলেন না। পূর্ব জার্মানির কোনও কোনও ছাত্র তখন রেগে গিয়ে ব্রেশ্‌টের 'দ্রাই গ্রশেন ওপার' বা 'তিন পয়সার পালা'র একটি গানের প্যারোডি বানিয়ে গাইতে লাগলেন : 'হাঙ্গরেরও শিরদাঁড়া আছে/ব্রেশ্‌টের যা নেই।'

লেখক ও ভাবুক হিসেবে বের্টোল্‌ট্‌ ব্রেশ্‌টের পাঁচ কোটি মাইলের মধ্যেও আসতে পারবেন না এমন কিছু কিছু বাঙালি কবি-সাহিত্যিক ও শিল্পীর মধ্যে আমরা কিন্তু শিরদাঁড়াহীন এক প্রাণীকে দেখতে পেয়েছি অনেক বছর ধরে। সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময়ে, উপর্যুপরি গণহত্যা-গণধর্ষণের পর কবি-লেখক-সাংবাদিক-শিল্পীকুলে এই ধরনের প্রাণীদের আরও প্রকটভাবে দেখা গিয়েছে।

সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম লালগড়ের পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাছোড়বান্দা অনুরোধ প্রায় এক বছর ধরে ঠেকিয়ে রাখার পর শেষে 'না' বলতে পারার অক্ষমতার কারণে লোকসভা নির্বাচনে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে ভোটে দাঁড়াই। প্রায় উনষাট হাজার ভোটে সি পি আই এম প্রার্থী সুজন চক্রবর্তীকে হারিয়ে ভোটে জিতেও যাই। কীভাবে যে ভোটে লড়েছিলাম তার গল্প বলার জন্য আর একটি ছোট বই লেখা দরকার। রাজনীতি যে এত বিচিত্র, এত জটিল এবং এত বিপজ্জনকরকম উদ্ভট তার ছিটেফোঁটাও যদি জানতাম, কখনওই ভোটে দাঁড়াতাম না। ভোটের দিন এগিয়ে আসার তালে তালে বিভিন্ন জনপ্রিয় দৈনিক পত্রিকায় এবং একাধিক বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে আমার বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার ও মিথ্যে কথাগুলো জনগণকে জানানো হচ্ছিল তা থেকে বুঝেছিলাম শিরদাঁড়াহীন, স্বাভাবিক ভব্যতাহীন প্রাণীতে বাংলা ছেয়ে যাচ্ছে। অত চেষ্টা করেও, এমনকি তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক স্থানীয় নেতার প্রবল বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও আমায় হারিয়ে দেওয়া যায়নি। তারপর, কয়েকটি বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের দলের কয়েকজন নেতার সঙ্গে আমার গোলমাল বেধে যাওয়ায়, পুলিশি সন্ত্রাসবিরোধী জনসাধারণের কমিটির নেতা ছত্রধর মাহাতোকে রাজ্য সরকার অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করার পর তাঁকে নিয়ে এবং লালগড়ের আন্দোলন নিয়ে গানের একটি অ্যালবাম বের করে শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরাগভাজন

হওয়ায়, তার পরে জঙ্গলবাসী জনজাতিদের বিরুদ্ধে ভারত সরকার 'অপারেশন গ্রীন হান্ট' শুরু করলে তার বিরোধিতা করায় ক্রমান্বয়ে মমতাপন্থী সাংবাদিক ও কিছু 'বুদ্ধিজীবী'র নানান লেখা থেকে তাঁদের মানসিকতার যে পরিচয় আমি পেয়েছি তাতে বুঝতে আর বাকি নেই শিরদাঁড়া বস্তুটি এক শ্রেণীর মানুষের দেহ থেকে না হলেও মন থেকে হারিয়েই গিয়েছে।

১৯৯৫ কি ১৯৯৬ সলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ শুনতে শুনতে, তাঁর শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া দেখতে দেখতে সব মিলিয়ে আমার মনে হয়েছিল—যে মানুষটিকে ঘিরে এত উত্তেজনা তিনিও স্বতঃস্ফূর্ত, আর তাঁর অনুগামীদের প্রতিক্রিয়াও স্বতঃস্ফূর্ত। একটি জিনিসও সাজানো গোছানো নয়। বরং কোথাও কোথাও একটু অগোছালো। আর হয়ত সেই জন্যেই তাঁর এই গণ-আবেদন।

তাঁর রাজনীতি বা ভূমিকা নিয়ে আমি কিন্তু আর বিশেষ ভাবিনি। তাঁকে বাদ দিয়ে যে বিরোধী রাজনীতি সম্ভব নয়, এটুকু বুঝেছিলাম। আমার ভাবনা তার বেশি এগোয়নি, তার প্রধান কারণ সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে শ্রদ্ধা আমার ক্রমশ কমে আসছিল। এই ব্যাপারটির কাছে আমার তেমন কোনও প্রত্যাশা ছিল না। ১৯৯৮ সালে আমি ভোট বয়কটের আহ্বান জানিয়েছিলাম একটি লিখিত বিবৃতির মাধ্যমে। গণশিল্পী গদর চলে এসেছিলেন অন্ধ্র থেকে। তিনি আর আমি আমার আবেদনটি নিয়ে গিয়েছিলাম সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, ঊষা গাঙ্গুলি ও মমতাশঙ্করের কাছে। এঁদের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দিয়েছিলেন এবং আমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন উমা কুণ্ডু, আমার বন্ধু। সৌমিত্রবাবু তো আবেদনটি পড়ে বেশ উৎসাহিত এমনকি উত্তেজিতও হয়ে পড়লেন। বললেন, সুমন, তুমি ভারতের রাজনীতিকদের গালাগাল দাওনি কেন? দেশটাকে যেদিকে নিয়ে গেল ওরা, তাতে তো কাঁচা গালাগাল দিতে ইচ্ছে করে। সৎ আবেগ ও বোধ থেকেই কথা বলছিলেন তিনি। নির্বাচন বয়কট করার জন্য আমার লিখিত আবেদনে সমর্থনসূচক প্রথম সই তিনিই করেছিলেন। বিভাস চক্রবর্তীও সই দিয়েছিলেন, তবে সৌমিত্র

চট্টোপাধ্যায়ের মত অত উৎসাহ নিয়ে নয়। পরে অবশ্য শুনেছি ভোট কেন দেওয়া দরকার এই মর্মে নিবন্ধও লিখেছিলেন বিভাসবাবু একটি পত্রিকায়। এই অধিকার তো তাঁর আছেই, সকলেরই আছে। সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শাসক দল সি পি আই এমের বিরুদ্ধে তিনি সরব হয়েছেন, পথে নেমেছেন, নানান নিবন্ধ লিখেছেন।

গদর ও আমাকে ঊষা গাঙ্গুলি কিঞ্চিৎ ঘায়েল করে দিয়েছিলেন ভোট বয়কটের আহ্বানের দিকে না গিয়ে বরং সেই সময়ে তাঁর যে নাটকটি চলছিল সেটি দেখার জন্য আমাদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করে। মানুষটি নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমতী। গুণী মানুষ। রাজনীতিতে গেলেও ভাল করতেন, হয়তো আরও ভাল করতেন। বন্ধু উমা কুণ্ডু, যিনি সেই সময়ে কোনও কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছে যাওয়া ও তাঁদের মত নেওয়ার প্রস্তুতিপর্বের যাবতীয় কাজ করেছিলেন, পরে আমায় জানান—কবি শঙ্খ ঘোষ প্রথমে আমাদের আবেদনে সই করলেও পরে তাঁর সম্মতি প্রত্যাহার করেন।

গদর ও আমার সামনে মমতাশঙ্কর খুবই সরব হয়েছিলেন নির্বাচন ব্যবস্থার প্রহসনের বিরুদ্ধে। মমতাশঙ্করকে আমি অনেক বছর ধরে চিনি। সমাজ-সচেতন মানুষ। শাসকদের বিশেষ ভয় পান না। সোজাসাপ্টা কথা বলে দেন। সমাজের নানান বিষয়ে মমতাশঙ্কর বরাবরই সমালোচনাপ্রবণ, সোচ্চার। অনেক বছর আগে রবীন্দ্র-সরোবরটাকে মোটামুটি টোড়ি নামে এক শ্রেষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়ার তোড়জোড় যখন হয়েছিল, মমতাশঙ্কর তখন জোরেসোরে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। আমার আবেদনে সই তো তিনি করলেনই, এই বিষয়ে যেদিন সাংবাদিক বৈঠক করেছিলাম সেদিন তিনিই একমাত্র এসেছিলেন। আমার মনে আছে, সাংবাদিক বৈঠকে অন্ধ্রর গণগায়েন গদরের সঙ্গে এ পি ডি আরের সুজাত ভদ্রও ছিলেন।

আমাদের দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা, সংসদীয় গণতন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে আমি যে এক সময় থেকে আর শ্রদ্ধাশীল ছিলাম না সেটা বোঝানোর জন্যেই এইসব ঘটনার উল্লেখ করলাম। কাজেই সত্যি বলতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতি সম্পর্কেও আমার তেমন কোনও উৎসাহ ছিল না। কিন্তু তাঁর ভাষণ শুনে, জনতার ওপর তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বক্তব্যের প্রভাব দেখে, পশ্চিমবঙ্গের কোথাও কোথাও অনুষ্ঠান করতে গিয়ে সাধারণ

মানুষের কথা শুনে বুঝতে পারছিলাম তাঁকে এড়িয়ে যাওয়ার জো নেই। সি পি আই এম-এর বিরোধিতা করতে গেলে তাঁকে উপেক্ষা করা ভুল, যদি জনমানসের কথা বিবেচনা করতে হয়। অনেক বামপন্থীর কথায় আচরণে বেরিয়ে আসতে দেখেছি মমতা সম্পর্কে একটা অদ্ভুত আক্রোশ, অসহিষ্ণুতা, ছুঁৎমার্গ। সেটা কি তিনি বিজেপির সঙ্গে জোট করেছিলেন বলে? সি পি আই এম নেতা জ্যোতি বসুকেও তো দেখেছি (পত্রিকার ছবিতে যদিও) কংগ্রেসের বিরোধিতা করতে গিয়ে বিজেপির শীর্ষ নেতাদের হাত ধরতে। রাজনীতি যে কত রঙ্গ, কত যাদু জানে। কে যে কখন কার বন্ধু, আগে থেকে বোঝা মুশকিল। সি পি আই এম দল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে কথায় কথায় বিষোদ্গার করছেন দেখে টের পেয়েছি—আসলে ওঁরা এই মানুষটিকে ভয় পান। গণ-সংগঠনে সিদ্ধহস্ত সি পি আই এমের তো বোঝার কথা ছিল মমতার গণ-আবেদন বড় মাপের, সেখানে কারও কোনও জারিজুরি সহজে খাটবে না। হয়ত তাঁরা তা বোঝেনও। হয়ত সেই কারণেই মমতার ওপর তাঁদের এত রাগ। আমি মমতাপন্থী নই, কোনও পন্থীই নই সেই অর্থে। রাজনীতির তেমন কিছুই আমি বুঝি না। কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই নিজেকে মেলাতে পারিনি। কিন্তু সাধারণ মানুষজনের কথা শুনে, জেনে আমার অন্তত বুঝে নিতে কোনও অসুবিধে হয়নি গ্রামবাংলায়, সাধারণ মানুষের মনে মমতার স্থান কোথায়। তাঁর বিরোধী বাম রাজনীতিকদের কাজকর্ম, কথাবার্তা থেকে আমার মনে কোনও সন্দেহই ছিল না যে মমতা সম্পর্কে এঁদের বিরোধিতার অনেকটা জুড়েই রয়েছে একটা স্নায়বিক চাপ এবং ঈর্ষা। মমতার জনপ্রিয়তাকে ঈর্ষা। আর এই দুই ব্যাপারের যোগফল থেকে বেরিয়ে এসেছে : ঔদ্ধত্য। কুরুচিপূর্ণ এক ঔদ্ধত্য দিয়ে অনেক বামপন্থী বা অন্যকিছু পন্থী এই মানুষটির মোকাবিলা করতে চান। একাধিক বামপন্থীকে বলতে শুনতাম—মমতা ফাশিস্ত। যাঁরা বলতেন, তাঁরা নিজেরাই তাঁদের বিরুদ্ধে কেউ একটা কথা বললেই 'রে রে' করে উঠতেন। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থকরা এই মানুষটিকে ফাশিস্ত বললে আমার সবচেয়ে হাসি পেত, এখনও পায়।

১৯৯২ সাল থেকে সাধারণ এক পেশাদার সঙ্গীতশিল্পী ও গান-নির্মাতা হিসেবে আমি জানি এই দল ও তার অনেক সমর্থক (সবাই

নিশ্চয়ই নন) আমার বিরুদ্ধে কী কী বলে থাকেন ও করে থাকেন, যেহেতু আমি সি পি আই এম-পন্থী নই। ন'এর দশকে কত পাড়ার কত দোকানে আমার ক্যাসেট, সিডি খোলাখুলি রাখতে দেওয়া হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের নানান জায়গায় অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা আমার অনুষ্ঠান করার তোড়জোড় করতে গিয়ে প্রশাসনিক চাপের মধ্যে পড়েছেন। তেমনি কলকাতার বাইরে একাধিক জায়গায় আমার অনুষ্ঠানের ব্যানার ছিঁড়ে দিয়ে যেতেন কারা যেন? কংগ্রেস? বিজেপি? নাকি সেটাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজ? একাধিক শহরে সরকারি মঞ্চ আমার অনুষ্ঠানের জন্য দেওয়া হত না, তাই আমায় অনুষ্ঠান করতে হয়েছে সিনেমা হলে। কলকাতার অন্য কোনও পেশাদার শিল্পীর কপালে প্রশাসনের এই কোপ জোটেনি।

কলকাতার গিরিশ মঞ্চেই তো কর্তৃপক্ষ বাধা দিতেন আমার অনুষ্ঠানের জন্য বুকিং করতে গেলে। আবার ঐ মঞ্চেরই এক কর্মী ওপরের মাচা থেকে পড়ে গিয়ে জখম হওয়ার পর আমায় বিনা পারিশ্রমিকে একক অনুষ্ঠান করে দিতে হয়েছে তাঁর চিকিৎসার জন্য। আমার একক অনুষ্ঠানের জন্য রবীন্দ্রসদন ভাড়া পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে ১৯৯৪ সাল থেকে। অনুষ্ঠানের আয়োজকরা হয়রান হয়ে যেতেন। কিন্তু এক নামজাদা দৈনিক পত্রিকার এক গুরুতর অসুস্থ কর্মচারীর চিকিৎসার জন্য টাকা তোলার সময় রবীন্দ্রসদনের কোনও এক রথী সেই পত্রিকার লোকদের জানান যে একমাত্র আমি অনুষ্ঠান করলে টিকিট ভাল বিক্রী হবে। পত্রিকার তরফ থেকে আমাকে সেই মর্মে জানানোও হয়। নির্লজ্জতার এ হেন নমুনায় আমি শেষে বিরক্ত হয়ে বলি— একক অনুষ্ঠান আমি করব না, পীযূষকান্তি সরকারকেও বলা হোক। সেইভাবেই অনুষ্ঠানটি হয়েছিল। আবার বিনা পারিশ্রমিকে কলকাতার রবীন্দ্র- সদনে দেড় ঘণ্টা গানবাজনা করেছিলাম অন্যের প্রয়োজনে টাকা তুলে দেওয়ার জন্য। আমি কিন্তু পেশাদার শিল্পী ছিলাম।—তৃণমূল কংগ্রেস তো 'ফাশিস্ত', নির্লজ্জ ফাশিস্ত তাহলে কে?

একদিকে সি পি আই এম দল ও তার সমর্থকরা যেখানে পারছেন আমার পেশায় হস্তক্ষেপ করছেন, আর অন্যদিকে ব্যারাকপুর সুকান্ত সদনের কর্মচারীরা (সরকারী কর্মচারী, তার ওপর সি পি আই এমের শিঙে ফোঁকা কর্মী) পুজোর বোনাস পাচ্ছেন না বলে আমায় ধরছেন বিনা পারিশ্রমিকে

একক অনুষ্ঠান করে দিতে। বেচারিদের অবস্থা দেখে এত কষ্ট হয়েছিল যে সেই অনুষ্ঠান করেও দিয়েছি। এ-শহরের নানান মহল ও শিবিরও আসলে কর্তাভজা। ঠিক ঠিক মহাজনকে মাথা নুইয়ে ভজাতে না পারলে অনেকেই শত্রু হয়ে দাঁড়ান। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে কেউই তেমন বিশ্বাসী নন। এঁদের মনোভাব ও আচরণ কি খুব গণতান্ত্রিক? ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিটে দাঁড়ানোর পর সি পি আই এম দল তাঁদের প্রচারে আমার সম্পর্কে যে কুৎসা করে গিয়েছেন, ভোটের ঠিক আগে দামী কাগজে আমার সম্পর্কে যে কেচ্ছা ছাপিয়ে তাঁরা কয়েক লক্ষ দৈনিক পত্রিকার সঙ্গে জনসাধারণের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলেন সেগুলি কি খুব 'গণতান্ত্রিক'? দীর্ঘ তিন দশক ধরে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাধারণ মানুষের জন্য (এই অঞ্চলে মুসলিম ও দলিতদের সংখ্যাই অনুপাতে বেশি) সি পি আই এম দল ও বামফ্রন্ট সরকার যদি সত্যিই ভাল কিছু করে থাকতেন, সে-সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস যদি তাঁদের থাকত, গণতন্ত্রের স্বাভাবিক শিষ্টাচার বজায় রেখে লড়ার মানসিকতা যদি তাঁদের থাকত, তাহলে আমার সম্পর্কে ব্যক্তিগত কুৎসা রটানোর কাজে তাঁরা এত ব্রতী হতেন কি? আর্ট পেপারের মত দামী কাগজে (কয়েক লক্ষ) আমার নামে অসম্ভব জঘন্য সব কথা লিখে, আমার ব্যঙ্গচিত্র ছাপিয়ে একাধিক দৈনিক পত্রিকায় সেই অপপ্রচার-বিজ্ঞপ্তি গুঁজে, লক্ষ লক্ষ মানুষের ঘরে পৌঁছে দিয়ে সি পি আই এম দল কী প্রমাণ করলেন? তাঁরা গণতন্ত্রের নীতি মেনে চলেন? তাঁরা রাজনৈতিক ও সামাজিক শিষ্টাচারে বিশ্বাসী? তাঁদের একজন নেতারও লজ্জা করল না? আমার প্রচারে আমার মাননীয় সি পি আই এম প্রতিদ্বন্দ্বী সুজন চক্রবর্তীর নামে আমরা তো অমন কোনও কাগজ ছড়িয়ে বেড়াইনি। নাকি সকলে মনে করেন মাননীয় প্রতিদ্বন্দ্বী সম্পর্কে কিছুই বলা ও লেখা যেত না? তৃণমূল কংগ্রেস দলের নামে অনেক বামপন্থী অনেক কথা বলে থাকেন। অন্তত যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে ভোটের প্রচার তৃণমূল, এস ইউ সি আই ও কংগ্রেস কিভাবে করেছিলেন তা তো আমার নিজের চোখে দেখা। এই একটি কেন্দ্রে তো আমি নিজেই তৃণমূলের টিকিটে প্রার্থী ছিলাম। কেউ দেখাতে পারবেন আমাদের জোট একটি সি পি আই এম প্রার্থী সম্পর্কে একটি কদাকার কথা লিখে বাজারে লিফলেট ছেড়েছেন বা বড়বড়

করে দেয়াললিপি লিখেছেন? সি পি আই এম ও বিজেপি কিন্তু এই কাজটাই করেছেন। রাজনৈতিক শিষ্টাচার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিচয় তাহলে বেশি বা আদৌ দিলেন কারা?

আর-এক বাম প্রার্থী, এককালে সি পি আই এম তাত্ত্বিক ছিলেন তারপর একটি নতুন দল খোলেন, যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে ভোটে দাঁড়িয়ে আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচারের নজির সৃষ্টি করেন। তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা আবার আমার বিরুদ্ধে প্রচার করতে গিয়ে ধর্মীয় জিগিরও তুলেছিলেন (কে 'খাঁটি মুসলমান', কে নয়)। এই অভিজ্ঞ, শিক্ষিত প্রাক্তন সাংসদ নিজেকে এককালে কমিউনিস্ট বলতেন, হয়ত এখনও বলেন (আর কিছু না হোক 'বামপন্থী' তো বটেই)। বড়ই পরিতাপের বিষয় বাম-তাত্ত্বিক, হিংসা-বিরোধী এই 'ভদ্রলোক' (আহা, ভোটের প্রচার করতে গিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী সম্পর্কে কদাকার কথা বলাটাকে বোধহয় 'হিংসা' বা 'হিংস্রতা' বলা যাবে না, ওটি শান্তির সুবাতাস) এত কম ভোট পেয়েছিলেন যে তাঁর জন্য মায়াই হচ্ছিল ফল বেরোনোর দিন।

আমি সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার কয়েক মাস পর লোকসভা ভোটে সি পি আই এম প্রার্থী সুজন চক্রবর্তী ছাড়াও যিনি পি ডি এস দলের প্রার্থী হিসেবে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন সেই ভদ্রলোক একদিন সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলে আমার সঙ্গে বসে গল্প করছিলেন। মামুলি কথাবার্তা হচ্ছিল। হঠাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে এসে হাজির। সেন্ট্রাল হলে সকলেই যান, কথাবার্তা হয়, চা জলখাবার খাওয়া হয়, এমনকি 'লাঞ্চ'ও। সইফুদ্দিনকে দেখেই মমতা গম্ভীরমুখে মন্তব্য করলেন—'কী ব্যাপার? খাঁটি মুসলমান যে মেকি মুসলমানের সঙ্গে বসে?'—

২০০৯ সালের লোকসভা ভোটে আমার বিরুদ্ধে প্রচার করতে গিয়ে এই প্রাক্তন বাম-সাংসদের বর্তমান দল এরকম সব কথাই বলে বেড়াচ্ছিলেন, মমতা তা জানতে পেরেছিলেন।

তৃণমূলপ্রার্থী কবীর সুমনের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করতে, তাকে হারিয়ে দিতে, একাধিক বেসরকারি টিভি চ্যানেল এবং একাধিক দৈনিক পত্রিকা (এ-ব্যাপারে বাম, অবাম সকলেই জড়িত ছিলেন) যে উদ্যোগ নিয়মিত নিচ্ছিলেন সেটিকেও নিশ্চয়ই গণতান্ত্রিক বলতে হবে। এক

বেসরকারি টিভি চ্যানেল ('২৪ ঘণ্টা' বা 'আকাশ বাংলা' নয় কিন্তু!) যেমন লোকসভা ভোটের মাত্র কয়েকদিন আগে ঘোষণাই করে বসলেন যে সি পি আই এম প্রার্থী আমাকে হারিয়ে দিচ্ছেনই দিচ্ছেন। বাজারে পণ্যের চাহিদা ও কাটতি সমেত নানা বিষয়ে জনমত জরিপ করে থাকেন এমন এক সংস্থার কর্ণধারের হিসেবের ভিত্তিতে এই ভবিষ্যদ্বাণী। ভদ্রলোকের বিরাট নামডাক। আমাদের মধ্যে বিলক্ষণ পরিচয়, এমনকি বন্ধুতাও রয়েছে কিছু বছর ধরে। যদি তিনি এইসব পরিসংখ্যান ও ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য টাকা নিয়ে থাকেন তো বলতে হয় তিনি তাঁর পেশার প্রতি সুবিচার করেননি। জনমতের অগ্রিম জিগির তুলে আমার সমর্থকদের মনোবল ভেঙ্গে দিতে তিনি ও তাঁর বরাতদাতা 'গ্রুপ' (যাঁরা, বোঝাই যাচ্ছে, সি পি আই এমের 'বন্ধু' হিসেবে কাজ করছিলেন) এতই ব্যাকুল যে তাঁরা হিসেবের মধ্যে ধরেননি—বারুইপুরের দিকে বেশ বড় একটি অঞ্চল ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এবং এই অঞ্চলটিতে এস ইউ সি আই দলের প্রভাবই বেশি, যে এস ইউ সি আই কিনা আমাদের জোটসঙ্গী। ৪০ হাজার ভোট ছিল এই অঞ্চলে। পুরোটি, এই রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ 'গায়ক' পেতে বাধ্য, কারণ আমরা সবাই তখন জোটবদ্ধ হয়ে সি পি আই এমের বিরুদ্ধে লড়ছি।

খুবই নামজাদা এক দৈনিক পত্রিকার অভিজ্ঞ সাংবাদিক (আমার পূর্বপরিচিত, দেখা হলে দাঁত বের করে হাসেন) অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই আমার বাড়িতে এসে গা-জোয়ারি করতে লাগলেন—আমার সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করবেনই। ঘটনাটি ঘটে ভোটের অন্তত দিন কুড়ি-পঁচিশ আগে। আমার এক বান্ধবী ভোটেরই কাজে সেই মুহূর্তে আমার বাড়িতে ছিলেন। ভদ্রলোক ও তাঁর সঙ্গীকে তিনি ঢুকতে দেন এবং স্বাভাবিক ভদ্রতাবশত নিজের নামও বলেন। অন্তত চল্লিশ মিনিট ধরে আমি সাক্ষাৎকার দিই। মধ্যবিত্ত বঙ্গসন্তান (অবশ্যই 'ভদ্রলোক') সেই অতি পরিচিত সাংবাদিক ভোটের ঠিক দু'দিন আগে তাঁর সুবিখ্যাত পত্রিকায় আমার সম্পর্কে নির্জলা মিথ্যে কথা লিখে এবং আমার সেই বান্ধবীর নামও ছাপিয়ে একটি প্রতিবেদন বের করেন। লক্ষ্য করা দরকার, পরিকল্পিত অপপ্রচারমূলক এই প্রতিবেদনের জন্য সাক্ষাৎকারটি ভোটের অন্তত তিন সপ্তাহ আগে নেওয়া

হলেও প্রতিবেদনটি ছাপা হয় ভোটের ঠিক দু'তিন দিন আগে। আমার সেই বান্ধবীর নাম প্রতিবেদনে স্থান পেল কেন? ওরই মধ্যে রিপোর্টার বলতে চেয়েছিলেন—দ্যাখো দ্যাখো, অমুক নামের এক মহিলা এই সময়ে লোকটার বাড়িতে ছিল, বোঝো তবে কী ব্যাপার।

মধ্যবিত্ত বাঙালির যৌন-নীতিবোধে সুড়সুড়ি। সেই সঙ্গে একগাদা সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা।

জার্মান কাহিনীকার হাইনরিশ ব্যোল্ 'কাথারিনা ব্লুমের হারানো ইজ্জৎ' নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। মূল শিরোনামের তলায় লেখা ছিল : 'অথবা, কিভাবে হিংস্রতা জন্ম নেয়।' আমরা এমন এক যুগে বাস করছি যেখানে মিডিয়া, বড় বড় পত্রিকা মানুষের উপকারও করতে পারে, আবার চরম ক্ষতিও করে দিতে পারে। নানান মিডিয়া হাউসের রিপোর্টাররা, সম্ভবত তাঁদের কর্মদাতাদের হুকুম তামিল করার জন্য, অনেক সময়ে জেনেশুনেও মিথ্যে খবর দেন বা অর্ধসত্য পরিবেশন করেন। এর পেছনে হাউসের 'নীতি'র ভূমিকা থাকে। কাথারিনা ব্লুমের গল্পে, যেমন, এক সাধারণ মহিলাকে পরিকল্পনা করে বিপদে ফেলছে এক শক্তিশালী পত্রিকা হাউস ও তার এক সাংবাদিক। শেষে, মহিলাটি গুলি করে মারছেন রিপোর্টারটিকে।

১৯৯২ সালে 'তোমাকে চাই' নামে আমার স্বরচিত গানের অ্যালবাম প্রকাশ করার সময় থেকে বিভিন্ন পত্রিকা আমায় নিয়ে যা করেছেন তাতে যে কোনও সুস্থ মানুষের মাথা ঠিক থাকার কথা নয়। ভোটের আগে রীতিমত নামজাদা এক দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিক গায়েপড়ে যে মিথ্যে কথাগুলো 'প্রতিবেদন' হিসেবে লিখেছিলেন তাতে রাগ হওয়ার কথা, হয়েছেও আমার। মানহানির মামলা করতে গেলে এত লোক ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে করতে হয় যে তা সম্ভব নয়। প্রাজ্ঞ মানুষ বলবেন—উপেক্ষা করো অগ্রাহ্য করো। সাধারণত সেটাই করি। কিন্তু আমি অতি-মানব নই, নেহাতই রক্তমাংসের মানুষ তাই এই গ্রন্থে চেষ্টা করব জীবনে একবার অন্তত আমার প্রতিক্রিয়া ছাপার হরফে ব্যক্ত করতে। তার ফলে কী হবে, কোন পত্রিকার কোন সাংবাদিক বা কোন মিডিয়া আমার নামে কী রটাবে তাতে আমার কিছু আসে যায় না। এই সমাজটাকে, এর প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিলক্ষণ চেনা হয়ে গিয়েছে। বাষট্টি বছর বয়সে এটুকু বুঝেছি যে সবকিছু থেকে দূরে থাকাই ভাল।

ভোটের আগে কোনও কোনও নামী পত্রিকা ও বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের উদ্দেশ্য ছিল আমাকে হারিয়ে দেওয়া। তাঁরা চেষ্টা করেছেন প্রাণপণ। পারেননি। 'এইবারে বাণ চিড়িয়া নামা—ফট্' (প্রফেট সুকুমার রায়)। অত চোখা চোখা বাণ ছুঁড়েও চিড়িয়াকে নামানো গেল না। এইসব সুধী সহনাগরিক সসম্মানে তাঁদের পেশা চালিয়ে যাচ্ছেন, ঘরসংসার করছেন। এঁদেরও ছেলেমেয়ে হয়েছে, হচ্ছে, হবে। তাঁরাও হবেন জাতির ভবিষ্যৎ।

কার ও কিসের স্বার্থ সিদ্ধি করছিলেন সেই সাংবাদিক ও তাঁর সুবিখ্যাত পত্রিকা? সৎ-সাংবাদিকতা ও গণতন্ত্রের স্বার্থ?

এক প্রাক্তন নকশাল নেতা একটি বামপন্থী দৈনিক পত্রিকায় আমার সম্পর্কে নানান তথ্য দিয়েছিলেন, মন্তব্যও করেছিলেন। একটি তথ্য ছিল—আমি নাকি সি আই এ'র এজেন্ট বা ঐ ধরনের কিছু একটা হিসেবে নিকারাগুয়ায় গিয়েছিলাম। তাঁর এক সুমন-বিরোধী নিবন্ধর শিরোনাম ছিল : 'কেউটে সাপটাকে গর্তে পুরে দিন।'—কোন, বা কার গর্তে কে জানে। এইসব লেখাকেও আমাদের বোধহয় গণতান্ত্রিক বলা উচিত। এক বাঙালি মুসলিম কাহিনীকার ঐ পত্রিকাতেই আমার বিরুদ্ধে লিখতে গিয়ে গণতান্ত্রিক মানসিকতা থেকে লিখেছিলেন—কাজি নজরুল ইসলাম একবার ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি নাকি ভোট চাইতে পারতেন না, প্রচারসভায় গান গাইতেন। শেষে সেই নামজাদা (ইদানিং অবশ্য নন) কাহিনীকার লিখেছিলেন—কাজি নজরুল ইসলামের জামানত জব্দ হয়েছিল। 'খোদাই জানেন কবীর সুমনের কী হবে।'—সবই গণতান্ত্রিক। এই শ্রেণীর লোকদের একটাই সুবিধে। যে দলের সমর্থকই এঁরা হন না কেন, এঁরা সকলেই নির্লজ্জ। ২০০৯ সলের শেষ ও ২০১০ সালের গোড়া থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের দলের কোনও কোনও বিষয়ে আমি আপত্তি করায়, তারপর 'ছত্রধরের গান' নামে গানের অ্যালবামটি বের করায়, সি পি আই এম বিরোধী মমতাবাদী শিবিরেরও কোনও কোনও 'বুদ্ধিজীবী' একাধিক পত্রিকায় আমার সম্পর্কে যা যা লিখেছেন তা থেকে পরিচয় পাওয়া যায় তাঁদের গণতান্ত্রিক মানসিকতার।

দুই

২০০৬ সালে সিঙ্গুরে টাটার মোটরগাড়ির কারখানার জন্য সুফলা জমি অধিগ্রহণ করা নিয়ে গণ-আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তারা নিউজ চ্যানেলের মতামত অনুষ্ঠান সিঙ্গুর থেকে লাইভ সম্প্রচার করার জন্য আমি তখন একাধিকবার সিঙ্গুরে যাই। আমাদের মতামত টিম ছিলেন সঙ্গে। ক্যামেরা-প্রকৌশলী অনির্বাণ সাধু, প্রযোজক পার্থ দাশগুপ্ত, সহকারী সুকান্ত ও শুভেন্দু—টেলিভিশন চ্যানেলের কাজ করতে এসে সকলেই হয়ে পড়েছিলেন অ্যাক্টিভিস্ট—সিঙ্গুরের কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলনের তখন এতটাই জোর আর আবেদন। আমার অনুভব, সিঙ্গুরে টেলিভিশন রিপোর্টিং-এর কাজ করতে যাওয়ার আগে আমাদের কারও মনে সি পি আই এম দল ও বামফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে যদি কণামাত্র সহানুভূতি থেকে থাকে তো সিঙ্গুরে গিয়ে কৃষিজীবীদের কথা, তাঁদের সন্তানদের কথা শোনার পর, তাঁদের দেখার পর সেই সহানুভূতি বিরোধিতা ও আক্রোশে রূপান্তরিত হয়ে থাকতে বাধ্য। সিঙ্গুরের লড়াকু কৃষিজীবীদের কেউ কেউ আমার প্রশ্নের যেরকম উত্তর দিয়েছিলেন এবং অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে, বামফ্রন্ট সরকার ও সি পি আই এমের বিরুদ্ধে যেভাবে বক্তব্য রেখেছিলেন তা ভোলা সম্ভব নয়। সাংবাদিক হিসেবেই আমি আন্দোলনের অঙ্গ হয়ে গিয়েছিলাম।

একটি ছেলের কথা মনে পড়ে। নেহাতই নাবালক। সিঙ্গুরের এক লাইভ টেলিকাস্টে তার সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলাম, 'সরকারের লোক, পুলিশ যদি এই জমি থেকে তোমাদের হটিয়ে দিতে আসে তুমি কী করবে?'

শান্ত গলায় ছেলেটি বলেছিল : 'ঘরে যা আছে তা দিয়ে আটকাব। দা, কোদাল যা আছে।'

সিঙ্গুরের অ্যাকটিভিস্ট নেতা বেচারাম মান্না যে সন্ধেতে আমাদের যোধপুর পার্কের স্টুডিয়োয় এসে সাক্ষাৎকার দেন সেই সন্ধেবেলা সিঙ্গুরে 'পাওয়ার কাট' করে দেওয়া হয়েছিল—সিঙ্গুরের কেউ যাতে টেলিভিশন না দেখতে পারে। আন্দোলন সম্পর্কে টেলিভিশন চ্যানেলের কণ্ঠ রোধ করতে শাসক দল ও তাঁদের সরকার ছিলেন সদা তৎপর। নন্দীগ্রাম গণ-অভ্যুত্থানের সময়ে তারা চ্যানেল ও কলকাতা টিভি যে সৎ সাংবাদিকতা করতে চেষ্টা করছিল তার পথ আটকাতে রাজ্যের নানান জায়গায় এই দুই চ্যানেলের সম্প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হত—স্থানীয় কেবল্ টিভি অপারেটরদের ওপর রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে।

কোনওরকমের প্ররোচনা ছাড়াই বামফ্রন্টের পুলিশ ২৫ সেপ্টেম্বর (২০০৬) সিঙ্গুর বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভকারীদের বেধড়ক মারল। সেদিন বিডিও অফিসে চেক বিলি করা হচ্ছিল। তৃণমূল সমেত আরও কিছু বামফ্রন্ট বিরোধী দল বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল। পুলিশমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর পুলিশ ও সি পি আই এম দলের কাডার বাহিনী সুপরিকল্পিতভাবে আক্রমণ করল শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভরত জনতার ওপর। অনেক বিক্ষোভরত মহিলার সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও মার খেলেন, নির্যাতিত হলেন। মহিলাদের ওপর তাদের আক্রমণের ভিডিও ছবি যথেষ্টই আছে, দেখানোও হয়েছে বারবার টেলিভিশনে। পায়েল নামে দু'বছরের একটি ছোট্ট মেয়েকেও গ্রেপ্তার করেছিল বাংলার পুলিশ। তার বাবা-মায়ের সঙ্গে সেও এসেছিল ঐ বিক্ষোভে। তাকেও জামিন দেওয়া হয়নি।

আমার মনে আছে, বন্ধু সহযোদ্ধা পরমেশ গুহ, ১৯৯৩ সালের শেষে কানোরিয়া শ্রমিক আন্দোলনেও যিনি ছিলেন প্রথম সারিতে এবং আমার পাশে, সিঙ্গুর থেকে আমায় ফোন করে সব জানালেন। ছোট্ট পায়েলের গ্রেপ্তার হওয়ার কথাও জানালেন এবং বললেন—'সুমনদা, এই বিষয়ে একটা গান তোমার কাছে চাই।'

'সাবাশ পুলিশ সাবাস হাজারবার/দুই বছরের বাচ্চাও গ্রেপ্তার' গানটি তার পরের দিনই বেঁধেছিলাম আমি।

পশ্চিমবঙ্গের মতো 'মরূদ্যান' সত্যিই আর দুটি নেই। সিঙ্গুরে তখন আন্দোলনকারী ও প্রতিবাদকারীদের বাম-পুলিশ যেভাবে মারছিল, যেভাবে রক্তপাত ঘটাচ্ছিল অস্ত্রহীন মানুষের, তার ছবি তারা চ্যানেল সমেত দু'একটি টেলিভিশন চ্যানেলে ভালমতো দেখানো হয়েছিল। তারার জেলা-সংবাদদাতা ও ক্যামেরাম্যান উপেন কল্যাকে পুলিশ মাটিতে ফেলে মারে, তাঁর কলার-বোন ভেঙে যায়, চুরমার হয়ে যায় তাঁর ভিডিও ক্যামেরা। শুনেছি, উপেন কল্যাকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলেরই সাংবাদিক-ক্যামেরাম্যান। তারপর পুলিশ উপেনকে বেধড়ক প্রহার করে। প্রকাশ্য দিবালোকে ঘটছিল এইসব ঘটনা। সব ঘটনারই ছবি তোলা হয়েছিল। সেই ভিডিও ফুটেজ দেখানো হয়েছিল টেলিভিশনে।

এরপরেও অনেক 'শিক্ষিত' মানুষ, যাঁদের কাউকে কাউকে 'বুদ্ধিজীবী' বলা হয়, সি পি আই এমের সমর্থনে অটল থেকে যান। নানান ব্যাপারে 'engaged' , 'প্রতিবাদী' ছবি-নির্মাতা, গান-নির্মাতা, নাট্যকার, পরিচালক, নাট্যকর্মী সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটে কাটিয়ে দিলেন দীর্ঘকাল। শুধু তাই নয়, এঁদের কেউ কেউ রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিকভাবে সি পি আই এমের পক্ষও নেন।

তাপসী মালিকের ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডর ওপর শাসকদলের তরফে একটি জঘন্য ভিডিও ছবি কাহিনীচিত্রের মতো করে বানানো হয়। সবটাই মিথ্যে অপপ্রচার। এমন একটি মর্মান্তিক ঘটনা নিয়েও এত জঘন্য একটা কাজ করতে কোথাও বাধেনি ঐ ছবির নির্মাতা এবং অভিনেতাদের। খ্যাতনামা, শিক্ষিত অভিনেতারা এবং এক ডাকসাইটে কবিও ছিলেন ঐ গোষ্ঠীতে। ২০০৯ সালের লোকসভা ভোটের প্রচার করতে গিয়ে সি পি আই এম দল পাড়ায় পাড়ায় এই ভিডিও-নাটকটি দেখান। আমি যেখানে থাকি সেই বৈষ্ণবঘাটা বাই লেনেও। এবং তা সত্ত্বেও তাঁরা ব্যালটে পরাজিত হন। সমস্ত মিথ্যাচার, অপপ্রচার, ভণ্ডামি, ইতরোমি, নষ্টামি, নিষ্ঠুরতা ও শয়তানি সত্ত্বেও তাঁরা হেরে যান তাপসী মালিকের কাছে—যাঁর নিশান বুকে ও হাতে নিয়ে আমি বেঁচে আছি ও থাকব।

১৯৮৫ সালে নিকারাগুয়ায় গিয়ে একাধিকবার জনসভায় হাজির থাকতে হয়েছিল। সেখানে দেখতাম—সভা শুরু হওয়ার আগে সমবেত

জনতার মধ্যে থেকে এক একজন এক এক শহীদের নাম চিৎকার করে বলছেন, আর বাকি সকলে চিৎকার করে বলছেন—"Presente!" —উপস্থিত!

তাপসী মালিক! — "Presente!"—উপস্থিত!
রাজকুমার ভুল!—উপস্থিত!
শেখ সেলিম !—উপস্থিত!
ভরত মণ্ডল!—উপস্থিত!
সুপ্রিয়া জানা!—উপস্থিত!
সব শহীদ!—উপস্থিত! হাজির!

২০০৬ সালের ২৯ নভেম্বর সি পি আই এম দলের একটা সভা হয় সিঙ্গুরে। সভা চলাকালেই ঐ দলের লোকজন মাঠে নেমে কৃষকদের মারধোর করেন। ৩০ নভেম্বর সিঙ্গুরে কৃষিজমি-রক্ষা কমিটির সমাবেশ ছিল। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ঐ দিনই সিঙ্গুরে ১৪৪ ধারা জারি করে দেন। ৩ ডিসেম্বর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মালদা থেকে ফিরছিলেন, ভোররাতে পুলিশ তাঁকে রাস্তায় হেনস্তা করে। সেইদিনই কৃষিজমি-রক্ষা কমিটির সভায় অনশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

৪ ডিসেম্বর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনশন শুরু করেন। মজদুর ক্রান্তি পরিষদের এক শ্রমিক আভাস মুনসি ও সমাজবাদী দলের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি বিজয় উপাধ্যায় এবং র‍্যাডিকাল অ্যাক্টিভিস্ট বর্ণালী মুখোপাধ্যায় একই সঙ্গে, একই মঞ্চে অনশনে ব্রতী হন। কলকাতার মেট্রো চ্যানেলে তৈরি হয় অনশন মঞ্চ। সেই সময়ে এক সন্ধেবেলা তারা নিউজের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বিভাগে কাজ করতে গিয়ে অফিসের টিভি মনিটরে দেখতে পেলাম বামফ্রন্ট ও সি পি আই এম নেতারা সাংবাদিক বৈঠক করছেন। সেখানে সি পি আই এমের এক নেতা সিঙ্গুরে পুলিশের আক্রমণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহত হওয়ার ঘটনা নিয়ে একধরনের রসিকতা শুরু করলেন। ক্যামেরাগুলির সামনে তিনি বললেন—'ওর অত বুকেই বা লাগে কেন?' একাধিকবার করলেন তিনি এই কদাকার মন্তব্য। মন্তব্যটা শোনার

পরই আমি ঠিক করে ফেললাম আমি অনশন মঞ্চে যাব আমার সংহতি জানাতে। তারা নিউজ চানেলের সি ই ও অমিত চক্রবর্তী আমার বন্ধু। তাঁকে আমি ফোন করে জানালাম আমার সঙ্কল্পের কথা। আমি আবার 'মতামত' অনুষ্ঠানের সঞ্চালক। আমি যদি রাজনৈতিক মঞ্চে যাই তাহলে কেউ কেউ ভাবতে পারেন আমি আর 'নিরপেক্ষ' নই, কোনও একটি বিশেষ দল বা জোটের পক্ষে। এতে আমার কোনও অসুবিধে কোনওদিনই ছিল না, আজও নেই, কারণ নিরপেক্ষতায় আমি বিশ্বাসই করি না। সাংবাদিকতা কেন, জীবনের অনেক দিকই ঠিক নিরপেক্ষ হতে পারে না। সি পি আই এম'এর পার্টি-মুখপত্র 'গণশক্তি'র বিজ্ঞাপন এক সময়ে ছিল : 'আমরা নিরপেক্ষ নই, মেহনতী মানুষের পক্ষে।' সাংবাদিক হিসেবে কেউই নিরপেক্ষ হতে পারেন না। যে মুহূর্তে কেউ অনেক খবর ও বিষয়ের মধ্যে বিশেষ কোনও খবর বা বিষয় বেছে নিলেন, সেই মুহূর্তেই তিনি 'সাবজেক্টিভ' জায়গায় চলে গেলেন, 'অব্জেক্টিভ' থাকলেন না। যাই হোক, আমি মেট্রো চ্যানেলের অনশন মঞ্চে গেলে তারা নিউজ চ্যানেলের কোনও অসুবিধে হতে পারে এই ভেবেই আমি সি ই ও মহোদয়কে ফোন করে জানিয়েছিলাম। যদি তিনি আপত্তি করতেন তো তারার কাজটা আমি তখনই ছেড়ে দিতাম। অমিত চক্রবর্তী আপত্তি তো করেনই নি, বরং বলেছিলেন, 'না না, আপনি যান, মেয়েটি এতদিন হয়ে গেল অনশন করছেন। ওরা চায় মেয়েটা এইভাবেই মরে যাক, বুঝলেন?'

অনশনের ১৩/১৪ দিনের মাথায় আমি অনশন মঞ্চে গেলাম সংহতি জানাতে, সেইসঙ্গে আমার উদ্বেগের কথাও। আমি যতদূর জানি, ১০ দিন অনশন করে বর্ণালী মুখোপাধ্যায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তাঁকে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। আমি আর তাঁকে দেখতে পাইনি। মঞ্চে তখন অনশন করছেন এম কে পি'র আভাস মুনসি, সমাজবাদী পার্টির বিজয় উপাধ্যায় আর তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রথম আমি মমতাকে একেবারে কাছ থেকে দেখলাম, এই প্রথম তাঁর সঙ্গে কথা বললাম। অনশনক্লিষ্ট মমতা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন। আমায় দেখেই উঠে বসতে চেষ্টা করলেন। আমি তাঁকে উঠতে বারণ করলাম বারবার, কিন্তু তিনি কিছুতেই শুনলেন না। সামান্য কথা হল। আস্তে কথা বলছিলেন তিনি,

কিন্তু দৃপ্ত ভঙ্গিতে। আমি তাঁকে বললাম, 'আমি এসেছি আমার সংহতি জানাতে। কিন্তু আমি উদ্বিগ্ন আপনার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে।'

মমতা হাত জোড় করে ধন্যবাদ জানালেন এবং বললেন, 'আপনি একদম ভাববেন না, অনশন আমি ঠিক চালিয়ে যাব।'

এম কে পি দলের তরুণ শ্রমিক আভাস মুনসি, সমাজবাদী দলের বিজয় উপাধ্যায় ও তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়—তিনজনের সম্পর্কেই আমি দিনে দিনে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছিলাম, কারণ প্রতিদিনই দেখছিলাম তাঁরা দুর্বল হয়ে পড়ছেন। আমার চিন্তা হচ্ছিল—একটা অঘটন যদি ঘটে যায়। প্রথম দিন থেকেই আমায় মঞ্চে বক্তব্য রাখতে হচ্ছিল। আমি রাজনীতির লোক নই। ভাষণ দেওয়ার অভ্যেস নেই আমার। তাও প্রত্যেক বারই আমি ভাষণ দিতে গিয়ে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছিলাম যে আমি কোনও দলের লোক নই, মঞ্চে যে তিনটি দলের প্রতিনিধিরা অনশন করছেন সেই দলগুলির সঙ্গে আমার কোনও যোগ নেই, তাছাড়া রাজনীতি আমি বুঝি না। আমি শুধু বুঝি—বামফ্রন্ট সরকার যেভাবে কৃষিজমি অধিগ্রহণ করছেন তা অন্যায়। এই দেশের একজন বয়স্ক আয়করদাতা হিসেবে আমি এর বিরোধী। প্রত্যেক দিনই আমায় গান গাইতে অনুরোধ করা হত। খালি গলায় গান শোনাতাম আমি। সিঙ্গুরের এক কৃষিজীবীর দু'বছরের মেয়ে পায়েলেরও গ্রেপ্তার হওয়া নিয়ে বাঁধা আমার গান 'সাবাশ পুলিশ সাবাশ হাজারবার/দুই বছরের বাচ্চাও গ্রেপ্তার' এই মঞ্চ থেকেই গাইতে শুরু করি। খালি গলায় গাইতে বাধ্য হতাম আর ভাবতাম—একটা গিটার যদি থাকত।

রাজনীতির মঞ্চে খালি গলায় গান গাওয়া আমার কাছে অস্বস্তিকর। সুর দেওয়ার মতো একটা যন্ত্র না থাকলে ফাঁকা ফাঁকা এবং বোকা বোকাও লাগে। এক-আধদিন তবু একরকম। কিন্তু দিনের পর দিন জনসমাবেশে খালি গলায় গান গাওয়া বড়ই বিরক্তিকর। রাজনীতিক ও রাজনৈতিক অ্যাকটিভিস্টরা এটা বোঝেন না, কারণ তাঁরা সচরাচর গান শেখেন না, গানবাজনা করেন না, গান নামক বস্তুটিকে তাঁরা ব্যবহার করে থাকেন তাঁদের ভাষণের আগে পরে ফাঁকে ফাঁকে—খানিকটা গণবিনোদনের একটা পন্থা হিসেবে। জনগণকে সত্যিই গুরুত্ব দিলে এই বিনোদনটাই যাতে ঠিকমত হয়

সেদিকে তাঁরা নজর রাখতেন। নেতারা মনে করেন তাঁদের ভাষণই আসল। মাঝেমাঝে কোনও এক 'শিল্পী' দু'একটা উদ্দীপক বা দেশাত্মবোধক গান গেয়ে দেবেন, নেতারা সেই সুযোগে একটু জিরিয়ে নেবেন, তারপর আবার ভাষণ চলবে। পাশ্চাত্যে নানান রাজনৈতিক জনসভায় অংশ নিতে গিয়ে দেখেছি রাজনৈতিক গীতিকার-সুরকার ও গায়করা কেউ খালি গলায় গাইছেন না। তাঁরা হয় নিজেরা কোনও যন্ত্র বাজিয়ে গান গাইছেন অথবা তাঁদের সঙ্গে যন্ত্রীরা বাজাচ্ছেন। ফলে জনতার ভাল লাগছে, শিল্পীদেরও ভাল লাগছে।

কলকাতার বামপন্থী ও 'র‍্যাডিকাল' মহলে কোনও কোনও 'গণশিল্পী'কে এমনকি মঞ্চ থেকে বলতে শুনেছি : 'আমাদের দেশে গরিব মানুষেরা সংখ্যায় বেশি। গ্রামের মানুষ গরিব। তাঁরা বাদ্যযন্ত্র পান না। তাই আমরাও খালি গলায় গেয়ে থাকি।'—এই বলে তাঁরা বেসুরো গলায় গাইতে শুরু করলেন—'সংগ্রামী গান'। স্বদেশ, দেশের মানুষ, গ্রামবাসী এবং জগৎসংসার সম্পর্কে কতটা অজ্ঞ হলে তবে এমন কথা বলা যায়। সংখ্যাগুরু দরিদ্র গ্রামবাসীদের 'মুক্ত' করে ছাড়বেন—এই পণ করে যাঁরা ঐ ধরনের অপযুক্তি দেখিয়ে বেসুরে গাইছেন, তাঁরা একবার ভেবেও দেখেন না যে আমাদের দেশের নগরসমাজে যত বাদ্যযন্ত্র তৈরি হয়েছে, তার চেয়ে ঢের বেশি সংখ্যক বাদ্যযন্ত্র উদ্ভাবন ও নির্মাণ হয়েছে আমাদের গ্রামীণ সমাজে। বাংলারই পল্লীগ্রামের সঙ্গীতশিল্পীরা কোনও না কোনও বাজনা নিয়মিত ব্যবহার করে থাকেন। কলকাতা শহরে আজও পাড়ায় পাড়ায় মানুষ ভিক্ষে করে কিছু না হোক এক-জোড়া মন্দিরা বাজিয়ে, মঠের তহবিলের জন্য লোকে মহল্লায় মহল্লায় ভিক্ষা করে দস্তুরমতো খোল বাজিয়ে। কেউ কেউ দোতরাও বাজান। আজও।

মমতার অনশন মঞ্চে গিয়ে শুনছিলাম দোলা সেন গণসঙ্গীত গাইছেন। দোলা অনেক কালের রাজনৈতিক কর্মী। অনেক গণসঙ্গীত জানেন তিনি। অক্লান্তভাবে গেয়ে যেতে পারেন।

ঐ মঞ্চেই অনেকদিন পর দেখা হয়ে গেল অসীম গিরির সঙ্গে। সচেতন, লড়াকু মানুষ, আপাদমস্তক এক ভাল মানুষ এবং গণসঙ্গীতগায়ক। তেমনি, জানলাম প্রতুল মুখোপাধ্যায়ও একদিন এসেছিলেন। এই খবর

আমায় উৎসাহ দিয়েছিল। প্রতুল মুখোপাধ্যায় অনেক বছর ধরে বিভিন্ন গণ-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। আমাদের মধ্যে অনেকেই জানি তিনি কোনও বিশেষ দলের ধার ধারেন না। যেটা অনেকে ঠিক জানেন না— তিনি এক আশ্চর্য নিরীক্ষামনস্ক সুরকার (গত বছর তিরিশেক তাঁর মতো নিরীক্ষামনস্ক ও 'ইন্টেরেস্টিং' সুরকার আমরা আর পাইনি)। সঙ্গীত নিয়ে কথা বলার জায়গা এটা নয়, তাও এই কথাগুলো লিখলাম কারণ অনেক নকশালপন্থী প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের কথা ভেবে থাকেন প্রধানত তাঁর মতবাদ ও মতবাদগত প্রবণতার পটভূমিতে। বাংলা গানের সুররচনায় তাঁর অবদান যে কত বড় এবং কত স্বকীয়তাপূর্ণ তা তাঁরা বা অন্য কেউই ভেবে দেখেন না।

প্রতুল মুখোপাধ্যায় অনশন মঞ্চে এসেছিলেন জেনে আমার ভাল লেগেছিল। তেমনি আনন্দ হয়েছিল আমার অনেককালের পরিচিত সঙ্গীতশিল্পী অমিত রায়কে অনশন মঞ্চের সামনে দেখতে পেয়ে। সঙ্গীতে গুণী মানুষ অমিত দীর্ঘকাল র‍্যাডিকাল রাজনীতিতে বিশ্বাসী বলেই আমরা অনেকে জানি। এক সময়ে তিনি আরও সরব ছিলেন। মোটের ওপর অল্প বয়সে একটি হার্ট অ্যাট্যাক হয়ে গিয়েছে। হয়ত সেই কারণেই আজ তিনি একটু শান্ত, কিন্তু অত্যাচারী ও ভ্রষ্ট শাসক দলের বিরুদ্ধে নীরব নন। পীট সীগারের গাওয়া 'Which side are you on!" গানটির কথা-সুর-ছন্দের প্রতিধ্বনি তুলেই যেন অসীম গিরি (যিনি এক সময়ে র‍্যাডিকাল রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং এখনও র‍্যাডিকালই থেকে গিয়েছেন), প্রতুল মুখোপাধ্যায়, অমিত রায় অনশন মঞ্চে এসে জানিয়ে দিয়ে গেলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে সমস্ত ছুঁৎমার্গ ভুলে তাঁরা হাজির হয়েছেন শাসকদল ও তাদের জনবিরোধী অধিগ্রহণনীতির বিরুদ্ধে রায় দিতে এবং কৃষিজমির পক্ষে সংগ্রামরত সকলের সঙ্গে সংহতি জানাতে। অসীম তো নিয়মিত এসেছেন, তাঁর স্কুলের চাকরির মায়া প্রায় ত্যাগ করে। এরকম এক কায়মনোবাক্যে লড়াকু অ্যাকটিভিস্ট, এত সহজ ও প্রাণখোলা মানুষ, মানুষকে এত ভালবাসতে পারে এমন মানুষ জীবনে কমই দেখেছি। মমতার অনশনমঞ্চে নিয়মিত গান গেয়ে জনতাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন অসীম গিরি। পরে, সহনাগরিকদের মুক্তমঞ্চে ব্যবস্থাপনা, গান ও ভাষণে তিনি থেকেছেন ক্লান্তিহীন।

ক'জন গিয়েছেন সে সময়ে, ঐ রকম এক মুহূর্তে মমতা বন্দোপাধ্যায়ের পাশে? মহাশ্বেতা দেবী গিয়েছেন। আর? ক'জন 'শিল্পী', 'বুদ্ধিজীবী' সেদিন মমতার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন? ক'জনের মনে হয়েছিল গ্রামবাংলার অসংখ্য মানুষের মনে একাই ঝড় তুলতে পারেন যে মেয়েটি তিনি এইভাবে অনশন করে চলেছেন, তাঁকে গিয়ে বোঝানো দরকার যাতে তিনি অনশন শেষ করেন, বাঁচেন, লড়াই চালিয়ে যান? নাকি তখনও অচ্ছুৎ ভাবছিলেন সকলে? আমার তো মনে হয় বরং প্রবীণ সি পি আই এম নেতা জ্যোতি বসু স্বাভাবিকভাবে, প্রায় অভিভাবকের মতো মিডিয়ায় কিছু কথা বলেছিলেন। হুবহু মনে নেই, কিন্তু মোটের ওপর এইরকম : না খেয়ে থাকলে কী করে চলবে? এখনও তো অনেকদিন লড়তে হবে।—এটাই তো স্বাভাবিক কথা। বস্তুত এই কথাগুলো বলতেই আমি গিয়েছিলাম মমতার অনশন মঞ্চে, রোজ তাঁকে বলতামও। জানি না, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তা মনে আছে কিনা। —প্রশ্ন হল, লোকসভা ভোটে বিপুল সাফল্যের পর তো কতজন দ্রুত লয়ে মমতাময় হয়ে উঠলেন। মমতার চরম সংকটের মুহূর্তে ক'জন গিয়েছিলেন তাঁর পাশে! তা ছাড়া, মমতার সঙ্গে তো বর্ণালী, আভাস, বিজয়ও অনশন করছিলেন? শুনেছিলাম বর্ণালী অসুস্থ হয়ে অনশন ভঙ্গ করেন। কিন্তু আভাস? বিজয়?

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাপারে অনেকের মধ্যে একটা ছোঁব-না, ছোঁব-না ভাব দেখে আসছি অনেককাল। আমার মন যে এ-ব্যাপারে একদম মুক্ত ছিল এমন দাবি আমি করব কী করে। সত্যি বলতে বিজেপি'র সঙ্গে তাঁর জোট আমার ভাল লাগেনি। গুজরাতে হিন্দু ফাশিস্তদের মুসলিমনিধনের পরেও তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির সঙ্গেই জোটবদ্ধ ছিলেন, নির্বাচন লড়েছেন বিজেপির জোটসহযোগী হিসেবে, আমার কাছে এটা গ্রহণযোগ্য ছিল না। রাজনীতির লোক আমি নই, রাজনীতির জোট আমি ভাল বুঝি না, কিন্তু বিজেপির সঙ্গে থাকাটা আমার কাছে রীতিমত অস্বস্তিকর, ঠিক যেমন সচেতনভাবে সি পি আই এমের সঙ্গে থাকা, বিশেষ করে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের পর।

অন্যদিকে, বাংলা মানে গ্রামবাংলা। আর গ্রামবাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে গ্রহণযোগ্যতা সেটা উপেক্ষা করে, সি পি আই এম

বিরোধী অন্দোলনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অস্বীকার করা আর প্রকারান্তরে সি পি আই এম-কেই মেনে নেওয়া একই ব্যাপার—যদি সংসদীয় গণতন্ত্রের হিসেবগুলো মানা হয়। কারণ, সি পি আই এম বিরোধী যে দল যে-দাবিই করুন, গ্রামবাংলায় মমতার যে প্রভাব তার চেয়ে বেশি প্রভাব এককভাবে কোনও নেতারই নেই।

মমতার মঞ্চে আমি কেন?—আমার কোনও কোনও বামপন্থী বন্ধুর কাছে এটা ছিল ভয়ানকভাবে ভুরু কোঁচকানোর কারণ। আমি ঠিক বুঝতে পারি না কোন্ কারণে তাঁরা ভেবে দেখেন না যে কৃষিজমি-রক্ষা ও জমি-অধিগ্রহণবিরোধী আন্দোলনে একাধিক বামপন্থী দল এমনকি নকশালপন্থী গোষ্ঠী মমতার সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়েছিলেন আগেই। এখন যে-করে-হোক-মমতা-বিরোধী বামেরা যদি বলেন মমতার সঙ্গে যে বামেরা জোট বাঁধছেন তাঁরা আসলে বামপন্থী নন তো আমার মতো লোকের চুপ করে যাওয়াই ভাল। তুই বাম না মুই বাম বিতর্ক ক্লান্তিকর। বরং অনশন মঞ্চে ও তার আশেপাশে নানান বামপন্থী ও নকশালদের দেখে আমার ভাল লাগছিল এই ভেবে যে এবারে বোধহয় আমরা বৃহত্তর স্বার্থে দল-রাজনীতির কোন্দলের তুচ্ছতাকে একপাশে সরিয়ে রেখে এক জায়গায় মিলিত হতে পারছি।

মঞ্চের সামনে যাঁরা ভীড় করছিলেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে বা বসে থাকছিলেন তাঁদের বেশির ভাগই সাধারণ মানুষ। আর একবার দেখতে পাচ্ছিলাম মমতার জন্য তাঁরা কতটা ব্যাকুল। একাধিক যুবককে আমি কাঁদতে দেখেছি অনশন করে মমতা অসুস্থ হয়ে পড়বেন, তাঁর বড় কোনও ক্ষতি হয়ে যাবে—এই ভেবে। মাঝেমাঝেই মেট্রো চ্যানেলে গিয়ে মঞ্চে উঠে আমি আভাস, বিজয় ও মমতার সঙ্গে কথা বলতাম, তাঁদের প্রত্যেকের পাশে বসতাম বলেই হয়ত অনেকে ভাবতেন আমাকে কিছু জানালে তা মমতার কানে পৌঁছে যাবে। আমি ঐ অঞ্চলে গেলেই সাধারণ মানুষ আমায় ঘিরে ধরতেন। তারা নিউজ চ্যানেলের 'মতামত' অনুষ্ঠানে সিঙ্গুর আন্দোলন সম্পর্কে তাঁরা আমায় কথা বলতে শুনেছেন। কাজেই তাঁরা বুঝে নিয়েছিলেন যে আমি কৃষিজমিরক্ষা আন্দোলনের পক্ষে। তার ওপর আবার আমি অনশন মঞ্চেও যাচ্ছি, মঞ্চের সকলে আমার সঙ্গে সহৃদয় আচরণ

করছেন, মমতা তাঁর শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও আমায় দেখলেই উঠে বসতে চেষ্টা করছেন, আমার সঙ্গে কথা বলছেন গুরুত্ব দিয়ে, অথচ আমি রাজনৈতিক নেতা নই, রাজনীতির মঞ্চে থাকি না—এইসব দেখে সাধারণ মানুষরা ভেবে নিয়েছিলেন আমাকে কিছু কথা বলা যায়। সাধারণ মানুষের কথা ভাল করে না শুনলে আমার মতো একটা লোক দেশের আসল কথার অনেকটাই জানবে না কোনওদিন। রোজই একদল মানুষ এসে আমায় বলতেন—দিদিকে আপনি বলুন অনশন তুলে নিতে। উনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন। আমাদের হয়ে লড়বে তাহলে কে? সি পি আই এম যে গ্রামে গ্রামে কী অত্যাচার চালাচ্ছে, সুমনদা, আপনি, আপনারা জানেন না, কারণ আপনারা কলকাতায় থাকেন। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পাশে একমাত্র দিদিই আছেন, আর কেউ নেই।

মমতাকে এইসব কথা আমি সুযোগ পেলেই বলতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু মমতা তাঁর সংকল্পে অটল। তিনি অনশন ভাঙবেন না। দিনে দিনে তিনি আরও দুর্বল হয়ে পড়ছেন, অথচ আমি গেলেই তিনি ঐ শারীরিক অবস্থাতেও আশ্চর্য শিষ্টাচার দেখিয়ে আমার সঙ্গে নানান কথা বলতে চেষ্টা করছেন—আমার কষ্ট হত। সমানে আমি বলতাম—তুমি একদম কথা ব'লো না। শান্ত হয়ে শুয়ে থাকো।

ঐরকম অবস্থাতেও মমতা তাঁর কোন না কোনও সহকারীকে মনে করিয়ে দিতে ছাড়তেন না—এই, কবীরদাকে চা খাওয়াও।

চারদিকে এত 'সুমন' যে মমতাকে আমি বলেছিলাম আমায় 'কবীর' বলতে।

আমার খুব পরিচিত একটি মেয়ে, গীতশ্রী বসুর সঙ্গে ছাত্রজীবনে মমতার ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিদেশ থেকে একবার কলকাতায় এসে মমতার উত্থানের কথা শুনে গীতশ্রীকে বলেছিলাম, সময়-সুযোগ বুঝে একবার মমতার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে। তা আর হয়ে ওঠেনি। অবশেষে ২০০৬ সালে একাধিক দলের সম্মিলিত উদ্যোগে পরিচালিত অনশন মঞ্চে মমতার সঙ্গে পরিচয় যখন হল তখন দেখলাম দলনেত্রীর পরিচয়, গ্রামবাংলায় বিপুল জনপ্রিয়তা এবং পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে জোরালো ও সরব সি পি আই এম বিরোধী হিসেবে তাঁর গুরুত্বের কথা ভুলে মমতা

আমার সঙ্গে যে বিনীত ও সহৃদয়তাপূর্ণ আচরণ করছেন তা বিস্ময়কর। উল্লেখযোগ্য, অনেকগুলো দিন অনশন করে মমতা যখন রীতিমত দুর্বল ও অবসন্ন তখনও আমি তাঁর কাছে গেলেই তিনি একটুখানি হলেও সময় করে নিচ্ছেন আমার জন্য, আমার চিন্তিত মুখ দেখে, অভয় দিচ্ছেন আমাকে, কাউকে না কাউকে বলছেন আমায় চা খাওয়াতে।

এ-জীবনে অনেক ধরনের মানুষ দেখেছি। এক দশকের ওপর পাশ্চাত্যে এবং তার আগে-পরে পশ্চিমবঙ্গে সাংবাদিকতা ও গানবাজনার পেশায় বেশ নাম করে যাওয়া এবং অতীতে একাধিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকার সূত্রে নানান ব্যক্তি, খুব-নামী, মোটামুটি-নামী, সামান্য-নামী আর অনামী বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। অনেক নামজাদা লোকের অনেক রূপই দেখেছি। এই সমাজটাকে চিনতে আমার আর বাকি নেই। 'তোমাকে চাই' নামে একটি অ্যালবাম বের হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত এই সমাজটার যা যা দেখেছি-শুনেছি-জেনেছি তা অতুলনীয়। কৈশোরে বেতারে মান্না দে'র কণ্ঠে একটি আধুনিক গান শুনতাম : 'একই অঙ্গে এত রূপ দেখিনি তো আগে।' —উচ্চমধ্য-মধ্যমধ্য-নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালিদের অনেকের সম্বন্ধে এটাই সবচেয়ে লাগসইভাবে বলা যায়। আমি নাম করে যাওয়ার পর আমাকেও যে কত মহলের কত লোক ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছেন এবং একই সঙ্গে আমার সম্পর্কে যা খুশি তাই রটিয়ে গিয়েছেন ও রটিয়ে যাচ্ছেন তাও দেখেছি দেখছি বছরের পর বছর। এইসব অভিজ্ঞতার পর আমার প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোভাব ও আচরণ দেখে প্রথমে আমি একটু হকচকিয়েই গিয়েছিলাম। এত নাম করা, এত ক্ষমতাশালী ও প্রভাবশালী এক জননেত্রী যে এত স্বাভাবিক ও শিষ্টাচারী হতে পারেন তা আমার জানা ছিল না।

মঞ্চে গেলেই ভাষণও দিতে হত, গানও গাইতে হত। ভাষণে প্রতিবারই বলতাম—আমি কোনও দলের লোক নই, রাজনীতিরই লোক নই। তা সত্ত্বেও কোথাও কোথাও শুনতে পাচ্ছিলাম আমি নাকি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছি। আমার স্নেহভাজন এক প্রথম সারির সাংবাদিক একদিন আমায় ফোন করে হাসতে হাসতে বললেন—'সুমনদা, রাজনীতির আঙিনায় আনাগোনা করছ। একদিন একটু সময় দাও। গল্পটা শুনি।' কেউ

কেউ বলতে লাগলেন—'শেষকালে মমতার মঞ্চে তুমি/আপনি?' এব্রাহাম লিন্‌কনের একটি উক্তি : 'কিছু ব্যাখ্যা করতে যেও না। তোমার শত্রুরা তা বিশ্বাস করবে না, আর তোমার বন্ধুদের তা দরকার হবে না।'

সম্ভবত অনশন শেষ হওয়ার আগের দিন (আভাস মুনসি তখন আর অনশন করছেন না, অসুস্থ হয়ে তিনি তখন হাসপাতালে) মঞ্চে একটা হারমোনিয়াম ছিল। আমি যখন মঞ্চে পৌঁছলাম তখন গোধূলি। শীতের গোধুলি। আরও অনেকের সঙ্গে আমি মঞ্চে বসলাম। মমতার শরীর তখন বেশ খারাপই। সেদিন তাই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাইনি আমি। সত্যি বলতে, আরও অনেকের মতো আমিও বেশ চিন্তায়। আমি চাইছিলাম মমতা অনশন ভাঙুন। রাজনৈতিক সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হলে তাঁকে সুস্থ থাকতে হবে। তাঁর এক চিকিৎসক আমার কাছে রোজই তাঁর আশঙ্কার কথা জানাতেন। সেই গোধুলিতে পরিবেশ ছিল রীতিমত বিষণ্ণ। মনে আছে তৃণমূল দলের এক বিধায়ক মঞ্চের একপাশে বসে নীরবে কেঁদে যাচ্ছিলেন। মঞ্চ-সঞ্চালক দোলা সেন আমায় এসে জানালেন, মমতা আমায় গান শোনাতে বলছেন। হারমোনিয়ামটা থাকায় সেটি বাজিয়ে আমি রবীন্দ্রনাথের দু'তিনটি গান গেয়েছিলাম। সেই গানগুলির সঙ্গে গণ-আন্দোলন বা সংগ্রামের কোনও সম্পর্কই নেই। শীতের সন্ধে নামছে তখন কলকাতায়। মেট্রো চ্যানেলে কোনও অনশন মঞ্চে বসে রবীন্দ্রনাথের 'ডেকো না আমারে ডেকো না' গানটি গাইব তা কোনওদিনই ভাবিনি। বোধহয় সন্ধের সুর, শান্ত বিষণ্ণতার গান, তাই ঐ গানটি মনে পড়েছিল।

মমতা কখন অনশন ভাঙছেন আমি অন্তত জানতে পারিনি। অফিসের একজন ফোন করে জানালেন।

অনশন মঞ্চে অনেকের ভাষণ শুনেছিলাম। তাদের মধ্যে মজদুর ক্রান্তি পরিষদের অমিতাভ ভট্টাচার্যর ভাষণের ভাষা ও ভঙ্গি আমার মনে থাকবে। এই রকম যুবকরা যদি আমাদের দেশে নেতার আসন পান! সংসদীয় গণতন্ত্রে আমার আস্থা তেমন নেই। কিন্তু এই ধরনের শাসনব্যবস্থা যদি থাকতেই হয় তো অমিতাভর মতো মেধাবী, শিক্ষিত, বাকপটু ও সাহসী নবীন নেতাদের থাকা দরকার। সিঙ্গুরে অমিতাভ প্রচণ্ড মার খেয়েছিলেন পুলিশের হাতে। মার খেয়েছিলেন আরও অনেকে, যদিও তাঁরা কেউ অস্ত্র

হাতে কিছু করতে যাননি। সি পি আই এম বিরোধী অন্যান্য রাজনৈতিক দলের অ্যাকটিভিস্টরাও মার খেয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ মেয়েদেরও ছেড়ে কথা বলেনি। অন্যদিকে, সিঙ্গুর যাওয়ার পথে মেধা পাটকরের সঙ্গে পুলিশ যা করেছিল তার ভিডিও ফুটেজ একাধিক টেলিভিশন চ্যানেলে, বিশেষ করে তারা নিউজ চ্যানেলে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন সিঙ্গুর আন্দোলনের সময় থেকেই এই রাজ্যের পুলিশ কতটা অসভ্যতা শুরু করেছিলেন। ফাশিস্ত আচরণে শাসক সরকার ও তাঁদের পুলিশ যে কতটা সিদ্ধকাম তা সকলেই দেখেছেন। তেমনি, সিঙ্গুরে আন্দোলনকারীদের ওপর নির্বিচারে পুলিশের মারের ছবিও দেখা গিয়েছিল বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে। প্রথমে সিঙ্গুর, তারপর নন্দীগ্রামের কৃষিজমিরক্ষার আন্দোলনে বিশেষ *একটি* দল বা বিশেষ *একজন* নেতার ভূমিকা ছিল না। এই আন্দোলন অনেকের আন্দোলন। গণ-আন্দোলন।

মেট্রো চ্যানেলে অনশন চলাকালেই সিঙ্গুরের কৃষক পরিবারের মেয়ে, জমি-অ্যাকটিভিস্ট তাপসী মালিক ধর্ষিত ও খুন হন। তাঁকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। সি পি আই এম ও তাদের পেটোয়া সংবাদমাধ্যমগুলো ব্যাপারটাকে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগে যান। আমার বন্ধুস্থানীয় এক সম্পাদক আমায় বোঝাতে চেষ্টা করেন যে ঘটনাটার সঙ্গে প্রেম জড়িত। আন্দোলন যখন উত্তাল ঠিক তখনই কৃষিজমিরক্ষার আন্দোলনের এক নবীন লড়াকু অ্যাকটিভিস্ট কেন ব্যর্থ প্রেমের যন্ত্রণায় কাকভোরে জেরিক্যান-ভর্তি জ্বালানি তেল নিয়ে মাঠে গিয়ে নিজের গায়ে আগুন লাগাবেন এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই জোরালো হয়ে উঠেছিল সাধারণ নাগরিকদের মনে। শাসকদল ও তাদের বশংবদরা তাপসী মালিক আত্মহত্যা করেছেন এই খবরটা রটাতে হঠাৎ অত মরিয়া হয়ে উঠলেন কেন—সেটাও একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন। তিরিশ বছর সি পি আই এম-এর শাসনের পরেও এই রাজ্যে যাঁরা তাঁদের ভাবনাচিন্তার স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে পেরেছেন তাঁদের মনে এইসব প্রশ্ন বিলক্ষণ উঠছিল সেই সময়। আমাদের অনেক প্রগতিশীল 'বুদ্ধিজীবী' শিল্পী সাহিত্যিক সেই সময়ে এবং তার পরেও মুখে কুলুপ এঁটে বসেছিলেন।

তিন

২০০৭ সালের ১৪ নভেম্বরের আগে, সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে গণ-প্রতিরোধ কালে, নন্দীগ্রামে গণহত্যা, গণধর্ষণের সময়ে যাঁর মুখে রা সরেনি, আজ তিনি ভয়ানক সরব। সে সময়ে যাঁরা কিছুতেই মমতার পাশে দাঁড়াতে চাইছিলেন না আজ তাঁরা 'চলতি হাওয়ার পন্থী।' ২০০৯ সালের লোকসভা ভোটে মমতার দলের সাফল্য যাদুকাঠির মতো পালটে দিতে পেরেছে অনেক কিছু, অনেকের মন ও মত। এক সময়ে ছিলেন রুমাল, এখন বেড়াল। এ তো হামেশাই হচ্ছে। আমার প্রফেট সুকুমার রায় মোদ্দা কথাটা অনেক আগেই বুঝেছিলেন, বলেও গিয়েছেন।

২০০৭ সালের ১৪ই নভেম্বরের মহামিছিলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাঁটা চলবে না—এই দাবি ওঠায় আমি ঐ মিছিলে অংশ নিইনি। সেই দাবি তুলেছিলেন এমন অন্তত তিনজন এখন রবীন্দ্রনাথের অমিত রায়ের (নাকি নিবারণ চক্রবর্তীর) জবানে বলে চলেছেন : 'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি/ আমরা *ক'জন* ('দু'জন' নয়—রবীন্দ্রনাথের কাছে ক্ষমা চেয়ে) চলতি হাওয়ার পন্থী।'

অভিভাবকস্থানীয়া এক সহনাগরিকার নির্দেশে আমি ২০০৭ সালের গোড়ায় ওঁদের একজনের মন ও মত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ থেকে ঘোরানোর জন্য একটা গোটা সকাল অনেক বক্‌বক করেছিলাম, অনেক যুক্তি দেখিয়েছিলাম—প্রথমে সেই অভিভাবকস্থানীয়ার বাড়িতে, তারপর রাস্তায়। আমার যুক্তি ছিল : মমতাকে অস্বীকার করে বাংলায় এই মুহূর্তে কোনও গণ-আন্দোলন করলে ভুল হয়ে যাবে। গ্রামবাংলায় মমতার আবেদন অনস্বীকার্য। অতএব সি পি আই এমের বিরোধিতা করার পাশাপাশি তাঁরও বিরোধিতা করাটা ঠিক হচ্ছে না।

তিনি সমানে বলে গেলেন : 'না, সুমনবাবু, মমতাকে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।' সে সময়ে তিনি ছিলেন অন্য এক 'বুদ্ধিজীবী' গোষ্ঠীর সঙ্গে, যে গোষ্ঠীর সঙ্গে আমারও যোগ ছিল, সম্প্রীতির সম্পর্ক ছিল। অন্য কারও কারও সঙ্গে আমার তফাত ছিল এই যে আমি সেই যুগমুহূর্তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্পূর্ণ এড়িয়ে সি পি আই এমের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার পক্ষে ছিলাম না।

আজ, এই বইটি লেখার মুহূর্তে সেদিনের সেই 'না, সুমনবাবু, মমতা নয়' পরিবর্তনের হাওয়ায় তোফা আছেন। সুখের বিষয়, তিনি একা নন। সঙ্গে আছেন আরও কেউ কেউ।

বাল্যকালে শুনতাম, বাঙালি হাওয়া বদলের জন্য পশ্চিমে যায়। এখন?

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাসপাতাল থেকে বাড়ি চলে যাওয়ার পর একদিন আমায় তাঁর বাড়িতে একটি সভায় অংশ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হল। গিয়ে দেখলাম, কৃষিজমি-রক্ষা কমিটির সদস্যরা হাজির। নানান দলের প্রতিনিধিরা সেখানে। তেমনি আমার মতো কোনও দলেরই নন এমন মানুষও ছিলেন যেমন সুনন্দ সান্যাল।

সভায় মমতা আমাকে তাঁর এক পাশে বসতে বললেন। অপর পাশে বসলেন সুনন্দ সান্যাল। একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। আমি ঠিক সভাসমিতির লোক নই। মমতার মতো অত বড় মাপের রাজনৈতিক নেতার পাশে কখনওই বসিনি। এইরকম সভায় কী করতে হয় তাও জানি না। প্রেস ও মিডিয়ার প্রতিনিধিরা তখন বাইরে তৈরি হচ্ছেন। বুঝলাম সাংবাদিক বৈঠক হতে চলেছে। কৃষিজমিরক্ষা কমিটির সভায় মমতা নানান কথার মাঝখানে হঠাৎ এই কমিটির উপদেষ্টামণ্ডলীর আহ্বায়ক হিসেবে আমার নাম ঘোষণা করলেন। আমি এ-জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। সত্যি বলতে, প্রথমেই মনে হল আপত্তি করি। কারণ কোনও সমিতির কোনও পদে থাকার ইচ্ছেই আমার নেই। দ্বিতীয়ত সেই সময়ে আমার যা কাজ ছিল (তারা নিউজ চ্যানেলের 'মতামত' অনুষ্ঠানের সঞ্চালক), তার সঙ্গে এই পদটি হয়ত সঙ্গতি রাখবে না, কোথাও একটা সংঘাত দেখা দেবে; তৃতীয়ত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে নিয়মিত কাজ করার অভ্যেস আমার ছিল না, সেই

মানসিক প্রস্তুতিও আমার ছিল না কোনওদিন। রাজনীতির মানুষরা যেখানে থাকবেন সেখানে রাজনীতির কোনও-না-কোনও বৈশিষ্ট্য ও কিসিম থাকবেই। আমি আবার ওগুলোই বুঝি না। আমি সাংবাদিক ও সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে নিঃসন্দেহে অ্যাকটিভিস্ট হতে পারি সেরকম মুহূর্ত এলে। কিন্তু আমার সেই সহজাত প্রবণতার সঙ্গে ব্যবহারিক রাজনীতি ও রাজনীতি-বিদদের ধরনধারনের সাযুজ্য নাও থাকতে পারে। বস্তুত, না থাকার সম্ভাবনাই বেশি।

আমার আর একটা চিন্তা ছিল—অনশন মঞ্চে আমি গিয়েছিলাম প্রথমত মার-খাওয়া এক নেত্রী সম্পর্কে তাঁর বিরোধী এক নেতার কদাকার মন্তব্যে রুষ্ট হয়ে। 'ওর অতো বুকেই বা লাগে কেন'—এ হেন একটা উক্তি এক নেতা প্রকাশ্যে করছেন, সেই উক্তি সম্প্রচারিত হচ্ছে এটা আমি মেনে নিতে পারছিলাম না। এর পর চুপচাপ নিজের কাজ করে যাওয়ার মতো মানুষ আমি নই। আমার চরিত্রে একটা impulsive দিক আছে। এই দিকটি আছে বলেই আমি **আমি**। একটা মুহূর্তের পর আমি কারো বা কোনও কিছুর পরোয়া করি না। আমার সঙ্গীতজীবনেও এই দিকটি কখনও-সখনও কাজ করেছে। আমার অনেক গান মুহূর্তের তাগিদে বাঁধা। সেই গান কতদিন স্থায়ী হবে মানুষের মনে—এই চিন্তা আমার স্বভাবে নেই।

তেমনি নেহাতই বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে হয়েও আমি বিদেশে একাধিক ভাল চাকরি ছেড়ে দিয়েছি একটি বিশেষ তাগিদের মাথায়। বাংলা গান বাঁধার তাগিদে আমি আমেরিকার স্থায়ী চাকরি ছেড়ে চলে এসেছিলাম। দ্বিতীয় দফায় পশ্চিম জার্মানির ডয়েট্‌শে ভেলের বাংলা বিভাগের সিনিয়র এডিটরের চাকরির মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পর আমি আর অন্য কোনও দেশে (যেমন ইংল্যান্ড বা জাপানে—দুটি দেশের বেতারেই বাংলা বিভাগ আছে) চাকরি খুঁজিনি। একটু চেষ্টা করলেই কোথাও একটা ভাল কাজই পেয়ে যেতাম। কিন্তু আমার একমাত্র তাগিদ ছিল কলকাতায় ফিরে বাংলা গান বেঁধে বাঁচতে চেষ্টা করা। আমি তখন আমেরিকায় চাকরি করছি, সমর সেন আমাকে একটি চিঠিতে লিখলেন : 'যে দেশে, যে সমাজে ফেরার জন্য আপনি এত ব্যাকুল সেখানে আপনার মতো মানুষের যে বিশেষ প্রয়োজন নেই এটা বুঝতে চেষ্টা করুন। আপনি ওখানেই থেকে যান। তাতে

আপনারও মঙ্গল, পৃথিবীরও মঙ্গল।' প্রাজ্ঞ মানুষ সমর সেনের কথা যে কতটা ঠিক ছিল তা আজ হাড়ে হাড়ে টের পাই। সে সময়ে তাঁর 'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকায় নিয়মিত লেখা পাঠাতাম আমেরিকা থেকে প্রধানত রাজনীতি বিষয়ে। মাসে অন্তত একটি চিঠি তিনি আমায় দিতেন। সমর সেনের কথা আমি শুনিনি। শুনিনি ভেতরকার তাগিদে।

এরকম একটা তাগিদ থেকেই আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনশন মঞ্চে গিয়েছিলাম। গিয়েছিলাম আমার বিবেক ও রুচির তাগিদে।

নিরপেক্ষতায় বা 'objective neutrality'তে যে আমি বিশ্বাসী নই তা আগেই বলেছি এক জায়গায়। কিন্তু আমি বিশ্বাসী না হলে কী হবে, চ্যানেলের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কোনও কর্তা বলতেই পারেন যে নিরপেক্ষতার একটা ভাব অন্তত বজায় রাখা দরকার। মমতা, আভাস ও বিজয়ের অনশনের সময়ে তারা নিউজের সম্প্রচারে টেলিভিশনের পর্দার এক কোণে প্রতিদিন লেখা থাকত মমতার অনশন কত দিনে পড়ল। এই কারণে, কোনও কোনও দর্শক, বিশেষ করে সি পি আই এম-ঘেঁষা দর্শকরা বলতে শুরু করেছিলেন যে ওটা মমতা ব্যানার্জির চ্যানেল। এই অভিধায় আমার নিজের কোনও অসুবিধে নেই, যদি আমার সাংবাদিকতার কাজ আমি মোটামুটি স্বাধীনভাবে করতে পারি।

সি পি আই এমের চ্যানেল ২৪ ঘণ্টা বা আকাশ বাংলায় আমায় যদি উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোনও নিয়মিত আলোচনা অনুষ্ঠান করতে বলা হয় এবং আমার কাজে যদি কেউ নাক না গলান, মোটামুটি স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ যদি আমি পাই তাহলে ঐ দুটি চ্যানেলে কাজ করতেও আমার কোনও আপত্তি থাকবে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি খুব ভাল করে জানতাম যে তারা নিউজ মমতার চ্যানেল নয়। এই চ্যানেলের নীতিনির্ধারণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও হাত কোনওদিনই ছিল না, তখনও নেই।

পুলিশের হাতে মমতা ও তাঁর সঙ্গীদের হয়রানির পর তৃণমূলের সদস্যরা যেদিন বিধানসভায় ভাঙচুর করেন (কোনও কোনও তৃণমূল নেতা, যেমন সৌগত রায়, গোলমাল থামাতে চেষ্টা করছিলেন) সেইদিনই 'মতামতে' তৃণমূল বিধায়ক পার্থ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অতিথি। তাঁর দলের

সতীর্থদের আচরণের জন্য আমি সঞ্চালক হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেস দলের তীব্র সমালোচনা করেছিলাম। পার্থবাবুকে আমি এমনকি ঠেস দিয়ে বলেছিলাম—এই আপনারাই কিনা ডান্ডি অভিযানের কথা বলছেন।

কৃষিজমিরক্ষা কমিটির উপদেষ্টামণ্ডলীর আহ্বায়ক পদ বা কোনও সমিতিরই কোনও পদ অলঙ্কৃত করার বিন্দুমাত্র বাসনাও আমার ছিল না। আমার নাম যখন ঘোষণা করা হল মিডিয়ার লোকজন, সাংবাদিকরা তখন ফিনফিনে একটি পর্দার ঠিক অপরপ্রান্তে। এ-প্রান্তে যা বলা হচ্ছে তাঁরা তা শুনতে পাচ্ছেন। পরে, 'তারা'র 'মতামত' অনুষ্ঠানের প্রযোজক পার্থ দাশগুপ্ত আমায় জানান পর্দার এ-পারে যেসব কথা হচ্ছিল তার সবটাই তিনি এবং অন্যরা ও-পার থেকে শুনতে পাচ্ছিলেন। আমি যদি তখন আপত্তি করতাম, সাংবাদিক বন্ধুরা তা শুনতে পেতেন। ফলে পরের দিন কোনও না কোন পত্রিকায় বেরোত যে বৈঠকের গোড়াতেই মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। আমি পড়লাম মহা অস্বস্তিতে। আমার একান্ত অনুভব, আমার মত না নিয়ে এই কাজটি করা অনুচিত হয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচিত ছিল আমার মত নেওয়া। আমার মত নিলে আমি আপত্তি করতাম, কিছুতেই রাজি হতাম না, তাতে তিনি যদি আমার ওপর রুষ্ট হতেন বা এমনকি ঐ সি পি আই এম বিরোধী জোট থেকে যদি আমায় আমার আপত্তির কারণে বিদায় নিতে হত তাহলেও আমার কিছু করার থাকত না। আমি ভাবতেও পারিনি যে আমার মতের তোয়াক্কা না করে অত বড় একজন নেতা এমন একটি কাজ করে বসবেন।

সত্যি বলতে, 'তারা' চ্যানেলে অনুষ্ঠান সঞ্চালন করে যে টাকা আমি আয় করতাম সেটাই ছিল আমার একমাত্র উপার্জন। টাকা রোজগারের অন্য কোনও উপায় আমার সামনে আর ছিল না। 'তারা' চ্যানেলের কাজটা চলে গেলে কী করব? বেপরোয়া স্বভাবের লোক হলেও এই প্রশ্নটি আমায় সেই মুহূর্তে একটু হলেও ভাবিয়ে তুলেছিল বৈকি। আমার বয়স তখন প্রায় ৫৮। ঐ বয়সে নতুন কাজ পাওয়া সহজ নয়। তাছাড়া মমতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে আমার গায়ে তখন তৃণমূল ছাপটি পড়ে গিয়েছে যদিও কোনও দিক দিয়েই আমি তৃণমূল দলের কেউ নই। ওটি আমার দলই নয়। আমার কোনও দলই ছিল না।

আমার মনে আছে, প্রেস কনফারেন্সে আমায় মমতার পাশে বসতে হয়েছিল। সামনে, আশপাশে মিডিয়ার কর্মীরা, যাঁদের অনেকেই আমার চেনা। 'তারা' চ্যানেল থেকেও কর্মীরা এসেছিলেন। আমারই অতি পরিচিত ক্যামেরা-প্রকৌশলী ক্যামেরা তাক করেছিলেন আমাদের দিকে। অমন অস্বস্তিতে জীবনে পড়িনি আমি। তৃণমূলের অন্য নেতারাও ছিলেন। সুনন্দ সান্যালও ছিলেন। তেমনি ছিলেন মমতার জোটসঙ্গী পি ডি এস নেতা সমীর পুততুণ্ড। পি ডি এস নেত্রী অনুরাধা পুততুণ্ডও ছিলেন। নিজে সাংবাদিক হয়ে আমি কিনা রাজনীতিকদের সঙ্গে বসে আছি সাংবাদিকদের সামনে। এও উল্লেখযোগ্য : অনেক ঘাটের জল খেয়েছি এ-জীবনে। বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমার জীবনের। আমি টের পাচ্ছিলাম—যাঁদের মধ্যে বসেছি তাঁদের একজনেরই আসলে প্রকৃত গুরুত্ব আছে। সঙ্গত কারণেই নিশ্চয়ই। কিন্তু কারণ যত সঙ্গতই হোক তাঁকে *আমার নেতা* হিসেবে মানার কোনও কারণ আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। সন্দেহ নেই—ঐ জোটের তিনি নেতা। কিন্তু *জোট রাজনীতি* করব বলে তো আর মমতার অনশন মঞ্চে যাইনি, কৃষিজমিরক্ষার আন্দোলনে সামিল হইনি। কোনও বিশেষ নেতাকে মানার বাধ্যবাধকতা আমার মন-মানসিকতায় অসুবিধে ঘটাচ্ছিল। কাজি নজরুল ইসলামের একটি কবিতার লাইন 'আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ' আমার মনের একেবারে গভীরের কথা। বেশ বোকা বোকা লাগছিল। কিন্তু সি পি আই এম বিরোধী গণ-আন্দোলনের স্বার্থে মুখ বুজে থাকতে বাধ্য হচ্ছিলাম।

'মতামত' অনুষ্ঠানের প্রযোজক পার্থ দাশগুপ্ত ঐ সাংবাদিক বৈঠকে ছিলেন। বৈঠকের পর আমরা দুজনেই এক ধরনের অস্বস্তিকর ঘোরের মধ্য দিয়ে বেরোলাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে। বলা নেই কওয়া নেই মমতা আমার নাম ঘোষণা করায় পার্থ বিচলিত, চিন্তায়ও পড়ে গিয়েছিলেন। ছটফট করছিলেন তিনি। ট্যাক্সি ধরতে চেষ্টা করছিলাম আমরা। পার্থ ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করছিলেন : কবীরদা, এটা কী হল? এবারে আপনি কী করবেন? আমাদের অনুষ্ঠানটার কী হবে?

সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামে সি পি আই এম, তাদের খুনে-বাহিনী ও পুলিশের অপকর্মের খবর দেওয়ায় পার্থ দাশগুপ্ত বড় ভূমিকা নেন। ২০০৭ সালে

নন্দীগ্রামে গণহত্যার পর ১৬ই মার্চ 'তারা' চ্যানেলের 'মতামত' অনুষ্ঠানে আমি যে বক্তব্য পেশ করি সম্ভবত তারই পরিণামে আমায় পরোক্ষভাবে কর্তৃপক্ষ জানান যে 'সিঙ্গুর' 'নন্দীগ্রাম' নাম দুটিই আর মুখে নেওয়া চলবে না 'মতামত'-এ। আমার অনুমান, তাঁরা আমায় মোটের ওপর চিনতেন এবং জানতেন যে ওরকম একটা শর্ত আরোপ করা হলে আমি ইস্তফা দেব। গণ-আন্দোলনের খবর দেওয়া প্রায় বন্ধ করে 'তারা' তখন মুম্বই-এর কোনও এক তারকার বিয়ের খবর ঘটা করে প্রচার করতে শুরু করেন। আমি ইস্তফা দিলাম। ভাল অঙ্কের পারিশ্রমিক পেতাম আমি। আমার হাতে তখন অন্য কোনও কাজ ছিল না। পার্থ কাজ ছেড়ে ছিলেন দু'দিনের মধ্যে। ক'জন রাখে এই সব খবর। দরকার-ই বা কী। ২০০৯ সালে লোকসভা ভোটের আগে পার্থ একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকায় ফ্রিলানসার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিবন্ধ ও প্রতিবেদন লিখতে থাকেন। ঐ সময়েই পার্থ দাশগুপ্ত সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল'-এর অনুসরণে সময়োপযোগী বেশ কিছু পদ্য লেখেন—বলা যায় এক ধরনের প্যারোডি-সাহিত্য। উঁচু দরের কাজ করেছিলেন তিনি, যার সমতুল্য কিছু আমি অন্তত তার আগে বাংলা ভাষায় পড়িনি। পদ্যগুলি লিখে লিখে তিনি আমায় দেখাতেন। পরে 'হ্যাঁ-বোল না-বোল' নামে বই আকারে প্রকাশিত হয় এগুলি। এই সংকলনটি গণ-আন্দোলন ও সেই যুগমুহূর্তের এক গুরুত্বময় দলিল।

'তারা' চ্যানেলের 'মতামত' অনুষ্ঠানটি সি পি আই এম বিরোধী গণ-আন্দোলনের এক ধরনের মুখপত্রই হয়ে উঠেছিল। তা ছাড়া খোলামেলা আলোচনা হত নানান বিষয়ে। লোকের ভাল লাগত। মমতা আচমকা আমার নাম ঘোষণা করে দেওয়ায় অনুষ্ঠানটার ওপরেও কেমন একটা ছায়া নেমে এল যেন। এর ফলে, গণ-আন্দোলনেরই একটু ক্ষতি হয়েছিল।

মমতার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পার্থর কথা শুনে আমি, এই স্বভাব-বাচাল, মোটের ওপর বাক্‌পটু আমি, আমতা আমতা করছিলাম। আমার লজ্জা করছিল। কারণ, এই ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রমাণ হয়ে গেল যে আমার মতের তোয়াক্কা না করে একটা ব্যাপারে আমাকে টেনে নিয়ে আসা হল (আমার মতের বিরুদ্ধে) অথচ আমি কিছুই করতে পারলাম না। 'বৃহত্তর

স্বার্থে' আমায় মুখ বুজে থাকতে হল। এই অবস্থাটাও এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে সি পি আই এমের অবদান। ঐ দলটাকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা থেকে সরানোই তখন সমবেত সকলের লক্ষ্য। নানান দ্বন্দ্ব তখন তুঙ্গে। তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে তখন দ্বন্দ্বগুলো। সেই অবস্থায় আমি বাধ্য হলাম আমার স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার ওপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপটিকে মেনে নিতে।

লোকসভা ভোটে জেতার কিছুকাল পর তৃণমূলের স্থানীয় কিছু নেতার দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হয়ে আমি যখন মুখ খুললাম, পরে 'ছত্রধরের গান' অ্যালবামটির কারণে সঙ্গীতকার ও সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে আমার স্বাধীনতার ওপর দলের নেতৃত্বের তরফে যখন হস্তক্ষেপ ঘটল এবং তারও পরে সোনারপুরে একটি জমির মালিকানা-কেন্দ্রিক টানাপোড়েনে তৃণমূলের কয়েকজন নেতা যখন আমাকে পরিকল্পনা করে অপমান করলেন, আমি তখন প্রতিবাদ করলাম। সেই সময়ে এবং তার পরেও সি পি আই এম-বিরোধী ও মমতাপন্থী অনেক ব্যক্তি এই বলে আমায় তিরস্কার করেছেন, অন্যান্য পত্রিকায় এই বলে আমার বিরুদ্ধে লিখেছেন যে আমি সি পি আই এমের হাত শক্ত করছি। উদ্যোগটি এত দূর গিয়েছিল যে এক সঙ্গীতশিল্পী একটি পত্রিকায় আমার সম্পর্কে একটি ব্যঙ্গাত্মক পদ্য লেখেন। পদ্যরচনায় দক্ষতা থাকলে লেখাটি হয়ত ভালই হত। এই মহাপ্রাণ সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম গণ-আন্দোলনের সময়ে চুপচাপ ছিলেন। থাকবেনই। কারণ তার আগে দীর্ঘকাল তিনি ছিলেন সিপিআইএম নেতা সুভাষ চক্রবর্তীর অতি ঘনিষ্ঠ ও বদান্যতাপুষ্ট। সি পি আই এম দলের ছাত্র ও যুব শাখার অনুষ্ঠান-নির্ভর ছিলেন তিনি টানা বেশ কিছু বছর। হাওয়াটা শেষবেশ কোনদিকে তা শুঁকে নিয়ে তবেই তিনি ১৪ নভেম্বরের মহামিছিলে যোগ দেন, যে মিছিলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাঁটলে 'আমরা কিন্তু ভাই খেলব না' বলে অধুনা পরিবর্তনের হাওয়ায় তোফা থাকা কয়েকজন শোরগোল তুলেছিলেন। ২০০৭-এর ১৪ নভেম্বরের আগে মহামিছিলের প্রস্তুতিপর্বে মমতাকে আটকানোর যে রব উঠেছিল তাতে এক বিখ্যাত অভিনেত্রী ও চলচ্চিত্র-নির্মাতার কণ্ঠও ছিল বলে শুনেছিলাম। ২০০৯ সালে লোকসভার নির্বাচনে মমতার সাফল্যের পর সেদিনের মমতা-বিরোধীদের মধ্যে যখন

কতকটা আচার্য আব্বাসউদ্দিনের গাওয়া 'তোরা কে কে যাবি লো জল আনতে' গানটির ধুয়ো ধরে ভোল পালটানোর তাগিদ দেখা দিল, এই মানুষটি কিন্তু তখন 'জল আনতে' যাননি।

জার্মান কাহিনীকার গ্যুন্টার গ্রাস তাঁর 'ডান্‌ৎসিগ্‌-উপন্যাসত্রয়ে'র একটিতে বর্ণনা দিচ্ছেন— : 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর হিটলারের কুকুর, কী আর করবে, এল্‌বে নদীর ধার দিয়ে হাঁটছিল। হাঁটতে হাঁটতে সে নাক উঁচিয়ে শুঁকছিল হাওয়া : পূব না পশ্চিম—কোন্‌দিকের হাওয়া তার বেশি চেনাচেনা, বেশি আপন মনে হচ্ছে। খানিক পরেই সে বুঝে নিল—পশ্চিম দিক থেকে আসা হাওয়াটাই বেশি চেনা, বেশি আপন। পূব নয়, পশ্চিম দিকেই হাঁটা দিল হিটলারের কুকুর।'

কিছুকাল ভেবেছি—যে যা চায় বলে যাক, আমি চুপ করে থাকি। সম্প্রতি মনে হয়েছে—ক্রিটিকাল বয়সে পৌঁছে গিয়েছি; যেভাবে গত পঁয়ত্রিশ বছর কাটিয়েছি কে বলতে পারে হঠাৎ মরে যাব হয়ত। কমলাকান্তর মনের কোনও কথাই এ জন্মে বলা হইল না—তা কেন হবে। কোন দুঃখে। এই বইতে তাই একটু ঝেড়ে কাশতে শুরু করলাম। কেউ কেউ অন্তত জানুন, মনে রাখুন। যে অসীম গিরি সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময়ে তাঁর গণগান ও ভাষণ দিয়ে জনতাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, তিন বছর ধরে চাকরি ও প্রাণের মায়া ছেড়ে যিনি ছুটে গিয়েছেন 'নেতা'র ডাকে, আন্দোলনের ডাকে রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে, কৃষিজমিরক্ষা কমিটির প্রতিটি সভায় যিনি থেকেছেন উপস্থিত, মেট্রো চ্যানেলের প্রতিটি সভায় যিনি সক্রিয় অংশ নিয়েছেন, তাঁকে কী সুন্দর ভুলে মেরে দেওয়া হল, একপাশে সরিয়ে দেওয়া হল। নন্দীগ্রামের বার্ষিকী উদযাপনে নেতা-অনুমোদিত রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক কোনও দলই তাঁকে ডেকে নিলেন না। ডাক পড়েনি এই বান্দারও—এক সময়ে যাকে অসীমের চেয়েও বেশি ব্যবহার করা হয়েছিল। কোনও শিরোপা বা কোনও কমিটির অমুক-তমুক পদের আশায় এ-দেশের অসীম গিরিরা লড়াই করেন না। সেই কাজটি যাঁরা করে থাকেন তাঁরা আজ ঠিকঠিক 'পদে'ই আছেন। কিন্তু অকৃতজ্ঞতা ও কৃতঘ্নতাই কি অসীম গিরিদের প্রাপ্য হবে?

স্থানীয় কিছু নেতার প্রকোপে হয়রান হয়ে শেষে আমি যখন মুখ

খুললাম, এক নামজাদা শিল্পী অনাহূতের মতো আমার বাড়িতে এসে তাঁর বিরুদ্ধে বা তাঁর সম্পর্কে আমি কিছু না বলা সত্ত্বেও আমার ওপর মহা চোটপাট শুরু করলেন এবং পাড়া মাথায় করা চিৎকার করে হুমকি দিলেন : '২০১১-র পর তোমার চরম সর্বনাশ হয়ে যাবে'—এঁদের হাতে অনেক ক্ষমতা, আরও ক্ষমতা আসবে। তাপসী মালিকদের শাহাদাতের মূল্যে আমার শ্রেণীর কিছু মানুষের হাতে আসছে ক্ষমতা। শিল্পীপ্রবর যদি তাপসী বা সুপ্রিয়া জানা বা শেখ সেলিমের মতো শহীদদের কিছু ছবি আঁকতেন তাও না হয় বুঝতাম। সেই ক্ষমতা বা ইচ্ছে কোনওটাই তাঁর নেই বোধহয়, পরে, তিনিও শুনেছি একটি কাগজে লিখেছেন আমি বব ডিলানের কয়েকটি গান নকল করে চালিয়েছি। বাকি জীবন চুপ করে থাকাই যেত। ভেবে দেখলাম একটু ঝেড়েই কাশতে শুরু করি না হয়। ২০১১-র পর যদি আমার চরম সর্বনাশ হয়েই যায় সে-ক্ষেত্রে কমলাকান্তর মনের দু'একটি কথা না হয় লিপিবদ্ধ থাক কোথাও। বছরের পর বছর শুধু এ-পক্ষ ও-পক্ষর কাছে অপমানিত হবো, হয়েই যাব সেটাই বা মেনে নিই কী করে।

কৃষিজমিরক্ষা কমিটির উপদেষ্টামণ্ডলীর আহ্বায়ক হিসেবে আমার নাম যখন মমতা আমার সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা না করে, আমার সম্মতি না নিয়ে ঘোষণা করলেন তখন আমি নিজের থেকেই মুখ বুজে ছিলাম, পাছে আন্দোলনের শত্রু সি পি আই এম কিছু বলার সুযোগ পান। এর বহু পরে মমতার প্রায় এক বছর-ব্যাপী পীড়াপীড়ি, এক শিল্পীর ওকালতি এবং আমার কয়েকজন বিজ্ঞানীবন্ধু ও সহযোদ্ধার উৎসাহে আমি শেষ পর্যন্ত ভোটে দাঁড়াতে রাজি হলাম এবং লড়তে নামলাম। তারপর যেসব অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে জনসমক্ষে কখনও সেগুলি জানাইনি। যেমন দলের নেতারা আমায় বারবার কথা দিয়েছেন যে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিটি বুথে সি আর পি মোতায়েন থাকবে। তাঁদের দেওয়া প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে ভোটের প্রচারে বেরিয়ে গ্রামে গ্রামে মহল্লায় মহল্লায় দু'মাস ধরে আমি কয়েক লক্ষ মানুষের সামনে বুক বাজিয়ে বলে বেড়িয়েছি যে এবারে প্রত্যেক বুথে সি আর পি থাকবে, অতএব সকলে যেন নির্ভয়ে ভোট দিতে যান। বাস্তবে কিন্তু আমার কেন্দ্রে আমি একটি বুথের জন্যেও

কোনও সি আর পি প্রহরা পাইনি। কাউকে বলিনি এই ভয়ানক কথার খেলাপের কথা। অথচ কে না জানত হোম গার্ড ও পশ্চিমবাংলার পুলিশকে দিয়ে ভোট করাতে গিয়ে সি পি আই এম কিভাবে কারচুপি করে এসেছেন দীর্ঘকাল। বুথে সি আর পি থাকলে তাঁরা অনেকটা কাবু। আমার ভোটে দাঁড়ানোর একটি প্রধান শর্ত ছিল যে আমার কেন্দ্রের প্রতিটি বুথে সি আর পি থাকবে। দলের শীর্ষ নেতারা আমায় একাধিকবার কথা দিয়েছিলেন এই মর্মে। ভোটের ঠিক দু'দিন আগে রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ এক নেতা দুটি স্কর্পিয়ো গাড়িতে লোকজন নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং জানান—সি আর পি নিয়ে আমার চিন্তার কোনও কারণ নেই। সব থাকবে। সি আর পি জওয়ানরা এমনকি রুট মার্চ করবে যাদবপুর এলাকায়। আমি হাঁ করে দেখছিলাম বেচারির দৌড়। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের বুথগুলোয় সি আর পি মোতায়েনের গল্পটা যে আসলে কী তা আমার বিলক্ষণ জানা ছিল। ঐ নেতা যখন— রাজনীতির ঈশ্বরই জানেন কেন—দুই গাড়ি বোঝাই অনুগামী নিয়ে অত রাতে আমায় আবার একটা মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিতে আমার বাড়ি আসেন তখন আমার এক বন্ধু ও সহযোদ্ধা আমার সঙ্গে ছিলেন। অদ্ভুত এক ভাঁওতাবাজির সাক্ষী থেকে গেলেন তিনি।

আমি গানবাজনার লোক বলে অনেকেই হয়ত ধরে নিয়েছিলেন (সম্ভবত এখনও নেন) যে আমি নিরেট বোকা, কিছুই বুঝব না, খতিয়ে দেখব না। নেতারা কেউ জানেওনি যে তৃণমূল কংগ্রেসের বাইরের কিছু অভিজ্ঞ মানুষ নিতান্ত দয়াপরবশ হয়ে আমায় কিছু খবর দিতে থাকেন। যেমন—আমার লোকসভা কেন্দ্রের কোনও বুথের জন্যই আমি সি আর পি পাবো না। তাঁদেরই দেওয়া সূত্র ধরে আমি দিল্লির এক প্রভাবশালী ব্যক্তির শরণ নিই এবং তিনি কী করে জানি না বারুইপুর বৃন্দাখালির জয়াতলা গ্রামের জন্য (যেখানে শেষ কবে ঠিকঠাক ভোট হয়েছিল কেউ জানে না, যেখানকার গ্রামবাসীদের ওপর সি পি আই এম অনেক অত্যাচার করেছেন) এবং যাদবপুর বিধানসভা এলাকার জন্য সব মিলিয়ে চার জন সি আর পি মোতায়েনের ব্যবস্থা করে দেন। আমি যে এই গুটিকয়েক সি আর পি জওয়ান পেলাম সে-ব্যাপারে তৃণমূল কংগ্রেসের

কোনও নেতার কোনও ভূমিকা ছিল না। যাদবপুর বিধানসভা এলাকার জন্য পাঠানো দুই সি আর পি কোনও বিশেষ বুথে মোতায়েন ছিলেন না। তাঁরা একটি গাড়িতে ছিলেন। কোথায় কোথায় সি পি আই এম গোলমাল করছে সেই খবর আমার ভোট-পরিচালনা-অফিসে পৌঁছনোমাত্র অফিসের দুই পরিচালক (কেউই তৃণমূল দলের নন) ব্যবস্থা নিচ্ছিলেন যাতে গাড়িতে করে দুই সি আর পি জওয়ান উপদ্রুত বুথে ছুটতে পারেন। এইভাবে গড়িয়া, গাঙ্গুলিবাগান ইত্যাদি অঞ্চলে কিছু ছাপ্পা ভোট ঠেকাতে পেরেছিলাম আমরা। এর আগের বারেও এইসব জায়গায় ভোট লুঠ করেছিলেন সি পি আই এম। নেতাদের দেওয়া পৌনঃপুনিক অঙ্গীকার মাফিক যদি সব বুথে সি আর পির পাহারা পেতাম তাহলে (আমি না) তাপসী মালিক, রাজকুমার ভুল, সুপ্রিয়া জানা, শেখ সেলিম, ভরত মণ্ডল এবং অন্য শহীদরা, সি পি আই এম গুণ্ডাদের ধর্ষণে ক্লিষ্ট নন্দীগ্রামের বীরাঙ্গনারা আরও বেশি ভোটে জিততেন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে। এতদিন মুখ বুজে ছিলাম। আজ, অবশেষে আমি এই খবরটুকু অন্তত দিলাম যাতে যে সুধী মণ্ডলী সি পি আই এমেরও বিরুদ্ধে আবার আমারও বিরুদ্ধে মুখ খুলে থাকেন, লেখালিখি করে থাকেন আর দাবি করে থাকেন যে আমি সি পি আই এম-কে সাহায্য করছি—তাঁরা এবং সেই সঙ্গে অন্যরাও জানতে পারেন কোন কোন বিষয়ে আমি মুখ বুজে থেকেছি। সি পি আই এমের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি আমি, তাঁদের সাহায্য করিনি। সি পি আই এম-কে সাহায্য করেছেন বরং তাঁরাই, যাঁরা আমায় মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ভোটের আগে, সম্ভবত এই আশায় যে আমি বোকার মতো তাঁদের কথা বিশ্বাস ক'রে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হেরে যাব।

আলবেয়র কামু তাঁর 'দ্য রেবেল' গ্রন্থে লিখেছেন : "Even a slave says NO." একটা মুহূর্ত আসে যখন ক্রীতদাসও 'না' বলে।—না বলতে বাধ্য হয়। আমি ক্রীতদাস বা কারুরই, কোনও নেতা, কোনও দল, কোনও মতবাদ, কোনও কিছুরই দাস নই। আমি তো 'না' বলবই। বাংলার গ্রামবাসীরা একাধিক দশক সহ্য করেছেন অনেক কিছু। অনেক নির্যাতন, অনেক গা-জোয়ারি, অনেক তঞ্চকতা। তারপর তাঁরা সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে 'না' বলতে শুরু করেছেন। সিঙ্গুর 'না' বলেছে। নন্দীগ্রাম 'না'

বলেছে। লালগড় 'না' বলেছে। তবে না পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি পি আই এমের মসনদ টলে গিয়েছে। গত লোকসভা ভোটে কুড়িটি আসন পেয়েছেন মমতার দল (একজন 'নির্দল' এস ইউ সি প্রার্থী)।

পেশাদার সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে আমি ২০০০ সাল থেকেই আর মোটেও নিয়মিত কাজ করছিলাম না। বাজারি পরিভাষায় : আমার কোনও 'বাজার' আর ছিল না। আমাদের রাজ্যে জলসার ইন্ডাস্ট্রিটা সি পি আই এম দলই মোটের ওপর নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন বেশ কিছু বছর হল। আমি তাঁদের সামনে কোনওদিনই জি-হুজুর-জি-হুজুর করিনি, বরং একাধিক বিষয়ে আমার সঙ্গে তাঁদের বিরোধ দেখা দিয়েছিল, তাই বাংলাগানের জলসায় আমি কোনওদিনই বিশেষ ডাক পাইনি। আমায় যাঁরা গানের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাতেন তাঁরা আসলে সি পি আই এম বিরোধী। তেমনি ১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ৯৫ শতাংশ একক অনুষ্ঠান আমি কোনও- না-কোনও কারণে বিনা পারিশ্রমিকে করেছি। অন্যদিকে, রাজ্যজুড়ে নিয়মিত জলসায় ডাক পাওয়ার মতো ব্যাপক জনপ্রিয়তাও কোনওদিনই আমার ছিল না। আমার গান সকলের জন্য নয়, সংখ্যালঘু কিছু মানুষের জন্য। কাজেই এর 'বাজার' সীমিত হতে বাধ্য। তার ওপর আবার বিধি আক্ষরিক অর্থেই বাম, ফলে —। কাজেই ২০০৬ সালে তারা নিউজ চ্যানেলে আমার কাজটাই ছিল আমার আয়ের, বলতে গেলে, একমাত্র উৎস। এমনকি তারও মায়া কাটিয়ে দিতে হল।

এই বয়সে এতটা ঝুঁকি নিচ্ছি এটা বুঝেই হয়ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমায় স্বীকৃতি জানাতে চাইছিলেন। তাঁর দিক থেকে এ ছিল হয়ত চলতি আন্দোলনে আমার ভূমিকার স্বীকৃতি, আমার প্রতি তাঁদের বন্ধুতা ও সংহতির বহিঃপ্রকাশ। এ-জন্য আমি তাঁর কাছে, তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু যে যাই বলুন ও ভাবুন, পদটি গ্রহণ করতে আমি আদৌ রাজি কিনা তা আমার কাছে আগে জেনে নেওয়া উচিত ছিল। কারণ, বিবেক ও যুক্তির তাড়নায় কোনও আন্দোলনে যোগ দেওয়া এক, আর সেই আন্দোলনের স্বার্থে গঠিত কোনও কমিটির কোনও পদাধিকারী হওয়া অন্য। আমার রচনা করা গানে ব্যক্তির জীবনের পাশাপাশি বরাবরই নানান সামাজিক বিষয়ও স্থান পেয়েছে। জায়গা করে নিয়েছে আমার নিজের দৃষ্টিভঙ্গি, আমার বক্তব্য,

'স্টেট্‌মেন্ট।' কিন্তু কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক জোটের সঙ্গে কোনওদিনই নিজেকে মেলাতে পারিনি, মেলাতে চাইওনি। এক সময়ে পি ডব্‌লিউ-এর প্রতি দুর্বল ছিলাম, সশস্ত্র প্রতিরোধ ও অভ্যুত্থানের প্রয়োজনীয়তা আমি বিলক্ষণ অনুভব করেছি। কিন্তু কমিউনিস্ট মতবাদ ও রেজিমেন্টেশন মেনে নিতে পারিনি। কোনও রেজিমেন্টেশনেই আমার ধাতে সয় না। তাই প্রকাশ্যে পি ডব্‌লিউ-এর পক্ষ নিলেও কখনও সেই দলের সদস্য হওয়ার কথা ভাবিনি। তেমনি, মহাত্মা গান্ধীর মতবাদের কোনও কোনও দিক, বিশেষ করে কোনও কোনও ক্ষেত্রে অহিংস সত্যাগ্রহের গুরুত্ব ও কার্যকারিতা সম্পর্কেও আমার মনে যথেষ্ট শ্রদ্ধা আগেও ছিল, এখনও আছে। তবে কোনও মত বা পদ্ধতির প্রতিই নিরঙ্কুশ আনুগত্য আমার কোনওদিনই নেই। প্রত্যেক কমিটিরই বিশেষ কিছু নিয়ম থাকে, কর্মধারা থাকে। আমার স্বভাবটাই এমন যে সেগুলো আমার ভাল লাগে না, কারণ আমি দল-সভা-সমিতির লোক নই। আমি individual। আমি বরাবর লক্ষ্য করেছি, সভা-সমিতিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনেকের কাছেই অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। আর তা থেকে শুরু হয় বিরোধ।

বিরোধাভাস কিন্তু দেখা দিল 'তারা' নিউজ চ্যানেলের দু'একজন কর্তার মধ্যে। কৃষিজমিরক্ষা কমিটির সাংবাদিক বৈঠক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে সরাসরি ব্যা রেকর্ড করে সম্প্রচার হল সমস্ত টিভি চ্যানেলে। আমি বসেছিলাম মমতার পাশেই। অনেকেই ভেবে নিলেন আমি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলাম। এই ভেবে-নেওয়ার কিন্তু কোনও কারণ ছিল না। আসলে, কৃষিজমিরক্ষা কমিটি যে একটা জোট—এটা অনেকেই যেন ভাবতে পারছিলেন না। তার একটা কারণ হয়ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। এই কমিটিতে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে মমতার রাজনৈতিক গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। শুধু বেশি নয়, এতটাই বেশি যে তাঁর পাশে অন্য সকলে কিছুটা হলেও ম্লান। মমতা এক phenomenon। তিনি একাই একটি দল যেন। যে সত্য তর্কাতীত : মমতার একক রাজনৈতিক শক্তিই তৃণমূল কংগ্রেসকে মূলত চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসকে আমি বাইরে থেকেই দেখেছি। মমতা যেখানে মধ্যমণি সেখানে তাঁর ওপরেই জনগণ ও মিডিয়ার দৃষ্টি সবচেয়ে বেশি। কাজেই তাঁর পাশে বসা মানে তাঁর ছায়ায় থাকা।

রাজনীতিক হিসেবে মমতার পাশে বসার যোগ্যতাই আমার নেই, কারণ আমি রাজনীতির লোকই নই।

মিডিয়ার আর সকলের মধ্যে একমাত্র কলকাতা টিভির সঞ্চালক, অভিজ্ঞ সাংবাদিক রজত রায়কে দেখেছি 'জোট' কথাটির ওপর জোর দিতে। সাংবাদিক বৈঠকের পর তাঁকে ফোন করায় তিনি বলেছিলেন—'দারুণ হয়েছে, সুমনদা। তুমি 'তারা'র সঞ্চালক। সপ্তাহে পাঁচ দিন লোকে তোমায় 'তারা'য় দেখে। কিন্তু আজ দেশের সবকটা চ্যানেল তোমায় না দেখিয়ে পারেনি। দেখাতেই হয়েছে তোমাকে। 'তারা'র কর্তাদের তো এ-জন্য খুশি হওয়ার কথা। ওদের চ্যানেলের একজন প্রধান সঞ্চালককেই তো দেখাল সবাই মিলে, সবকটা চ্যানেল। বিজ্ঞাপনটা তাহলে কার হল?'—এই বলে রজত হো হো করে হাসতে লাগলেন। আমি তাঁকে বললাম—কিন্তু রজত, অনেকেই তো বলছে আমি তৃণমূল হয়ে গেলাম। রজত বললেন—'এই তো! তৃণমূল কোথায়? এটা একটা জোট। জোট। সেটাই প্রথম এবং শেষ কথা। জোট।'

ঠিকই বলেছিলেন রজত। কৃষিজমিরক্ষা কমিটিতে TASAM এর পক্ষ থেকে ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপক : অনুপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভাস্কর গুপ্ত। গণ প্রতিরোধ মঞ্চ থেকে প্রসূন চট্টোপাধ্যায় ও রাজা সরখেল। (বর্তমানে দু'জনেই ভয়াবহ আইন ইউ এ পি এর আওতায় কারাবন্দী)। CPI ML (N.D.) থেকে পল্টু সেন, চন্দন। মজদুর ক্রান্তি পরিষদ থেকে বিশ্বজিৎ (শ্রমিক আভাস মুনশি মমতার সঙ্গে অনশন করেছিলেন)। CPI ML এর একটি শাখাদল থেকে দোলা সেন, পূর্ণেন্দু বসু, প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। জন সংঘর্ষ সমিতি থেকে মন্মথ ঘোষ। তেমনি দলহীন ব্যক্তি হিসেবে ছিলেন সুনন্দ সান্যাল, হিমাংশু হালদার, অসীম গিরি, দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। আরও কেউ কেউ ছিলেন। ভারতের মুসলিম লিগের প্রতিনিধিদেরও দেখেছিলাম প্রথমে। কাজেই, কৃষিজমিরক্ষা কমিটি ছিল একটি জোট। ওটি তৃণমূল কংগ্রেস ছিল না। যদি হত তাহলে আমাদের মধ্যে অনেকেই ওখানে প্রথম থেকেই থাকতাম না।

কারও কারও পুরো নাম আমার জানা ছিল না, মনেও নেই। অল্প

সময়ে কতজনের সঙ্গে যে আলাপ পরিচয় হয়েছিল, ইয়ত্তা নেই। বেশিরভাগ সহযোদ্ধাকেই আগে চিনতাম না। আজ, এই বইটি লেখার সময়ে কারও কারও পুরো নাম মনে পড়ছে না, এ-জন্য মার্জনা চাইছি সকলের কাছে, পাঠকদেরও কাছে। এটি ইতিহাসের বই নয়। আমার জীবনের একটি অংশের কাহিনী। এই মুহূর্তে কার কাছে গিয়ে জানতে চাইব কার পুরো নাম কী ছিল। মাস নয়েক হল রাজনীতির অনেক কিছু থেকে, অনেকের থেকেই দূরে আছি আমি।

চার

আমার মনে আছে, এর অনেক পরে, সিঙ্গুরে মমতার ধরনা ও অবরোধের পর কৃষিজমিরক্ষা কমিটির একটি সভা হয়েছিল। সেখানে ভাষণ দিতে গিয়ে দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি দুজনেই বলেছিলাম যে ঐ সভাটি তৃণমূল কংগ্রেসের হলে আমরা মঞ্চে হাজির থাকতাম না। ঐ সভাটির কথা আমার মনে আছে বিশেষত এই কারণে যে ওখানেই আমি প্রথম 'শালবল্লার বেড়ায় আগুন বিরোধী নিশান ওড়া' গানটি খালি গলায় গেয়েছিলাম। অনেক কৃষিজীবী তাঁদের জমির দলিল হাতে বসেছিলেন। তাঁরা সরকারকে জমি দেননি।

সাংবাদিক রজতের স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি অনেকের মধ্যেই দেখিনি। সে-সময়কার গণ-আন্দোলনে রজতের ভূমিকা ছিল বড়। 'কলকাতা টিভি'ও সে-সময়ে গণমুখী ভূমিকা নিয়েছিলেন।

বিভ্রান্তি ও ভুলবোঝাবুঝির মধ্যেও আমার মজা লাগছিল অন্য একটি ঘটনার সঙ্গে এই ঘটনাটির তুলনা করে। কয়েক বছর আগে 'লাইভ দশটায়' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সি পি আই এম নেতা বিমান বসুর সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠার পর একদিন তিনি আমায় ফোন করে অনুরোধ করলেন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এক সমাবেশে আধ ঘণ্টার জন্য হলেও আসতে। এমনিতে তাঁকে আমার রসিক মানুষ বলেই মনে হত, সহজভাবে কথা বলতেন তিনি আমার সঙ্গে। বললেন—বিষয়টা আপনার পছন্দসই হবে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা। আধ ঘণ্টার বেশি সময় নেব না আপনার।—সেই সমাবেশে আমি একাধিক সি পি আই এম নেতার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম, অনেক ছবিও উঠেছিল। ঘনিষ্ঠভাবে কথাও বলেছিলাম বামপন্থী নেতাদের

সঙ্গে। মঞ্চ থেকে ভাষণও দিয়েছিলাম সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। পত্রিকায় ও টেলিভিশনে সেই সব মুহূর্তের ছবি অনেকেই দেখেছেন। তাই বলে কাউকে কিন্তু বলতে শুনিনি—এ মা, আপনি সি পি এম বা বামফ্রন্টি হয়ে গেলেন! —এর একটা কারণ হতে পারে—আমার সম্পর্কে এবং আমার সঙ্গে যাঁরা কথা বলেন তাঁরা সকলেই হয়ত বামপন্থী। কাজেই কোনও বামপন্থী নেতার পাশে দাঁড়ালে বা বসলে জাত যায় না। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেহেতু বামপন্থীদের চক্ষুশূল তাই তাঁর পাশে দাঁড়ালে বা বসলে জাত যায়, 'গেল গেল' রব ওঠে। এটা হাস্যকর ও বিরক্তিকর। আমাদের রাজ্যের বামপন্থীদের চিরকেলে দাবি : কংগ্রেসীরা নন, বামপন্থীরাই আসলে গণতান্ত্রিক। বামপন্থীরাই জানেন মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের মর্ম। সত্যিই তো। সিঙ্গুর আর নন্দীগ্রামে সি পি আই এম দল ও তাঁদের নেতারা কী সুন্দর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিচয় দিলেন। তারপর দিলেন লালগড়ে। নন্দীগ্রামে দু'দুবার গণহত্যা ও গণধর্ষণের পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন বামপন্থী নেতাও পদত্যাগ করলেন না মন্ত্রীপদ থেকে। উল্লেখযোগ্য গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ দিয়ে সব শরিক দলের মন্ত্রীই থেকে গেলেন যে যার আসনে। Democratic tenacity একেই বলে।

আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো গণতন্ত্রবিরোধী। কারণ, তিনি 'বামপন্থী' নন। অতএব তাঁর পাশে বসলে বাম-গণতান্ত্রিক বাংলায় জাত যায় বৈকি।

'বামের পাশে বসলে সিদ্ধকাম
বামের ঘরে সেঁধিয়ে গেলেই হয়
তোমার পাশে বসলেই বদনাম
সেই কারণেই চাইছি তোমার জয়।'

এই কটি লাইন লিখেছিলাম সেই সময়ে। সুরও দিয়েছিলাম। গেয়েওছিলাম একটি একক অনুষ্ঠানে। ছোট্ট এই গানটি শুনে অনেকে ভয়ানক চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছিলেন। একাধিক কণ্ঠ চিৎকার করে বলছিল : "Suman, you are finished."

ঐ অনুষ্ঠানে আমি মমতাকে উদ্দেশ করে বলেছিলাম : মমতা, তুমি যদি ক্ষমতায় আসার পর স্বৈরাচারী হও তাহলে আমি তোমার বিরুদ্ধেও রাস্তায় নামব।

পশ্চিমবঙ্গ কৃষিজমিরক্ষা কমিটির উপদেষ্টামণ্ডলীর আহ্বায়ক হিসেবে আমার নাম ঘোষিত হওয়ার পরের দিন আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে টেলিফোন করে বলি যে কাজটা ভুল হয়েছে। কারণ, আমি একজন সাংবাদিক। সপ্তাহে পাঁচ দিন একটি টেলিভিশন চ্যানেলের লাইভ আলোচনা অনুষ্ঠান পরিচালনা করে থাকি। রাজ্যসরকার কৃষিজমি অধিগ্রহণ করে শিল্প গড়ে তুলতে চাইছেন, কোথাও দিশি কোথাও আবার বিদেশি পুঁজিপতির হাতে তুলে দিতে চাইছেন বহুফসলা জমি এবং সেটা করতে গিয়ে না ভাবছেন কৃষিজীবীদের কথা, না ভেবে দেখছেন পরিবেশের কথা, তাই গণ-আন্দোলন জেগে উঠছে, গ্রামবাসীরা প্রতিরোধ করছেন—এরকমেরই এক বিস্ফোরক যুগমুহূর্তে আমরা রয়েছি। ফলে প্রায় প্রতিদিনই 'মতামত' অনুষ্ঠানে এটাই হয়ে উঠছে বিষয়। নানান দিক থেকে আলোচনা চলছে এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই। এই সময়ে লাইভ আলোচনা অনুষ্ঠানের সঞ্চালক নিজেই যদি কৃষিজমিরক্ষা কমিটির একজন পদাধিকারী হয়ে যান তাহলে কারও কারও মনে হতেই পারে যে সঞ্চালকের অবস্থান পক্ষপাতপূর্ণ। সন্দেহ নেই, আমি 'নিরপেক্ষতা'য় বিশ্বাসী নই। আমার বিষয় নির্বাচন, আমার দৃষ্টিভঙ্গি, আমার যুক্তি—সব দিক দিয়েই আমি একটি পক্ষ নিয়েই ফেলেছি। আমি এমনিতেই কৃষিজমি রক্ষার পক্ষে। পরিবেশ রক্ষার পক্ষে। কৃষিজীবীদের আত্মনির্ধারণ-অধিকারের পক্ষে। এই দিকগুলি কোনও সরকার বা দল যদি না বিবেচনা করেন তাহলে আমি সেই সরকার ও দলের বিপক্ষে। কিন্তু কৃষিজমিরক্ষা কমিটির কোনও পদে আসীন হলে আমি একটু অসুবিধেয় পড়ব, আমার চ্যানেলও পড়বে।

আমার কথা শুনে মমতা আমায় বললেন—সব সময়ে তিনি আমায় ডাকবেন না। ডাকবেন কেবল বিশেষ বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে। আমার বন্ধু, সে-সময়ে তারা নিউজ চ্যানেলের একজন কর্তা ডক্টর অমিত চক্রবর্তী সেই দিনই আমায় টেলিফোন করে কৃষিজমি-রক্ষা কমিটিতে আমার উপদেষ্টা পদে আসীন হওয়ার ব্যাপারে তাঁর আশঙ্কার কথা জানালেন। মমতার সঙ্গে আমার কী কথা হয়েছে তা তাঁকে জানানোয় তিনি তেমন আশ্বস্ত হলেন বলে মনে হল না। তাঁর মন হল না সংশয়মুক্ত। অমিতের জন্য আমার খুব

খারাপ লাগছিল। তারা চ্যানেলের সি ই ও তিনি। মমতার অনশন মঞ্চে যাওয়ার সময়ে চাকরি ছেড়ে দিয়ে যাব কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি আমায় বরং বলেছিলেন—'না না, আপনি যান।' একদিন দু'দিন নয়, দিনের পর দিন মঞ্চে গিয়েছি, ভাষণ দিয়েছি, গান গেয়েছি, বলতে গেলে মমতার মঞ্চের একজন হয়ে উঠেছি। বাজি শুধু আমিই ধরিনি, তারা চ্যানেলের সি ই ও হিসেবে অমিত চক্রবর্তীও ধরেছেন। কিন্তু এটাও ভেবে দেখা দরকার যে সপ্তাহে পাঁচ দিন একটা লাইভ অনুষ্ঠান চালাতে গেলে টিভি চ্যানেলের কর্তৃপক্ষকে কিছু নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিতে হয়, কর্মী নিয়োগ করতে হয়, টাকা বরাদ্দ করতে হয়। অনুষ্ঠানটি দিব্যি চলছে, এমন সময়ে অনুষ্ঠান সঞ্চালক সম্পর্কে দর্শকদের মনে যদি কোনও কারণে ধারণা জন্মায় যে ব্যক্তিটি একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত, তাহলে অনুষ্ঠানটি মার খেতেই পারে। সত্যি বলতে, মমতা আমার নাম ঘোষণা করার পর আমায় সঞ্চালকের আসনে বসে শুনতে হয়েছে একাধিক শ্রোতা টেলিফোন করে বলছেন—'আপনি তো তৃণমূল।' —আমি সত্যিই তৃণমূল হলেও বা একটা কথা ছিল। তা আমি নই, তাই আমায় যুক্তি দেখাতে হচ্ছিল। সঞ্চালক defensive হয়ে পড়লেই অনুষ্ঠানের সর্বনাশ। অনেক কালের সাংবাদিক আমি। এই ঘটনার পর সপ্তাহে পাঁচ দিন লাইভ স্টুডিয়োয় বসে বেশ বেকায়দায় থাকতে হচ্ছিল আমাকে।

Objectivity নাকি Subjectivity ?

সাংবাদিকতায় বা জীবনের আরও অনেক ক্ষেত্রে objective হওয়া কি আদৌ সম্ভব?

১৯৮৩ সালে, আমি তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চাকরি করছি, আমেরিকার বিজ্ঞানী (বায়োকেমিস্ট) ও যুদ্ধবিরোধী অ্যাকটিভিস্ট প্রফেসর জর্জ ওয়াল্ডের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। ১৯৬৭ সালে জর্জ ওয়াল্ড্ নোবেল পুরস্কার পান দৃষ্টির ওপর তাঁর গবেষণার জন্য। ১৯৪৮ সালে তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োলজি বিভাগের 'ফুল প্রফেসর' পদ

পেয়েছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর যখন আলাপ হল তাঁর বয়স তখন ৭৭। বেজায় মজার মানুষ। প্রথম আলাপেই আমায় বলেছিলেন, 'আমি হলাম হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এমেরিটাস। প্রুশিয়ার সম্রাট ফ্রেডারিক দ্য গ্রেট কী বলেছিলেন জানো? বলেছিলেন—প্রফেসর আর গণিকাদের প্রতিটি রাস্তার মোড়ে কিনতে পাওয়া যায়।—এবারে বুঝেছ আমি কী?' আমি সাংবাদিক শুনে বলেছিলেন, 'শোনো, তোমায় বলি—অবজেকটিভ বলে কিছু হয় না, সবই সাবজেকটিভ। যত বাঁচবে ততই দেখবে পৃথিবীতে এক-শ্রেণীর লোক আছে যারা মনে করে দৃষ্টিভঙ্গিতে অবজেকটিভ হওয়া দরকার। এরা আবার বিজ্ঞানের দৃষ্টান্ত দেয়। এই মূর্খগুলো জানে না বিজ্ঞান কী। তোমায় আমি শিখিয়ে দিই, এসো, ঐ মূর্খদের সঙ্গে তর্ক হলে কী বলবে। বলবে, পদার্থবিজ্ঞানে যে-কোনও পদার্থকণিকা নিয়ে গবেষণা করার সময়ে সেটাকে কণিকা হিসেবেও দেখতে পারো আবার তরঙ্গ হিসেবেও দেখতে পারো। কিভাবে দেখবে সেটা তোমার ব্যাপার। তুমি যা ঠিক করবে সেইমতোই গবেষণাটা হবে। অর্থাৎ এটা সাবজেক্টিভ। অবজেক্টিভ নয়। অবজেক্টিভ দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব অসম্ভব।'

২০০৬ সাল থেকে সিঙ্গুরে টাটাদের মোটরগাড়ির কারখানার জন্য কৃষিজমি অধিগ্রহণ করার বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের সি পি আই এম মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে পার্টির ঝাড়ুদার পর্যন্ত যা যা বলেছেন সবই সাবজেকটিভ। তেমনি দিনের পর দিন 'তারা' নিউজ চ্যানেলের 'মতামত' অনুষ্ঠানে সিঙ্গুর, জমি অধিগ্রহণ, এ-রাজ্যে লগ্নি, শিল্পায়ন, কৃষিজমি রক্ষার আন্দোলন, সরকারের প্রতিক্রিয়া, বিরোধীদের ভূমিকা, বিরোধীদের প্রতি বামফ্রন্ট সরকারের মনোভাব, নন্দীগ্রামের গণ-অভ্যুত্থান ইত্যাদি বিষয় যে নির্বাচন করা হত তা অবজেক্টিভ নয়, সাবজেক্টিভ প্রক্রিয়া। সঞ্চালক হিসেবে আমার মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অবশ্যই সাবজেকটিভ। অবজেক্টিভ হওয়ার কোনও অসম্ভব দাবি আমার কখনওই ছিল না। কৃষিজমি রক্ষা কমিটির একটি পদ পেয়ে আমার মনোভাব যা ছিল, ঐ পদটি আদৌ না পেলে, অনশন মঞ্চে না গেলে মনোভাব থাকত কিন্তু একই।

কৃষিজমি রক্ষা কমিটির সাংবাদিক বৈঠকের পর কমিটি মিটিং-এ আমি

আর বিশেষ যাচ্ছিলাম না। মমতাও আমায় ডাকছিলেন না। কিন্তু আমাদের মধ্যে যোগাযোগ হচ্ছিল। বেশিরভাগটাই এস এম এস-এ। অনশনের কারণে ওঁর স্বাস্থ্যের কোনও ক্ষতি হয়েছে কিনা, মমতা আছেন কেমন জানতে চাইতাম। উনি আমায় উত্তর দিতেন।

কী একটা কারণে আমার মন খারাপ ছিল। আমার এস এম এস উত্তর থেকে তা টের পেয়ে মমতা আমায় লিখেছিলেন—'কবীরদা, ফাঁক পেলেই নিজের তৈরি করা গানগুলো শুনো, দেখবে মন ঠিক হয়ে যাবে।' মহাশ্বেতা দেবীও সুযোগ পেলেই আমায় বলতেন—'গান তোমার এক বিরাট অস্ত্র। নতুন নতুন গান তৈরি করো, কবীর।'

সিঙ্গুর নন্দীগ্রামে কৃষিজীবী শ্রমজীবীদের প্রতিরোধ, তাপসী মালিকের শোচনীয় মৃত্যু, আরও গ্রামবাসীর শাহাদাত বরণ আমায় দীর্ঘকাল পরে একের পর এক গান লেখার তাগিদ দিচ্ছিল। সাংবাদিকতায় ও গণ-আন্দোলনে জড়িত থাকায় খুব কাছ থেকে অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম। সারাক্ষণই মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল মানুষের মুখ, মানুষের লড়াই, মানুষের আশা, হতাশা, যন্ত্রণা, স্বপ্ন, ভালোবাসা, জয় পরাজয়, সাহস, আত্মদান, দুঃখ, রুখে দাঁড়ানো, প্রতিরোধ। এ থেকে বেরিয়ে আসছিল গানের পর গান। একাধিক গানের লিরিক সেই সময়ে দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকা ও কয়েকটি লিটল ম্যাগাজিনে ছাপা হয়। কলকাতার 'কসমিক হারমোনি' সংস্থা আমার গণ-আন্দোলন পর্বের গানগুলি নিয়ে দুটি অ্যালবাম প্রকাশ করেন : 'নন্দীগ্রাম' ও 'প্রতিরোধ'। সংস্থার কর্ণধার সুমন চট্টোপাধ্যায় (ইনি কিন্তু সাংবাদিক নন, এক সময়ে পেশাদার গায়ক ছিলেন, প্রধানত জনপ্রিয় হিন্দি ছবির গান গাইতেন—এক চমৎকার মানুষ, আমার স্নেহভাজন বন্ধু) লাভ লোকসানের কথা না ভেবে এই অ্যালবাম দুটি প্রকাশ করার যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তা ভোলার নয়। অ্যালবাম বিক্রী করে যে টাকা পাওয়া গিয়েছিল তা ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটিকে দিয়ে দেওয়া হয়। ২০০৭ সালে উত্তম মঞ্চে কবি জয় গোস্বামী ও আমি 'কবি ও কবিয়াল' নামে একটি অনুষ্ঠান করেছিলাম। কসমিক হারমোনি ছিলেন আয়োজক। সেই অনুষ্ঠানে নন্দীগ্রাম আন্দোলন ও ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির এক নেতা শেখ সুফিয়ান কয়েজন গ্রামবাসীকে নিয়ে এসেছিলেন,

মঞ্চে উঠেছিলেন এবং টাকা নিয়ে গিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, 'নন্দীগ্রাম' ও 'প্রতিরোধ' অ্যালবাম দুটি থেকে কসমিক হারমোনি বা আমার একটি পয়সাও লাভ হয়নি। বরং খরচই হয়েছে যথেষ্টরও বেশি।

ঐ সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুদানে অসীম গিরির গাওয়া কিছু প্রতিবাদী গান ও গণসঙ্গীতের একটি অ্যালবাম বেরোয় : 'নন্দীগ্রাম টু মেগাসিটি।' এর মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ও সুর করা একটি গানও ছিল। একটি ছিল অসীমের রচনা। বাকি গানগুলি বিভিন্ন রচয়িতার। যতদূর জানি, কসমিক হারমোনি এই অ্যালবামটিরও বিপণন করেছিলেন।

নন্দীগ্রামে গণ-অভ্যুত্থানের পর পশ্চিমবঙ্গ অনেকটাই পালটে গেল। আমরাও অনেকে যেন জ্বলে উঠলাম নতুন এক উত্তেজনায়, আশায়। গ্রামের মেয়েরা বঁটি হাতে রুখে দাঁড়িয়েছেন, অসংখ্য কৃষিজীবী মানুষ একজোট হয়ে সরকার ও সি পি আই এমকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন— টেলিভিশনে এইসব ফুটেজ আমাদের উদ্বেল করে তুলল। নন্দীগ্রামের একাধিক মানুষ শাহাদাত বরণ করলেন সি পি আই এম ও পুলিশের মিলিত আক্রমণে। পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ প্রকাশ্যে সাহায্য করতে লাগল সি পি আই এমের কাডারদের।

তারা নিউজ চ্যানেলের 'মতামত' অনুষ্ঠানের জন্য নন্দীগ্রামের সোনাচূড়ায় গিয়েছিলাম আমরা এর পরেই। আমার সঙ্গে ছিলেন প্রযোজক পার্থ দাশগুপ্ত, ক্যামেরা-প্রকৌশলী অনির্বাণ সাধু, সহকারী শুভেন্দু কয়াল ও সুকান্ত। আমাদের সাহায্য করছিলেন 'তারা'র জেলা-সংবাদদাতা গৌরাঙ্গ দেব হাজরা। সাংবাদিক হিসেবে দেশে বিদেশে অনেক সাক্ষাৎকার নিয়েছি। কিন্তু সোনাচূড়ায় শহীদ ভরত মণ্ডলের স্ত্রী, মা এবং গ্রামের অন্য মেয়েরা যে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন তা একেবারেই আলাদা। আমার মনে আছে শহীদ ভরতের নিতান্তই নাবালক ছেলেমেয়েদের মাথা তখনও কামানো। একটি প্রশ্নের উত্তরে শহীদের মা বলেছিলেন : 'আমার এক ভরত গিয়েছে তাতে কী, হাজার ভরত আছে আমার, বাবা।'

সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম আন্দোলন ও শাসকদলবিরোধী গণসংগ্রামের খবর নিতে ও দিতে 'তারা' নিউজ চ্যানেলের পক্ষ থেকে যেখানে গিয়েছি ঐ টীমটাই সাধারণত সঙ্গে থাকত। আমরা প্রত্যেকেই তখন engaged ।

সকলেই অ্যাকটিভিস্ট। কতটা ঝুঁকি নিয়ে যে সকলকে কাজ করতে হয়েছিল তা আমরা, যারা সাংবাদিক হিসেবে কাজ করছিলাম তারাই জানি। 'তারা' চ্যানেলের নিউজ বিভাগের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, অভিজ্ঞ সাংবাদিক শ্রী দেবজ্যোতি চক্রবর্তীর সহায়তা ছাড়া আমরা ঐভাবে সরকারবিরোধী অনুষ্ঠানগুলি করতে পারতাম না। তেমনি, সাধারণভাবে, 'তারা' চ্যানেলের কর্তারাও একমত ছিলেন। তবে, দেবজ্যোতির ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বিশিষ্ট। প্রযোজক পার্থ, ক্যামেরা-প্রকৌশলী অনির্বাণ, আমাদের সহায়ক শুভেন্দু ও সুকান্ত—সকলেই তখন বাস্তবে যা যা ঘটছে তার খবর জনগণকে দিতে মরিয়া। প্রাণের মায়াও করছিলেন না কেউ।

অন্য চ্যানেলগুলির মধ্যে 'কলকাতা' টিভির রজত রায়চৌধুরি, অশেষ, ক্যামেরা-প্রকৌশলী দয়াল—এঁরা নিয়েছিলেন দুঃসাহসিক ভূমিকা। জেলার একাধিক ক্যামেরা-প্রকৌশলী ও সংবাদদাতা সে-সময়ে প্রাণ হাতে করে যেসব ঘটনার ছবি তুলেছিলেন, খবর দিয়েছিলেন তা দেখে, শুনে বাংলার সাধারণ মানুষ এমন অনেক কিছু জানতে পেরেছিলেন যা না জানলে পঞ্চায়েত ও লোকসভার ভোটে সি পি আই এম দলের অমন ভরাডুবি হত কিনা সন্দেহ। 'তারা' চ্যানেলের হয়ে জেলা সাংবাদিক ও ভিডিওগ্রাফার ভোলানাথ ও গৌরাঙ্গ যে ছবিগুলি তুলেছিলেন তার জেরে দুজনেই মার খান সি পি আই এমের হাতে। গৌরাঙ্গর একটি কান তো রীতিমতো জখম হয়। তাঁর ক্যামেরাটিও সি পি আই এমের লোকজন ভেঙ্গে দিয়েছিল। শুনেছি, ২০০৮ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আঁকা ছবি বিক্রীর টাকা থেকে জেলার ভিডিওগ্রাফার গৌরাঙ্গকে নতুন ক্যামেরা কেনার টাকা দিয়েছিলেন। তারও আগে, ২০০৭ সালের ১৪ই মার্চ নন্দীগ্রামের সি পি আই এম খুনে বাহিনী ও পুলিশ গণহত্যা চালানোর পর আমরা কেউ কেউ যখন কালীঘাটে মমতার বাড়িতে মিলিত হয়েছি নন্দীগ্রাম যাব বলে, তখন মমতা আমার সঙ্গে কংগ্রেস নেতা প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সির কথা বলিয়ে দেন।

টেলিফোনটা মমতাই করেছিলেন। তিনি তখন ভয়ানক ক্রুদ্ধ। মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন তিনি। কল্ করার পর তিনি আমায় বলেন— প্রিয়দার সঙ্গে তুমিই কথা বলো। সেই প্রথম কথা বলছি কংগ্রেসের এই নেতার সঙ্গে। তাঁকে আমি দুটি অনুরোধ করেছিলাম :

১) নন্দীগ্রামের গণহত্যা থামানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর সাহায্যে বামফ্রন্ট সরকারের ওপর চাপ দিতে। ২) ভোলানাথ ও গৌরাঙ্গ নামে 'তারা' চ্যানেলের যে দুই জেলা-সাংবাদিক ও ভিডিওগ্রাফারকে সি পি আই এম দলের লোকজন ধরে নিয়ে গিয়েছিল বলে আমরা খবর পেয়েছিলাম তাঁদের মুক্তির ব্যাপারে সাহায্য করতে। আমার স্পষ্ট মনে আছে, প্রিয়রঞ্জনবাবু সবিনয়ে বলেছিলেন, 'কবীরসাহেব, আপনার প্রথম অনুরোধটি আমি রাখতে পারবো না, আমায় মার্জনা করবেন। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যাপারটি নিয়ে অবশ্যই দেখছি কী করা যায়।'—প্রথম অনুরোধটি তিনি না রাখায় মমতা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন, যা ছিল ঐ ভয়ঙ্কর মুহূর্তে স্বাভাবিক। আমিও ক্ষেপে উঠেছিলাম। বাইরে মিডিয়ার সামনে বর্ষীয়ান সহসংগ্রামী সুনন্দ সান্যাল যন্ত্রণায়, ক্ষোভে, আক্রোশে ফেটে পড়েছিলেন। হয়ত ঐ রকম এক মুহূর্তেও বাকসংযম বজায় রাখতে তিনি ইংরিজি ভাষায় তাঁর বক্তব্য রাখছিলেন। আমি শুধু এই প্রবীণ সংগ্রামীর আবেগ ও সি পি আই এম বিরোধী পবিত্র আক্রোশ দেখছিলাম না। মন দিয়ে শুনছিলাম তাঁর ইংরিজি উচ্চারণ ও বাক্‌শৈলী। কী চমৎকার উচ্চারণ, কী অনিবার্য তাঁর শব্দচয়ন ও বাক্যগঠন। সি পি আই এমের কবল থেকে ভোলানাথ ও গৌরাঙ্গর মুক্তি অর্জনে প্রিয়রঞ্জনবাবু সত্যিই সাহায্য করেছিলেন। সেইদিনই ছাড়া পেয়েছিলেন দু'জন। গৌরাঙ্গর কানে ছিল বিষম চোট। এরও অনেক পরে গৌরাঙ্গর সঙ্গে যখন আবার দেখা হয় তখনও তিনি জখম হওয়া কানে স্বাভাবিকভাবে শুনতে পাচ্ছিলেন না। একজন সাংবাদিক হিসেবে আমি প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সির কাছেও কৃতজ্ঞ থাকলাম, কৃতজ্ঞ থাকলাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও। ফোনটা আমার হাতে না দিলে, আমায় কথা বলতে না বললে ঐ ভয়ঙ্কর মুহূর্তে 'তারা' চ্যানেলের দুই অপহৃত সাংবাদিক-কর্মীর কথা বলার সুযোগ পেতাম কিনা কে জানে। দুজনেই ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুরের অতি সাধারণ ঘরের ছেলে। না ছিল টাকার জোর, না ছিল বড় জায়গায় যোগাযোগ।

ভরত মণ্ডলের হত্যাকাণ্ডের ভিডিও তুলতে পেরেছিলেন 'কলকাতা' টিভির দয়াল। ২০০৭ সালের সম্ভবত ৫ জানুয়ারি হলদিয়ার সি পি আই এম নেতা লক্ষণ শেঠের জমি অধিগ্রহণ নোটিস জারি। সে এক অদ্ভুত

নোটিস। এস ইউ সি দলের তরুণ নস্করের সঙ্গে তার পর মহিষাদলে একটি সভা করতে গিয়ে স্থানীয় মানুষদের কাছে জানতে পেরেছিলাম যে সেই নোটিসটি একাধিক এমবুলেন্স থেকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এত সন্ত্রস্ত ছিলেন সি পি আই এম দল ও হলদিয়ার প্রায়-মনসবদার লক্ষণ শেঠ জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে।

কৃষিজীবীরা ঐ নোটিস থেকে জানতে পারলেন যে তাঁদের জমি চলে যাবে, তাঁদের ঠাঁই নিতে হবে ব্যারাকে। এইখানেই আন্দোলনের শুরু। কোনও বিশেষ দল নয়, জমিহারা মানুষরা ফুঁসে উঠলেন ক্রুদ্ধ শ্বাপদের মতো। কোনও সংসদীয় দলের নেতা, কোনও সংসদীয় দল সেখানে নেতৃত্বে ছিলেন না। লাঠিসোঁটা, কাস্তে, বঁটি, ঝাঁটা হাতে জমিহারার দল উঠে দাঁড়ালেন। তাঁরা রাস্তা খুঁড়ে দিলেন, কয়েকটি কালভার্ট সুকৌশলে ভেঙ্গে দিলেন যাতে পুলিশ না ঢুকতে পারে। সুকৌশলে : অর্থাৎ সেতু বা কালভার্টগুলো বিদ্রোহীরা ধ্বংস করেননি, একটি দিকের একটি বড় স্ল্যাব তাঁরা ভেঙ্গে দিয়েছিলেন যাতে পুলিশ বা অন্য কারও গাড়ি গ্রামের ভেতরে ঢুকতে না পারে। আবার প্রয়োজনে যাতে ঐ ভাঙ্গা অংশটি মেরামত করে নেওয়া যায়। নন্দীগ্রামের বীর বিদ্রোহীরা ধ্বংস করছিলেন না, তাঁরা শাসক দলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথ, অপশাসন থেকে মুক্তির পথ গড়ছিলেন। 'তারা' চ্যানেলের 'মতামতে'র টীম নিয়ে আমরা যখন নন্দীগ্রাম গেলাম, সোনাচূড়া যাবার পথে একটি কালভার্টের ভাঙ্গা অংশটি আমায় ঐ বয়সে, চোখের ঐ 'পাওয়ার' নিয়ে লাফিয়ে পার হতে হয়েছিল। দীর্ঘদেহী, ক্যামেরা-প্রকৌশলী, আমার সন্তানতুল্য অনির্বাণ সাধু সার্কাস-শিল্পীদের মতো দুই দিকে দুই পা রেখে যাকে বলে ওৎ পেতে ছিলেন—আমার পা ফস্কে গেলে যাতে তিনি আমায় ধরে ফেলতে পারেন। বুড়ো বয়সে ঐ রকম একটি ভাঙা সেতু লাফিয়ে পার হওয়া যে কী ভয়াবহ। আমার দৃষ্টিশক্তি এমনই যে দূরত্ব ভাল ঠাহর করতে পারি না। কী করে যে ঐ জায়গাটি একবার যাওয়ার পথে, একবার ফিরে আসার পথে লাফিয়ে পার হতে পেরেছিলাম কে জানে। তলায় ছিল কাদাভর্তি খাল। পড়লে আর দেখতে হত না।

জানুয়ারির প্রথম দিকেই বিদ্রোহী গ্রামবাসীদের সঙ্গে সি পি আই

এমের লোকদের সংঘর্ষে ৭ জন মারা গেলেন। আমরা সোনাচূড়ায় যাই আর পরে সেখানে গ্রামবাসীদের যে সাক্ষাৎকারগুলি আমরা নিয়েছিলাম, আমার ধারণা আমরা সকলেই তা থেকে শিখেছিলাম অনেক কিছু। আমার মনে আছে, সাক্ষাৎকারের সময়ে আমি সরকারি মতের পক্ষ নিচ্ছিলাম মাঝেমাঝেই, যাতে গ্রামবাসীরা তাঁদের কথাগুলি বলতে পারেন। বছর পঁয়ত্রিশের এক মহিলাকে বলেছিলাম : 'মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন—আপনারা চিরকাল চাষী থাকবেন কেন, আপনাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, আপনারা, আপনাদের ছেলেমেয়েরা অন্যান্য পেশায় যাবেন। তাহলে এতে আপত্তির কী আছে?'

মহিলাটি বললেন: 'দ্যাখো দাদা, আমি অন্য গ্রামের মেয়ে। বিয়ে করে এখানে এসেছি। আমার তিন ছেলেমেয়ে। আমার স্বামী প্রান্তিক চাষী। আমার ঘরে শাশুড়ি আছেন। আমি সকলের জন্য রান্না করি। কাপড় ধুই। ঘর পরিষ্কার করি। ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাই। তারপর মাঠে গিয়ে স্বামীকে সাহায্য করি। আমি ধান রুইতে জানি, কাটতে জানি। আমি ধান সেদ্ধ করতে জানি, শুকোতে দিতে জানি। এত কিছু জানি আমি। আমি প্রশিক্ষিত নই?'

আমি শিখছিলাম।

সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে মেয়েদের সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে আমার মনে হয়েছিল—এঁদের অনেকের ব্যক্তিত্বেই মমতার প্রভাব পড়েছে। আমার ধারণা বামপন্থী মতবাদ ও বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের লড়াই একদিকে যেমন বাংলার গ্রামবাসীদের মনে এক ধরনের সংগ্রামী মানসিকতা আনতে পেরেছে, তেমনি বাংলার এক সাধারণ ঘরের মেয়ে হয়ে মমতার ঐকান্তিক লড়াই, তাঁর বেপরোয়া, নাছোড়বান্দা সি পি আই এম বিরোধিতা ও সংগ্রাম গ্রামবাংলার মেয়েদের মনে আনতে পেরেছে নিজেদের মনের ভাব সুযোগ পেলে নির্ভয়ে প্রকাশ করার সাহস। নানান সাক্ষাৎকার নিতে নিতে আমি বুঝতে পারছিলাম বাংলার গ্রামের মানুষ প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং আত্মনির্ধারণের একটা আলাদা 'ভাষা' খুঁজে পেয়েছেন। শহরের মানুষ, এমনকি অনেক রাজনৈতিক কর্মী, আন্দোলনকারী ও সাংবাদিক যা টের পাচ্ছেন না বা টের পেতে চাইছেন না। আজ, এই বইটি লেখার মুহূর্তে

আমি ভাবতে পারছি— গ্রামবাংলার জনগণকে যদি কেউ বোকা বা অসহায় ভাবেন, 'পিছিয়ে থাকা' ভাবেন তো তিনি মস্ত ভুল করবেন। আমার 'বামজ্বর' গানে আমি লিখেছিলাম সেই ২০০৬ সালে : 'যাক আগে ঐ বড় শরিকটা/উদ্ধত কান কাটা/ঝেঁটিয়ে বিদেয় করুক তাদের/গ্রামবাংলার ঝাঁটা।' ২০০৬ সাল থেকে সি পি আই এম যে বিপুল ধাক্কাগুলো খেল তার মূলে কিন্তু কোনও বিশেষ দল বা নেতৃবৃন্দের ভূমিকা অত বড় নয়, যত বড় 'গ্রামবাংলার ঝাঁটার' ভূমিকা। গ্রামবাংলার মানুষের শাহাদাত বরণ, তাঁদের মান-ইজ্জত সি পি আই এমের খুনে বাহিনীর হাতে লুণ্ঠিত হওয়ার ভূমিকা। **যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে জিতল কে? কবীর সুমন? না। না। জিতলেন তাপসী মালিক, রাজকুমার ভুল, সুপ্রিয়া জানা, শেখ সেলিম, ভরত মণ্ডল, অন্য শহীদরা। জিতলেন সেই 'বীরাঙ্গনারা', সি পি আই এম যাঁদের ধর্ষণ করেছে। জিতলেন গণধর্ষিতা নর্মদা শীট, রাধারাণী আড়ি।**

ভোটে দাঁড়ানোর পর, ভোটের কয়েকদিন আগে সোনারপুরের কৃষিপ্রধান অঞ্চলে প্রচার করে ক্লান্ত হয়ে ফিরছিলাম দুপুরবেলা। দূরে ক্ষেতে এক কৃষক একা কাজ করছিলেন। আমাদের গাড়িটা দেখেই তিনি পড়ি-কি-মরি করে ছুটে এলেন। দুই পায়ের হাঁটু অবধি জলকাদা মাখা। গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মুষ্টিবদ্ধ ডান হাত নিষ্ঠুর-রোদ-ঝলসানো গ্রীষ্মের আকাশের দিকে তুলে তিনি চিৎকার করে উঠলেন : 'সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম।' —কোনও দল বা নেতার নাম তিনি মুখে আনেননি। তাঁর দৃপ্তভঙ্গি, তাঁর মুঠোপাকানো হাত, হাতের কড়কড়ে শিরা উপশিরা, তাঁর ঘাম-জল-কাদা মাখা বলিষ্ঠ শরীর দেখে, তাঁর মুখে এক-চিলতে হাসি দেখে, তাঁর মুখে 'সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম' শুনে আমি ঐ মুহূর্তে বুঝতে পেরেছিলাম—আমার মতো এক প্রার্থীর বিরুদ্ধে সি পি আই এম প্রার্থী সুজন চক্রবর্তী যদি বা জেতেন তাঁর দল সি পি আই এম ইতিমধ্যেই হেরে গিয়েছেন। জিতেছে সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম।

আমার এই বইটি সোনারপুরের সেই কৃষক কখনও পড়বেন কি? তাঁর দরকার নেই এই বই। তাঁর আসলে দরকার একটা ভাল সরকার যে তাঁকে সম্মান করবে, তাঁর পাশে দাঁড়াবে। যদি সেই সরকার না

আসে তাহলে 'গ্রামবাংলার ঝাঁটা' একদিন সবাইকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবে। সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের পর লালগড়ের ঝাঁটা। সেই দুপুরবেলা কয়েক মিনিটের জন্য দেখা আমার শিক্ষক, আমার অন্নদাতা সহনাগরিককে আমি আবার VIBGYOR সালাম জানাচ্ছি।

সোনাচূড়ায় গিয়ে জানতে পেরেছিলাম জেলিংহ্যাম প্রজেক্টের কথা। চাষীদের জমি অধিগ্রহণ করে জেলিংহ্যাম প্রজেক্ট তৈরি হয়েছিল। সরকার কথা দিয়েছিলেন চাকরি পাবে লোকে। কোথায় প্রজেক্ট কোথায় কী। চাকরিই বা কোথায়। চাকরি দেওয়ার নাম করে এক যুবককে একটা কাজ দেওয়া হয়েছিল। কোনওদিন তিনি পয়সা পাননি। কাজও আসলে ছিল না।

সেই সময়ে সোনাচূড়ায় দেখা হয়েছিল কংগ্রেসের সবুজ প্রধানের সঙ্গে। নবীন এই কংগ্রেস-অ্যাকটিভিস্ট অনেকক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন, আমাদের সাহায্য করেছিলেন নানান ভাবে। সেই যুগমুহূর্তে ওখানে তৃণমূলের কোনও উল্লেখযোগ্য সংগঠন আমাদের চোখে পড়েনি। সবুজ আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন স্থানীয় স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে। মনে আছে, দীর্ঘদেহী সেই প্রবীণ মানুষটি আমাদের বলেছিলেন : 'আমার সঙ্গে কথা বলুন। আমি আপনাদের জানাব গত তিরিশ বছরে গ্রামের এক শিক্ষক হিসেবে কী কী অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে।'

তিনি জানিয়েছিলেন নন্দীগ্রামের স্কুলগুলোর শোচনীয় দুর্দশার কথা।

উন্নয়নের ছবি। কৃষি আমাদের ভিত্তি। শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ। আর মানুষ? পরিবেশ? প্রকৃতি?

সেই সময়ে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান ও সি পি এমের রাজ্য-সম্পাদক বিমান বসু দাবি করছিলেন—সোনাচূড়ার একটি বাড়িতে গিয়ে মেধা পাটেকার, যাঁকে সারা পৃথিবী অহিংস শান্তিবাদী বলে চেনে, সশস্ত্র লোকদের সঙ্গে নাকি গোপনে মিটিং করেছেন; একটি স্কুলবাড়িতে নাকি অস্ত্র মজুদ আছে। যে বাড়িতে সেই মিটিংটা নাকি হয়েছিল সেটি এবং সেই স্কুলবাড়িটি আমরা দেখেছিলাম। এক বৃদ্ধা আমাদের ক্যামেরায় বলেছিলেন—'তোমরাই

দ্যাখো কোথায় অস্ত্র।'—অস্ত্র যখন নেই তখন সি পি আই এম চরম আক্রমণ করলে তিনি কিভাবে প্রতিরোধ করবেন? শীর্ণ দুটি হাত বাড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেছিলেন—'এই হাতদুটো দিয়ে বাবা।'

সি পি আই এমের বরেণ্য নেতা বিনয় কোঙার মহাশয় সেই সময়ে প্রকাশ্যে বলেছিলেন—মেধা পাটেকার ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রামের দিকে গেলে তাঁর পার্টির মহিলারা তাঁদের পাছা দেখাবেন। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্টের উপযুক্ত উক্তি ও হুমকি বৈকি। বেচারা কার্ল মার্ক্স। বিনয়বাবু ও তাঁর সতীর্থরা জানেন না, এই পশ্চাদ্দেশের ব্যাপারটি নিয়ে এক সাচ্চা মার্ক্সবাদী ভল্‌ফ্‌ বিয়ারমান (জার্মান কবিয়াল, মহা অস্বস্তিকর ছিলেন বলে পূর্ব জার্মানির কমিউনিস্ট সরকার যাঁর নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়েছিলেন সাতের দশকের মাঝামাঝি) একসময়ে একটি গান লিখেছিলেন। সে-সময়ে পোল্যান্ডের একটি বিরাট শিপ্‌-ইয়ার্ডের শ্রমিকরা লেখ ওয়াওয়েসার নেতৃত্বে আন্দোলন করছিলেন কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে। একবার তাঁরা ভার্জিন মেরির মূর্তির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করেন। দুনিয়ার বামপন্থীরা তার সমালোচনা করেছিলেন : এ কী কাণ্ড: প্রগতিশীল শ্রমিকরা কখনও প্রার্থনা করতে বসে? ভল্‌ফ্‌ বিয়ারমান সেই ঘটনা ও মার্ক্সবাদীদের সমালোচনার সুরে একটি গানে লিখেছিলেন : 'Besser die Jungfrau in der Hand als Marx am Arsch.'—গুহ্যদ্বারে মার্ক্সকে রাখার চেয়ে হাতে ভার্জিন মেরি থাকা ভাল। —মেধা পাটকর ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সি পি আই এম দলের মহিলারা পশ্চাদ্দেশ দেখাবেন— প্রবীণ মার্ক্সবাদী নেতা বিনয় কোঙারের এই উক্তি প্রমাণ করে ভল্‌ফ্‌ বিয়ারমানের গানের ঐ লাইনটি কতটা যথার্থ।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কৃষিজমিরক্ষা কমিটির প্রতিনিধি হিসেবে নন্দীগ্রামে জনসভা করতে যাওয়ার অল্প কিছুদিন আগে আমি সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরি ও তাঁর জোট-সতীর্থদের সঙ্গে নন্দীগ্রামে একটি জনসভায় গিয়েছিলাম। সন্তোষ রাণার সঙ্গে সেই প্রথম আমার দেখা ও পরিচয়। তেমনি তাঁর দলের এক উজ্জ্বল সংগঠক সুমিত সিনহার সঙ্গেও। সুমিতের সঙ্গে আমার বন্ধুতা ক্রমে প্রসারিত হয়ে ওঠে। নন্দীগ্রাম গণহত্যার আগে, সেই সময়ে এবং তার পরে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি যখন আবার

নন্দীগ্রামের অনেকটা এলাকা দখল করে নিলেন, এই সুমিতই আমায় সমানে খবর দিয়ে গিয়েছেন নন্দীগ্রাম থেকে। সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরির সঙ্গে নন্দীগ্রামে গিয়ে দেখেছিলাম সুমিত তার আগে দীর্ঘ সময় গ্রামবাসীদের সঙ্গে থেকে তাঁদের কতটা আপন হয়ে উঠেছেন। দূর দূর গ্রাম ও পল্লী থেকে যাঁরা জনসভায় যোগ দিতে আসলেন, সুমিত দেখলাম তাঁদের প্রায় সকলকেই চেনেন। সারি দিয়ে গ্রামের মেয়েরা আসছিলেন; প্রায় সকলেই মুসলমান। এই গ্রামবাসীরাই অভ্যুত্থান করেছেন। তাঁদের মুখের হাসি থেকে টের পাচ্ছিলাম তাঁরাও সুমিতকে বিলক্ষণ চেনেন, বিশ্বাস করেন। ছোট ছেলেমেয়েরাও চলেছে মিছিলে। কোনও কোনও ছোট ছেলের মাথায় ছোট টুপি, গায়ে রঙিন পাঞ্জাবি, সাদা পায়জামা। আমি জিজ্ঞেস করছি : যাচ্ছ কোথায়? —তারা ডান হাতের মুঠি পাকিয়ে আকাশের দিকে তুলে বলছে—'কৃষি!'

আমার মনে পড়ছে ১৯৮৫ সালের নিকারাগুয়ার কথা। মানাগুয়ার রাস্তায় এক কিশোর চাকা চালিয়ে খেলছে। তাকে জিজ্ঞেস করছি : 'তোমার দেশে বিপ্লব হয়েছে, জানো তো।'

মাথা এক পাশে হেলিয়ে সে বলল— 'হ্যাঁ।'

আমি জানতে চাইছি : ' বিপ্লব কী?'

কিশোরটি ভুরু কুঁচকে ভাবছে। তারপর বলছে : "Soy la revolucion" 'আমিই বিপ্লব।'

তার একুশ বছর পর নন্দীগ্রাম অভ্যুত্থানের আওতায় নন্দীগ্রামের ছোট্ট ছোট্ট ছেলে মুঠো-পাকানো ডান হাত আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলছে : কৃষি!

উল্লেখযোগ্য হল, কলকাতা থেকে যাওয়ার পথে সুমিত আমার সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে কোনও কথাই বলছিলেন না। আমরা আলোচনা করছিলাম গানবাজনা নিয়ে। আমার মনে আছে, নন্দীগ্রামে ঢোকার সময়ে আমরা দু'জনে ও পি নাইয়ারের সুর-দেওয়া অবিস্মরণীয় গান 'দিওয়ানা হুয়া বাদল' গাইছিলাম আর হায় হায় করছিলাম গানটির জন্য। র‍্যাডিকাল জার্মান ছাত্রনেতা রুডি ডুচকে সম্পর্কে ভল্‌ফ বিয়ারমান একটি কবিতায় লিখেছিলেন : 'কোমল ছিলেন তিনি, কোমল/সব সাচ্চা বিপ্লবীর

মতো।'—সুমিতের মধ্যে, এমনকি সি পি আই এমের আক্রমণে চরম ক্ষয়ক্ষতি, আবার তার পর হাজার হাজার মানুষের মিছিল সংগঠিত করে হারানো জমি ফের দখল করে নেওয়ার লড়াই-এর মুহূর্তেও আমি বারবার দেখেছি এক কোমলস্বভাব মানুষকে।

২০০৭-এর গণহত্যার ঠিক আগে এই সুমিত সিনহাই আমাকে নন্দীগ্রাম থেকে ফোন করে করে জানাতেন, 'কমরেড, গতিক সুবিধের নয়, তুমি এখানকার কাউকে একটু বলো তৃণমূলের পতাকা নিয়ে রাস্তায় মার্চ করতে। অনেক লোক যেন মার্চ করে।'—এই হল সত্যিকার লড়াকু মানুষের চিন্তা ও রণকৌশল। সুমিত তৃণমূলের কেউ নন। কিন্তু তিনি তৃণমূলের নিশান নিয়ে অনেক মানুষের রুট মার্চের প্রয়োজনীয়তার কথা বলছেন—সি পি আই এম যাতে বুঝে নেয় তাদের শত্রুরা তৈরি। সুমিতের কথা আমি নন্দীগ্রামে পৌঁছে দিয়েছিলাম তখনই। তৃণমূলের পতাকা হাতে নন্দীগ্রামের রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করেছিলেন অনেক গ্রামবাসী।

এই সুমিতই একাধিক রাতে আক্রান্ত নন্দীগ্রামে তাঁর গোপন ডেরা থেকে ফোন করে করে গানের কথা বলতেন। মনে আছে এক রাতে তিনি আমায় বললেন, 'কমরেড, এইমাত্র রেডিয়োয় তোমার গাওয়া ''যত দূরে যাবে বন্ধু'' গানটা হচ্ছিল। মনে হল এখনই তোমায় ফোন করি, তোমার গলাটা একবার শুনি।'—আমার বন্ধু, আমার সহযোদ্ধা, আমার সহ-গান পাগল, আমার কমরেড সুমিত, তোমাকে সালাম। রাজনৈতিক মতবাদ আর বুঝি না তেমন কমরেড। বুঝি এখন সুরেলা মন-ওলা কয়েকজন মানুষকে। সংখ্যায় বড্ড কম। মহামতি লেনিনের শেষদিকের একটি লেখার কথা মনে হয় খালি : "Better Few, But Better." সুমিত, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, সেই রাতে তুমি যখন ফোন করছিলে, গুলি চলছিল। বিশ্বমানবতার শত্রুরা সমানে আক্রমণ করে যাচ্ছিল গ্রামবাসীদের ওপর। তারই মধ্যে তুমি রেডিয়োয় আমার গান শুনে চুপিচুপি গুনগুন করছিলে : 'যত দূরে দূরে দূরে যাবে বন্ধু/একই যন্ত্রণা পাবে...'

সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরির একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল নন্দীগ্রাম অভ্যুত্থানে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাওয়ার আগে সিদ্দিকুল্লাহ সেখানে যান। তাঁর সঙ্গে ও

সন্তোষ রাণার সঙ্গে নন্দীগ্রাম গিয়ে আমরা একটি এতিমখানায় বসেছিলাম। খাওয়া-দাওয়াও হয়েছিল সেখানে। আমি ছাড়া আর যাঁরা সেখানে ছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই রাজনীতিক বা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। আমার মনে আছে সিদ্দিকুল্লাহ সাহেবের এক সঙ্গী মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর কন্যা সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলায় আমি বলেছিলাম—'মেয়েদের সম্পর্কে অশালীন কথা বলা চলবে না। এরকম হলে আমি থাকব না।' আজকাল এত ভুলে যাই—উপস্থিত এক প্রবীণ ভদ্রলোকও রেগে গিয়েছিলেন ঐসব অশালীন কথায়। আমি লজ্জিত, তাঁর নাম আমি ভুলে গিয়েছি। সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরি সাহেবের মুখে কিন্তু কোনও মহিলা সম্পর্কে কোনও খারাপ কথা শুনিনি।

সেই উটকো ব্যক্তিটিই পরে আমার কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে একটি বাজে কথা বলার পর থেকে আমি আর ঐ লোকগুলোর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখিনি। সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরির সঙ্গেও আমার আর কোনও যোগ থাকেনি। সেটা কিন্তু পরের কথা। নন্দীগ্রামের অভ্যুত্থান যে কোন্ মাপের, তার সম্যক পরিচয় প্রথম পেয়েছিলাম সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরির জনসভাতেই। সেই সভার মঞ্চে নকশালপন্থীরাও ছিলেন, আবার কংগ্রেসেরও অন্তত একজন ছিলেন। তৃণমূল কংগ্রেসের শুভেন্দু অধিকারীকে আমি ঐ সভাতেই প্রথম দেখি। অন্যদের সঙ্গে আমিও বক্তব্য রেখেছিলাম। প্রবল ভাষণ দিয়েছিলেন সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরি। তিনি ভাল বক্তা। এক নকশালপন্থী বক্তব্য রাখতে গিয়ে কংগ্রেস সম্পর্কে তির্যক উক্তি করায় কংগ্রেসের প্রতিনিধি রুষ্ট হন। ঐ সভা থেকে ফেরার পথে আলাপ হয় তৃণমূল কংগ্রেসের অ্যাকটিভিস্ট আবু তাহেরের সঙ্গে। তিনি আমায় সেদিনই জিজ্ঞেস করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমি নন্দীগ্রামে আসব কিনা। মমতার সঙ্গে নন্দীগ্রাম যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম আরও পরে।

পাঁচ

জনসভা আমায় ফ্যাসাদে ফেলে। আমি রাজনীতিক নই, বক্তা নই। মহা মুশকিল। জনসভা করে, মঞ্চে বসে যাঁরা অভ্যস্ত, তাঁরা কী সুন্দর চুপচাপ বসে থাকেন, সোজা হয়ে, গম্ভীর হয়ে। রাজনীতির মঞ্চে থাকলে আক্রমণ কেমন হওয়া উচিত তাঁরা বিলক্ষণ জানেন। তাঁরা এটারই লোক। গেরো হল আমি এর লোকই নই। রাজ্যের লোকের সামনে উঁচু কোন জায়গায় গম্ভীর হয়ে বসে থাকতে আমার অস্বস্তি হয়। সত্যি বলতে কী পরিস্থিতি যেমনই হোক, মাঝে মাঝে আমার হাসিও পায়। ফলে হাসি চাপতে হয়। বেশিরভাগ বক্তার বক্তব্যই একই ধাঁচের, বিষয়ও হয় একই। ফলে একঘেয়ে লাগে আমার। আমার আবার সিগারেটের নেশা। সিগারেটের ব্যাপারে আমি এখনও অনাপোসী। কিন্তু জনসভার মঞ্চে আমায় আপোস করতেই হয়। একঘেয়ে লাগে, অথচ সিগারেট খেতে পারি না। ফলে অস্বস্তি আরও বাড়ে। মঞ্চ থেকে সামনের মানুষকে কেমন যেন লাগে। আমার দেশের সাধারণ মানুষ এঁরা। যুগ যুগ ধরে মোটের ওপর একই থেকে গেলেন। জনসভায় নেতারা এবং আমার মতো লোকরা যে আসেন তাঁদের বাহনগুলো কিন্তু পাল্টে গিয়েছে। এখন নতুন নতুন গাড়ি। আমাদের হাতে মোবাইল ফোন। গ্রামেও কারও কারও মোবাইল ফোন আছে। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ পড়ে আছেন কোথায়! সলিল চৌধুরির একটি গানে ছেলেবেলা থেকে শুনেছি 'আমাদের দেশের প্রতি হাতে হাতে কাজের ক্ষুধা।'—মঞ্চ থেকে যাঁদের দেখেছি তাঁদের হাতগুলো লক্ষ্য করেছি। লক্ষ্য করেছি মুখগুলো। তাঁদের বসার ধরন। এঁরাই তো আমার অন্নদাতা। অথচ দুই পক্ষের মধ্যে কত বিপুল দূরত্ব। মঞ্চে বসে বসে জনসমুদ্রের দিকে

তাকিয়ে আকাশপাতাল ভেবেছি। কী বলছি আমরা? কী শুনছেন ওঁরা? আমরা কি সবাই সঠিক কথাটা বলছি? আমরা কি ওঁদের সামনে এত উঁচুতে বসার যোগ্য? সকলের কথা বাদ দিলাম (সকলের কথা ভাবার অধিকার কি আমার আছে?), আমার কি সেই যোগ্যতা আছে? কী করেছি আমি জীবনে এই মানুষগুলির জন্য? ক'বার ভেবেছি এঁদের কথা?

এস ইউ সি আই-এর তরুণ নস্কর যখন আমায় প্রথম মহিষাদলে নিয়ে গেলেন (মহাশ্বেতা দেবীর যাওয়ার কথা ছিল, তিনি পারলেন না, তিনি অসুস্থ। তিনি আমায় আদেশ দিলেন মহিষাদল যাওয়ার), গ্রামের এক গণ-সংগঠক যখন আমায় প্রথম হলদিয়ার মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট শাহেনশাহ লক্ষ্মণ শেঠের বিলি করা একটি জমি-অধিগ্রহণ-বিজ্ঞপ্তি পড়ালেন (সে-কী দারুণ ইন্টারেস্টিং! গ্রামের লোকজন জমিজমা বাম সরকারের হাতে তুলে দিয়ে ব্যারাকে চলে যাবে/ব্যারাকে/যাদের ঘর ছিল, জমি ছিল, কাজ ছিল, মাঠ ছিল, আকাশ ছিল, তারা সদলবলে চলে যাবে ব্যারাকে/লক্ষ্মণবাবু কিন্তু সস্ত্রীক, স-পারিষদ, স-কার্ল-মার্ক্সের ভূত, স-জনগণতান্ত্রিক-বিপ্লব-চিন্তা, স-শ্রেণীসংগ্রাম, স-বাকি সব সুযোগসুবিধে নিয়ে থেকে যাবেন তাঁর নিজের বাড়িতে বা পার্টি কমিউনে)। এক ভদ্রলোক মহিষাদলের কৃষকদের চাষ-আবাদ, বিশেষ করে শাঁখআলু চাষের কথা বলেন। টের পেলাম কী পরিমাণ অজ্ঞ আমি। মহিষাদল! নামটাই যা জানি। তার বেশি কিছু? —জনসভায় (জেনেছিলাম ওটি আয়োজন করেছিলেন এস ইউ সি আই ও তৃণমূল একসঙ্গে মিলে) তরুণ নস্কর ভাষণ দিলেন 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল' ও জমি অধিগ্রহণ নিয়ে, 'কেমিক্যাল হাব' নিয়ে। আরও কেউ কেউ ভাষণ দিলেন। মঞ্চে একটা হারমোনিয়াম ছিল। সেটি বাজিয়ে আমি সলিল চৌধুরির 'হেঁই সামালো ধান' গাইছিলাম। সাধারণ গ্রামবাসীরা শুনছিলেন চুপটি করে। বেশিরভাগই ছিলেন গাঁয়ের মেয়ে। রোদ্দুর মাথায় করে কত দূর থেকে আসছিলেন তাঁরা মিছিল করে। এই গান যাঁরা এক সময়ে গেয়ে বেড়িয়েছেন সর্বত্র, আজ তাঁদের গ্রাস থেকেই ধান সামলানোর মুহূর্ত। তাঁরা কারা? ভারতের মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি! তাঁদের ফ্রন্ট-সহযোগীরা! তাঁদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আজ বাংলার গ্রামের কৃষিজীবীদের জন্য তাঁদেরই গাওয়া বহুচর্চিত গান 'হেঁই সামালো ধান হো, কাস্তেটা দাও শান হো, জান-কবুল

আর মান-কবুল, আর দেব না আর দেব না রক্তে বোনা ধান মোদের প্রাণ হো।' গাইতে গাইতে ভাবছিলাম—সলিল চৌধুরির এই গানগুলি ভারতের মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ও তাঁদের ফ্রন্ট-সহযোগীরা আর গাইতে পারবেন না। সেই অধিকার তাঁরা খুইয়ে বসে আছেন তাঁদেরই ভুল নীতি ও পদক্ষেপগুলোর জন্য। গানের ফাঁকে ফাঁকে এইসব কথা বলছিলাম জনতাকে। ঐ সভায় আমার অতটা অস্বস্তি হচ্ছিল না, তার কারণ বোধহয় এই যে হারমোনিয়াম বাজিয়ে আমি কয়েকটা উপযুক্ত গান গাইতে পারছিলাম। হারমোনিয়াটা না থাকলে অতজন মানুষকে ধরে রাখতে পারতাম না অতক্ষণ। কয়েক হাজার সাধারণ গ্রামবাসী চুপ করে বসে শুনছিলেন। গাইতে গাইতে দেখছিলাম এক চানাচুরওলা পসরা নিয়ে ঢুকে পড়েছেন শ্রোতাদের সারিতে। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা তাঁকে সরিয়ে দিচ্ছেন, তবে চেঁচামেচি না করে। বেচারি চানাচুরওলার দর্শকদের মাঝে ঘুরে ঘুরে মাল বেচা হল না। অথচ, এমনি কোনও বিনোদন অনুষ্ঠান হলে দর্শক শ্রোতারা এই ধরনের ফেরিওয়ালার কাছ থেকে এটা ওটা কিনে কিনে খেতেই থাকেন দিব্যি। মহিষাদলের এই জনসভায় কিন্তু ঘটল ব্যতিক্রম। কারণ 'জান-কবুল আর মান-কবুল' রক্তে বোনা ধান যেতে বসেছে। কেড়ে নিচ্ছে কারা? এককালে 'ফসলের গান' গেয়েছিল যারা সাম্যের ধ্বজা ধরে। আজও যারা তাদের ব্যানারে, পোস্টারে সমাজতন্ত্রের কথা বলে, কপচে যায় কৃষকদের স্বার্থের কথা। বেচারা কার্ল মার্ক্স। বেচারা লেনিন। বেচারা সি পি আই এম। তাঁরা বুঝতে চাইছেন না গ্রামের অসংখ্য মানুষ তাঁদের ঐ চানাচুরওলার মতোই বের করে দিতে চাইছেন। উপমাটা যেন চানাচুরওলার বিরুদ্ধে না যায়। বিফল-মনোরথ হয়ে তিনি দর্শকদের এক পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান আর বক্তাদের বক্তব্য শুনে গেলেন তারপর। তিনি দীর্ঘজীবী হোন। তাঁর ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি হোক।

মহিষাদলের ঐ সভাতেই প্রথম দেখেছিলাম গ্রামের দু'জন কবিয়াল সি পি আই এম বিরোধী গণ-আন্দোলনের ওপর গান বেঁধে গাইছেন। একজন আবার তাঁর গানটি ডিটিপি ও ফটোকপি করে সমবেত লোকদের মধ্যে বিতরণ করছেন। সব ব্যাপারে এগিয়ে থাকা কলকাতার ক'জন নাম-করা, রেকর্ড-বের-করা, জলসা-কাঁপানো গায়ক গায়িকা তখন তার

পরেও গণ-আন্দোলনের ওপর বাঁধা কটি গান গেয়েছেন? কটি নাটকের বিষয় হয়ে উঠেছে এই আন্দোলন? নতুন ছবি তো তৈরি হয়েছে তারপর। কটির বিষয় কৃষিজমি থেকে গায়ের জোরে উচ্ছেদ, কৃষিজমি রক্ষার আন্দোলন? একজন পরিচালকের কথা বলতে পারি, পান্না হোসেন। যিনি তাঁর 'ডায়েট' ছবিটিতে কৃষক-উচ্ছেদ, জমি কেড়ে নেওয়ার জন্য গ্রামবাসীদের ওপর সশস্ত্র বাহিনীর আক্রমণকে বিষয় হিসেবে রেখেছিলেন। কমার্শিয়াল ছায়াছবি। আমি এটির কথা জানতে পাই কারণ পান্না আমাকে দিয়ে এই ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করিয়েছিলেন, ছবির গানগুলি লিখিয়েছিলেন, সুর করিয়েছিলেন। ছবিটিই মুক্তি পেয়েছিল ২০০৯ সালে। খুব বেশি লোক দেখেনি বোধহয়। ১৯৯৬/৯৭ সালে 'সেদিন চৈত্রমাস'-এর পর আবার ছবির কাজ পেয়েছিলাম। ১১ বছর পর। কিন্তু দেশে তো এত গল্পকার, পরিচালক আছেন। কেউ কেউ 'এলিট।' এত বড়, এত তীব্র একটা গণ-আন্দোলন নিয়ে কেউ একটি ছবিও কি করতে পারতেন না?

ছয়

২০০৬-এর শেষদিক থেকেই নন্দীগ্রাম উত্তাল। কিছুদিনের জন্য প্রশাসন বলতে সেখানে প্রায় কিছুই ছিল না। মাঝেমাঝে মনে হচ্ছিল গ্রামবাসীদের এই অভ্যুত্থান কী ক্রমশ ছড়িয়ে পড়বে? আমরা কি মুক্তির কোনও নতুন দশকে এসে পড়ছি? স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলাম—আমার মতো মধ্যবিত্ত বাঙালিদের মধ্যে কেউ কেউ যে স্বপ্ন এখনও দেখে থাকে। রাজনৈতিক মেধা বা দূরদৃষ্টি আমার নেই। আমি রাজনীতির লোকই নই। আমি নিতান্তই সঙ্গীতকার, গান-কারিগর। অনেক দিন পর আমি লিখছিলাম গানের পর গান। আর ওদিকে নন্দীগ্রামে সি পি আই এম প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছিল হারানো জমি ফিরে পেতে। আক্রমণের ঘটা ও বহর বেড়েই যাচ্ছিল। নন্দীগ্রামে ভূমি-উচ্ছেদ-প্রতিরোধ কমিটির হাত থেকে সোনাচূড়া চলে গেল, আবার ফিরেও এল, কারণ ভূমি-উচ্ছেদ-প্রতিরোধ কমিটি ততদিনে নন্দীগ্রামে বড় মাপের প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে। কিন্তু তার আগেই সি পি আই এম বিরোধী গ্রামবাসীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন হতাহত হয়েছেন। সোনাচূড়ায় বিদ্রোহীদের দখল ফের কায়েম হওয়ার খবর পেয়ে আমি মমতাকে এস এম এস করলাম। আমার মনে তখন খুব উৎসাহ। মমতা আমায় টেক্সট করলেন : 'তোমার বুঝি আনন্দ হচ্ছে?'

আমি : নিশ্চয়ই। তোমার?

মমতা : না। কবীরদা, যারা চলে গেছে তারা যে আর ফিরবে না!

সোনাচূড়া থেকে সি পি আই এম বাহিনীর অপসারণের সময় থেকেই কিন্তু এই আশঙ্কা জোরালো হয়ে উঠল যে এবারে সি পি আই এম ও

পুলিশ বিরোধী গ্রামবাসীদের ওপর বড় ধরনের আক্রমণ অভিযান শুরু করবে। আমি লক্ষ্য করছিলাম যে সেই সময়ে যাঁরা কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় মিটিং মিছিল করছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই এই সম্ভাবনাটা নিয়ে তেমন ভাবছিলেন না। লড়াইটা যে সামরিক পর্যায়ে চলে গিয়েছে এই বোধ তখনও অনেকের মনে আসেনি। বেশিরভাগ আন্দোলনকারী তখনও গণতান্ত্রিক লড়াই-এর পথে চলছিলেন। তার ফাঁকে ফাঁকে চলছিল এ-দল ও-দলের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা। আমার মনে হচ্ছিল কিছু একটা করে দিল্লির সরকারের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওপর চাপ দেওয়া দরকার। এ-ব্যাপারে মমতার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে বিশেষ সদুত্তর পাইনি। আমার ধারণা, তার কারণ মমতা আমার সঙ্গে নিপাট রাজনৈতিক বিষয়ে কোনও কথা বলতেন না। কেন বলবেন? আমি তো রাজনীতির লোক নই।

২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষদিকে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চের একটা সভা হল। সেই সভায় এস ইউ সি দলের কেউ কেউ তো ছিলেন, যেমন তরুণ নস্কর, আর ছিলেন মহাশ্বেতা দেবী, বিভাস চক্রবর্তী, তরুণ সান্যাল, সুনন্দ সান্যাল, শাঁওলী মিত্র, অর্পিতা ঘোষ সমেত অনেক সি পি আই এম বিরোধী নাগরিক। সভার আলোচনায় প্রাধান্য পাচ্ছিল বাম-ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার দিকটা। আলোচনার ধরন থেকে আমার মনে হচ্ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটা চাপা স্রোত রয়েছে। সি পি আই এমের বিরোধিতা, কিন্তু তাই বলে অ-বামপন্থীদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নয়।

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সভায় আমায় এই সময়ে গান গাইতে বলা হয়েছিল।

আমি বলেছিলাম : 'এখন গ-এ আকার দন্ত ন 'গান'এর চেয়ে জি ইউ এন gun বেশি জরুরি, কারণ নন্দীগ্রামে সি পি আই এম বড় আকারের সশস্ত্র আক্রমণ করতে চলেছে।' আমি এও বলেছিলাম যে কে বাম আর কে বাম নয় ওসব ভাবার সময় এখন নয়। এখন দরকার প্রতিরোধ, দরকার হলে সামরিক প্রতিরোধ। সি পি আই এম-এর আক্রমণ রুখে দিতে হবে। বলেছিলাম : 'ওরা যদি আমাদের এক জনকে নেয়, আমরা ওদের আট

জনকে নেব।' মনে আছে, পরের দিন একাধিক দৈনিক পত্রিকায় আমার উদ্ধৃতি বেরিয়েছিল। এও মনে আছে, এর কয়েকদিন পর শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে ফোনে কথা হয় এবং তিনি সোৎসাহে বলেন—আমাদেরও ওটাই কথা।

নন্দীগ্রামে সি পি আই এমের ব্যাপক সশস্ত্র হামলা আসন্ন, তাই এখন দরকার দিল্লি সরকারকে ধরে বামফ্রন্ট সরকারের ওপর চাপ দেওয়া যাতে গণহত্যা না হয়—এই কথাও সেই সভায় বলেছিলাম।

২০০৭ সালের মার্চ মাসে নন্দীগ্রামের জনগণের ওপর সি পি আই এমের আক্রমণ ক্রমশ তুঙ্গে। ১২/১৩ই মার্চ সুমিত সিনহার সঙ্গে টেলিফোনে কথা। আমার মনে ভয়। সুমিত ভয়হারা। সারাক্ষণই নানান আশঙ্কায় ছটফট করছি আমি। থেকে থেকেই মমতার সঙ্গে এস এম এস বিনিময়। শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গেও কয়েকবার কথা। শুভেন্দু জানাচ্ছেন প্রতিরোধ হবে। মাদ্রাসার বিরাট ভূমিকা। সুমিত কিন্তু একটু নিরাসক্ত গলায় বলছেন—ঠেকানো যাবে না। ওরা ঢুকে পড়বেই। ক্ষয়ক্ষতি হবে।

আমি জানতে চাইছি, 'তোমার কী হবে।'

আবেগহীন গলায় আশ্বস্ত করছেন আমাকে সুমিত।

অসীমের কাছে শুনেছি শুভেন্দুর সঙ্গে ওর যোগাযোগ রয়েছে। আমার আবার শুভেন্দুর সঙ্গে অত ঘনিষ্ঠতা হয়নি, যতটা হয়েছে শিশিরদার (শিশির অধিকারী) সঙ্গে। শিশিরদার সঙ্গে দু'একবার কথা। অক্ষুণ্ণ মনোবল। আবদুল সামাদের ফোন এল। নন্দীগ্রামের মানুষ তৈরি। সাংবাদিক অরূপ কালী (তখন দৈনিক বাংলা স্টেটসম্যানে) জানাচ্ছেন সুকুমার মিত্র নন্দীগ্রামে আছেন। Embedded journalist. নন্দীগ্রামের খবর দেওয়ায় সুকুমার মিত্র যে ভূমিকা নিয়েছেন, যেভাবে ঝুঁকি নিয়েছেন, সাংবাদিকতার যে নজির রেখেছেন, সে-জন্য ঘরে ঘরে তাঁর ছবি রাখা উচিত বলে আমি মনে করি।

১৩ই মার্চের রাত। একটি বিশেষ কারণে আমরা কেউ কেউ জেগে আছি কলকাতায়। নন্দীগ্রাম থেকে আমি কোনও খবর পেলে তা জানিয়ে দিচ্ছি মমতাকে এস এম এসে। একটা খবর এলো—সি পি আই এম এর

খুনে বাহিনী আর পুলিশের আক্রমণ ঠ্যাকাতে ব্যারিকেড করে থাকবেন প্রথমে মাদ্রাসার ছাত্ররা, তারপর গ্রামের মহিলারা। প্রতিরোধের এই ব্যবস্থা যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের ধারণা আক্রমণকারীরা সামনে বাচ্চাদের আর মেয়েদের দেখলে অস্ত্র ব্যবহার করবে না, কাউকে আঘাত করবে না। খবরটা পেয়ে কী ভাবব, কী বলব বুঝতে পারছি না। ভূমি-উচ্ছেদ-বিরোধী প্রতিরোধ সংগঠকরা ধরে নিয়েছেন সি পি আই এমের ঘাতকদল ও পুলিশের মনে এখনও স্বাভাবিক মায়া দয়া আছে। আমার তা মনে হচ্ছে না, কিন্তু কাউকে তা বলতে পারছি না। সুমিতের কথাগুলো কানে বাজছে—ওদের ঠ্যাকানো যাবে না, ক্ষয়ক্ষতি হবে।—ব্যারিকেডের খবরটা মমতাও তাঁর সূত্রে পেয়েছেন, কিন্তু তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করতে চাইছেন না। করে কোনও লাভও নেই। নন্দীগ্রামের প্রতিরোধযোদ্ধারা স্বাধীনভাবেই কাজ করছেন। যতদূর জেনেছি মমতা তাঁদের পরিচালনা করছেন না। নন্দীগ্রামে ভূমি-উচ্ছেদের বিরুদ্ধে যে অভ্যুত্থান হয়েছিল তা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। তার সংগঠকরা নন্দীগ্রামেই ছিলেন। কেউ কেউ সেখানে গিয়ে ঘাঁটি গেড়ে ছিলেন। শহরের কোনও রাজনৈতিক দলের নেতা সেখানে নেতৃত্ব দেন নি। কলকাতা থেকে অনেকে সংহতিতে আছেন, নেতৃত্বে নেই। —ফোন ট্যাপ্‌ড্ হতে পারে বলে মমতা আমায় বলে দিয়েছেন এস এম এস করতে। মমতাও আমায় খবর দিয়ে যাচ্ছেন। রাত আড়াইটের পর মমতা আমায় টেক্সট করছেন : 'অনেক রাত হল। তোমার বয়স হয়েছে, আর জেগে থেকো না, এবারে ঘুমোতে যাও। আমি জেগে থাকব। কাল সকাল সাতটা থেকে আমি ঘুমিয়ে নেব, তুমি জেগে থাকবে। খেয়াল রাখবে।'

১৪ই মার্চ সকালে আমি মমতার বাড়ি। নন্দীগ্রামের ওপর সি পি আই এম-এর খুনে-বাহিনীর আক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছে। অস্ত্রহীন, অসহায় গ্রামবাসীদের ওপর তারা এলোপাথাড়ি গুলি চালাচ্ছে। মমতার বাড়িতে এসেছেন আরও অনেকে। আমরা নন্দীগ্রাম যাব। নন্দীগ্রামে গণহত্যা করছে সি পি আই এম। চারদিক থেকে ফোন আসছে। ফোন যাচ্ছেও চারদিকে। মুকুল, মদন, শোভন, দোলা, পূর্ণেন্দু, অনুরাধাদি (পুততুণ্ড) সবাই হাজির। এসে পড়েছেন সুনন্দ সান্যাল। মিডিয়া করছেন মমতা। সুনন্দ সান্যাল

অসামান্য বক্তব্য রাখছেন। মমতা যে ক্রুদ্ধ তা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। গভীর কষ্টও যে তিনি পাচ্ছেন তা তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। যন্ত্রণায় রাগে ছটফট করছেন তিনি। অন্য তৃণমূল নেতাদের মুখ থমথমে। একটি কথাও বলছেন না কেউ। চাপা উৎকণ্ঠা, উত্তেজনা চারদিকে। মমতা নন্দীগ্রাম যাবেন মানে বেশ কিছু চ্যানেলের ক্যামেরা-প্রকৌশলী ও সাংবাদিক এবং পত্রিকার রিপোর্টারও যাবেন। বেরনোর ঠিক আগে মমতা প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সিকে ফোন করে আমায় বলছেন কথা বলতে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওপর দিল্লি থেকে চাপ দিয়ে নন্দীগ্রামে সি পি আই এম বাহিনীর ও পুলিশের আক্রমণ বন্ধ করার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু 'তারা' চ্যানেলের দুই অপহৃত জেলা-সাংবাদিকের মুক্তি আদায় করা সম্ভব।

মেচেদার দিকে যাওয়ার পথে মমতা সমানে চেষ্টা করছেন দিল্লির ডাকসাইটে রাজনীতিকদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে। এল কে আডবানির সঙ্গেও কথা বলছেন। কেউই কিছু করতে পারছেন না নন্দীগ্রামে সি পি আই এমের আক্রমণ বন্ধ করার ব্যাপারে। আমি খেয়াল করছি কংগ্রেসের কেউ গা করছেন না। প্রধানমন্ত্রী? কোথায় তিনি? তিনি তো জানেন এখানে কী ঘটছে। তিনি কি একবার বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে একটা ফোন করে নন্দীগ্রামের এই গণহত্যা, গণধর্ষণ, গণনিগ্রহ বন্ধ করতে বলতে পারছেন না? তাহলে কি সকলেই চাইছেন এই রাজ্যে এই কাণ্ডটাই চলুক।

মেচেদায় সি পি আই এম আমাদের কনভয় আটকে দিচ্ছে। মমতার গাড়ি সবার আগে। আমি মমতার ঠিক পেছনেই বসে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কী কুৎসিত কাণ্ড সি পি আই এমের লোকজন করছে মমতাকে দেখে। আমার পাশে দোলা, অনুরাধাদি, মুকুল। পেছনে শোভন। আমরা ঠেসাঠেসি করেই বসেছি। মমতা ভয়ানক ক্রুদ্ধ। রাগে গরগর করছেন। অন্য সকলে চুপ। রাগের চেয়েও ঘেন্না করছে বেশি আমার। এই দলটা এত কাল শাসন করেছে এই রাজ্য। কী উৎকট অঙ্গভঙ্গি যে করছে সি পি আই এমের লোকগুলো। অল্পবয়সী ছেলেরাও আছে, জওয়ান যুবকরাও আছে, আবার আধবুড়ো লোকও আছে। এমনকি মহিলারাও আছেন। এত কদাকার কথা যে লোকে সমস্বরে বলতে পারে একজন মহিলাকে লক্ষ্য করে, এমন

ক্লীবের মতো অঙ্গভঙ্গি যে কেউ মহাসড়কের ওপর, প্রকাশ্য দিবালোকে করতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

যে সাংবাদিকরা আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন তাঁদের কেউ কেউ কথা বলে যাচ্ছেন আমার সঙ্গে। অরূপ কালী এসে উৎকণ্ঠিত গলায় জানাচ্ছেন, অনেকক্ষণ হয়ে গেল সুকুমার মিত্রর কোনও খোঁজ নেই। এরকম খবরও আছে যে একটি বিশেষ চ্যানেলের একজন সাংবাদিক বা ক্যামেরাম্যান ঘাতকদের দেখিয়ে দেবে কে সুকুমার মিত্র।

অনেকক্ষণ আমাদের আটকে রাখার পর সি পি আই এম ব্রিগেড হঠাৎ কী মনে করে পথ ছেড়ে দিল। অর্থাৎ ওরাই ঠিক করবে কতক্ষণ আমরা আটক থাকব, আবার ওরাই ঠিক করবে কখন আমরা আমাদের পথ ধরব। মমতা বলছেন—আমরা এখন কোথাও যাব না, এখানেই থাকব। এবারে সি পি আই এম ব্রিগেডের কিঞ্চিৎ অসুবিধে। কিন্তু স্থূল আচরণে ও জঘন্য ধরনের কথা ছুঁড়ে দেওয়ায় তারা এতই দক্ষ যে আগের নাটকটাই তারা আবার শুরু করছে।

আমি বসে বসে ভাবছি—এই দলটা বোধহয় এদের কাডারদের ট্রেনিং দেয়। নয়ত এমন জিনিস সম্ভব হয় কী করে। এরকম 'শো' সম্ভব করে তুলতে বড় মাপের প্রতিভা আর নিরবচ্ছিন্ন অধ্যবসায় লাগে।

১৪ই মার্চ বিভিন্ন জায়গায় ঠোক্কর খেতে খেতে অবশেষে সন্ধে নাগাদ তমলুক হাসপাতাল। এক ভদ্রলোক বাইরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে কাঁদছেন আর বলছেন : 'এইভাবে মানুষ মানুষকে মারতে পারে!'

মমতার সঙ্গে প্রায় ছুটতে ছুটতে হাসপাতালের ভেতরে। ওয়ার্ডের ভেতরে আমরা আর একসঙ্গে নেই। কে যে কোন্‌দিকে ছিটকে গেলাম। সামনেই একটা বিছানায় এক শীর্ণকায় গ্রামবাসী শুয়ে। তাঁর বুকে রক্তমাখা গজ ঢোকানো। বিরাট একটা গর্ত। আহত মানুষটি নিঃশ্বাস প্রায় নিতেই পারছেন না। পাশেই তাঁর স্ত্রী। ক্ষীণকায়া। সিঁথিতে সিঁদুর তখনও। একটু পরেই যা আর থাকবে না। আহত মানুষটির হাত ধরতেই তিনি আমায় প্রায় নীরবে বলছেন— 'আমি তো কিছু করিনি। আমায় মেরে দিল।'

তাঁর স্ত্রী বাকরুদ্ধ। আমি ঠিক জানি না আমার মধ্যে কী হচ্ছে। যেদিকে তাকাচ্ছি শুধু মারাত্মক জখম হওয়া মানুষ। একটি ছেলে, ইস্কুলের ইউনিফর্ম পরা, তার মাথায় সাঁটা স্টিকারে তার নাম, আমায় বলছে, 'কাকু, আমি স্কুলে যাচ্ছিলাম। আমায় মারল।'

ছেলেটির পেটে গুলি লেগেছে। বিরাট গর্ত। জনা দুই তিন ডাক্তার ও কয়েকজন সেবিকা উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে বেড়াচ্ছেন।

গুনে দেখছি ৩১ জন আহত মানুষকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। প্রায় প্রত্যেকের কাছে যাচ্ছি। বেশিরভাগ গ্রামবাসীর বুকে, পেটে বা যৌনাঙ্গে বন্দুকের গুলি লেগেছে। পায়ে বা হাতে গুলি লেগেছে এমন একজনকেও দেখছি না। অর্থাৎ সুপরিকল্পিতভাবে গুলি চালিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ ও সি পি আই এমের খুনেরা নন্দীগ্রামবাসীদের লক্ষ্য করে—যাতে তাঁদের প্রাণহানি হয়। আমার মাথায় খুন চেপে যাচ্ছে।

মমতা এক মহিলার পাশে। মিডিয়ার লোকরা সেই ছবি তুলছে। এক বকুনি দিলেন মমতা। একাধিক মহিলার নিম্নাঙ্গে গুলি লেগেছে। প্রথম যে মানুষটির কাছে গিয়েছিলাম আবার এসেছি তাঁর কাছে। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তাঁর নাভিশ্বাস উঠছে। আমি এক ডাক্তারকে বলছি—অপারেট করা যায় না?

পাথরের মতো মুখ নিয়ে তিনি বলছেন—ওঁকে তুলতে গেলেই উনি মারা যাবেন। আর উপায় নেই। I am sorry, he will die anyway. I am so sorry. Another few minutes. I am so sorry, Sumanda.

১৯৮৫ সালে নিকারাগুয়ায় গিয়ে দেখেছিলাম, প্রতিবিপ্লবীরা (Contras) নিকারাগুয়ায় এক প্রান্তিক গ্রামে অস্ত্রহীন মানুষদের ওপর আক্রমণ করে শিশুদের খুন করেছে। তারপর তাদের ধড় আর মাথা আলাদা করে দিয়েছে। সাজিয়ে রেখেছে কী পরিপাটিভাবে। ঐ গ্রামে সেই সময়ে বিপ্লবী সরকারের প্রহরীরা ছিলেন না। একই কায়দায়, ভারী, আধুনিক অস্ত্র নিয়ে সি পি আই এমের বাহিনী আক্রমণ করেছিল নন্দীগ্রামে, সোনাচূড়ায়। প্রতিরোধ-সংগ্রামীদের হাতে কিছুই ছিল না। তাছাড়া তাদের রক্ষা করার জন্য ছিল না পুলিশ। সি পি আই এমের ঘাতকদের সহায়তায় পুলিশ ছিল।

তমলুক হাসপাতালের এক কর্মী জানালেন মর্গে অন্তত চোদ্দটি কিশোরের মৃতদের রাখা আছে। সকলেই স্কুলের ছাত্র। মর্গের চাবি অনেক চেষ্টা করেও পাওয়া যাচ্ছে না। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে বলা হচ্ছে কে যেন চাবিটা নিয়ে চলে গেছে। মর্গের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে। আমার মাথায় সুকুমার মিত্রর কথাও ঘুরছে। সুকুমার কোথায়? অরূপকে দেখছি না। নিশ্চয়ই খবর জোগাড় করছে নানান জায়গা থেকে। আমার ক্লান্ত লাগছে। মমতার ক্লান্তি নেই।

সুব্রত মুখোপাধ্যায় এসেছেন। আসার পথে সি পি আই এমের লোকজন ওঁর গাড়ির ওপর আক্রমণ করেছে। ভাঙচুর করেছে। রাজনীতিকরা যদি চান সংকটের মুহূর্তে কী শান্ত থাকতে পারেন! সুব্রত মুখোপাধ্যায় 'লাইভ দশটায়' অনুষ্ঠানে আমার এক প্রিয় অতিথি। সুব্রতবাবু আমায় বলছেন, 'মর্গের সামনে অপেক্ষা করে আর লাভ নেই, বুঝলেন। চাবি কোথায় লোপাট করে দিয়েছে কে বলবে।'

টিভি ক্যামেরা-প্রকৌশলীর দল আর সাংবাদিকরা তাক করছেন মমতা আর সুব্রতবাবুকে। প্রশ্ন-উত্তর শুরু। আমি চাইছি সুকুমারের খবর পেতে। কিন্তু আমি জানি এখানেই একজনের দায়িত্ব সুকুমার মিত্রকে চিনিয়ে দেওয়ার। ঘাতক? কে খুন করবে ছেলেটাকে? চিনিয়েই বা দেবে কে? আগেই খবর পেয়েছি একটি বিশেষ চ্যানেলের এক সাংবাদিক বা প্রকৌশলী। আগেই জানা 'তারা' চ্যানেলের জেলা-রিপোর্টার ও ভিডিওগ্রাফার উপেন কল্যার ওপর পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছিল এক ক্যামেরা-প্রকৌশলীই। সেইই চিনিয়ে দিয়েছিল উপেনকে। কলার বোন ভেঙ্গে গিয়েছিল উপেনের, সেই সঙ্গে ভিডিও ক্যামেরাটাও। সুকুমার মিত্রর কী ভাঙ্গা হবে, মাননীয় সরকার, রাষ্ট্র?

তমলুক হাসপাতাল থেকে নন্দীগ্রামের পথে। কিন্তু বেশি দূর এগোনো গেল না। সি পি আই এমের এক বিরাট কাডার-বাহিনী রাস্তা আটকাচ্ছেন। জায়গাটার নাম কি চণ্ডীপুর? মেচেদায় যারা পথ আটকেছিল তারা সশস্ত্র ছিল বলে মনে হয়নি। এদের কিন্তু দেখেই মনে হচ্ছে যে এরা খালি হাতে আসেনি। টিভি চ্যানেলের ছেলেমেয়েরা আমাদের গাড়ির আশেপাশে। কেউ কেউ দেখছি অবাঙালি। জিজ্ঞেস করে বুঝছি দিল্লি থেকে এসেছেন।

নেহাতই কম বয়স। 'তারা'র ক্যামেরাম্যান ও রিপোর্টারকে দেখছি। কলকাতা টিভির ছেলেদেরও দেখছি। মমতা উত্তেজিত। গাড়িতে আর কেউ বিশেষ কথা বলছেন না। পথ আটকে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো কুৎসিত গালাগাল দিচ্ছে। বলছে—আয়, আয়, দেখি তোর দম কত।

মমতা বদ্ধপরিকর, নন্দীগ্রাম যাবেনই ঐ রাতে। একটু একটু বৃষ্টি শুরু হয়েছে। এক ভদ্রলোক, নিতান্তই সাধারণ চেহারা, আমায় গাড়ি থেকে একটু নামতে বলছেন। এক পাশে নিয়ে গিয়ে বলছেন, 'দেখুন, আমার কাছে খবর আছে, ম্যাডামকে দেওয়া দরকার। কিন্তু উনি এত উত্তেজিত যে ওঁকে গিয়ে বলতে পারছি না, উনি শুনবেন না আমার কথা। ইনফর্মেশনটা হল : এখান থেকে নন্দীগ্রাম যেতে ফুলনির মোড় নামে একটা জায়গা পড়ে। সেখানে বেশ কিছু ডাকাতকে কয়েকদিন ধরে মাংস-ভাত আর মদ খাইয়ে তৈরি রাখা হয়েছে। প্ল্যানটা হল—একটু পরেই ব্যারিকেড তুলে নেওয়া হবে, সব গাড়ি তখন ছুটবে নন্দীগ্রামের দিকে। ফুলনির মোড়ে ডাকাতরা সকলকে ধরবে। তারপর বুঝতেই পারছেন। খুন করা হবে আপনাদের। আর মেয়েদের ওপর ওরা অত্যাচার করবে।'

প্রায় ফিসফিস করে কথাগুলো বলে গেলেন সেই ব্যক্তি। গায়ে একটা আধময়লা শার্ট, গাঢ় রঙের ট্রাউজারস্, পায়ে চটি। লোকটির গায়ের রং শ্যামলা। মাঝারি উচ্চতা। বয়স চল্লিশ মতো, একটু বেশিই হয়তো। লোকটিকে দেখে অনেক কিছুই মনে হতে পারে। আলাদা কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। অর্থাৎ ইনফর্মার হিসেবে আদর্শ। আমি দেখছি ভদ্রলোক তাড়ায় আছেন। কথাগুলো বলছেন একটু অন্যদিকে তাকিয়ে। একটু দূর থেকে দেখলে কেউ চট করে বুঝতে পারবে না উনি কাকে বলছেন।

আমি প্রায় ফিসফিস করেই জানতে চাইলাম তিনি কে। তিনি বললেন, 'জানতে চাইবেন না। ইনফর্মেশনটা বড্ড ক্রিটিকাল। ম্যাডামকে বুঝিয়ে বলুন। ওঁকে আর এগোতে দেবেন না।'

লোকটি কোথায় চলে গেলেন চট করে।

আমি খেয়াল করেছি—লোকটির ইংরিজি উচ্চারণ মোটের ওপর শুদ্ধ। বাংলা উচ্চারণে বরং একটু যেন টান।

সময় কম। যে কোনও মুহূর্তে ব্যারিকেড তুলে নেবে ওরা। তখন

আর মিডিয়ার গাড়িগুলোকে আটকানো যাবে না। মমতাকেও না। আমি মমতাকে ধীরে ধীরে বলছি কথাগুলো। প্রথমে তিনি খুব মন দিয়ে শুনছেন না। এবারে আমি আরও জোর দিয়ে বলছি। বলছি—তোমায় ফিরতে হবে। ফিরতেই হবে এখন। তোমার কিছু হলে গ্রামবাংলার মানুষ কোথায় যাবে, কার কাছে যাবে। তোমায় এখনও অনেকদিন বাঁচতে হবে। মিডিয়ার ছেলেমেয়েগুলোর কথা ভাবো। ডাকাতগুলো ওদের ক্যামেরাগুলো তো ভাঙবেই, ভিডিও ক্যাসেটগুলো ভেঙ্গে ফেলবে, মেয়েদের ধর্ষণ করবে, ছেলেগুলোকে খুন করবে। আমি মিডিয়ার লোক। এরা আমার ছেলেমেয়ে। এটা আমরা ঘটতে দিতে পারি না।

মমতা নাছোড়বান্দা। তিনি নন্দীগ্রাম যাবেনই। ঐ রাতেই। তাছাড়া, তিনি বলছেন, আমি যদি এখন ফিরে যাই এই সি পি এমগুলো কিরকম টিককিরি দেবে ভেবে দেখেছ? আমি ফিরে যাচ্ছি মানে আমি পালিয়ে যাচ্ছি ওদের ভয়ে। এ আমি হতে দেব না।

আমিও নাছোড়বান্দা। আমি বলছি, বেশ, মরতেই যদি হয়, ডাকাতদের হাতে শহীদই যদি হতে হয় তাহলে ছেলেমেয়েরা এখানে থাক, আমরা কয়েকজন চলো এগিয়ে যাই। তুমি, আমি, মুকুল। আমরাই শহীদ হই চলো। কিন্তু ভেবে দেখো, তুমি মারা গেলে কার লাভ। আমাদের আন্দোলনের কী হবে। গ্রামবাংলার অসংখ্য মানুষের কী হবে। সি পি আই এমের বিরুদ্ধে লড়াই-এর কী হবে। কার সুবিধে হবে।

এবারে অনুরাধা পুততুণ্ডও বলছেন। মুকুল আর শোভন চুপ। তাঁদের মুখ থমথমে। দোলা প্রথমে কিছু বলছেন না, কিন্তু তাঁর মুখ দেখে বুঝতে পারছি তিনি ঐ রাতে নন্দীগ্রামে না যাওয়ারই পক্ষে। মমতা উত্তেজিত হয়ে বলে চলেছেন—আমি ফিরে গেলে ঐ সি পি এমগুলো কী বলবে ভাবো।

হঠাৎ সামনের ব্যারিকেড ফাঁক হয়ে গেল। সি পি আই এমের কাডাররা দু'দিকে সরে গিয়ে রাস্তা করে দিল যেন আমাদের জন্য। সেই ভদ্রলোক তো বলেছিলেন এটাই হবে। আমি ভয়ানক ভয় পেয়ে গিয়েছি। হঠাৎ দেখছি 'কলকাতা টিভি'র গাড়িটা সজোরে ঐ ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি গাড়ি থেকে নেমে বাকি সবাইকে এগোতে বারণ করছি। 'কলকাতা টিভি'র একমাত্র রজতের টেলিফোন নম্বর আমার ফোনে রাখা

আছে। ফোন করছি রজতকে। কী ভাগ্য আমাদের, রজত ফোন ধরছেন। রজত, তোমাদের গাড়িটাকে এখনই ফিরে আসতে বলো, আর একটুও যেন না এগোয়।

রাগ আর উত্তেজনা কোনওরকমে চেপে চুপ করে আছেন মমতা। ড্রাইভার ধীরে ধীরে গাড়ি ঘোরাচ্ছেন। মমতার গাড়ি ঘুরছে দেখে মাননীয় সরকার একটি জিপে যে দুই প্রবীণ ও ন্যুব্জদেহী পুলিশ কনস্টেবলকে মমতার সঙ্গে থাকার দায়িত্ব দিয়েছেন, তাঁরাও ঘুরছেন। মমতার নিজের দেহরক্ষীরা গাড়ির বাইরে, রাস্তা সামলাচ্ছেন।

তৃণমূলের এক ছোট পার্টি অফিসে সাংবাদিক বৈঠক করছেন মমতা। ঠিক হচ্ছে মিডিয়ার কর্মীদের একটি হোটেলে তোলা হবে। মমতা, দোলা, অনুরাধাদিও থেকে যাবেন সেখানে। পার্থ আর আমি পার্থর গাড়িতে কলকাতা ফিরব।

সাত

১৫ই মার্চ সকালে তৃণমূলের মদন মিত্র আমায় ফোন করে বলছেন : মমতা বিপদে পড়তে পারে—ও নন্দীগ্রামে। তুমি ওকে ফোন করে বলো ফিরে আসতে।

এবারে বিপদ আমারই! আমি মমতাকে বলব?

মদন চিন্তিত ও উত্তেজিত, গলা শুনেই বুঝতে পারছি। বলছেন : ওর সঙ্গে দোলা আছে। তুমি ফোন করে বলো—'আমি আজ্ঞা করছি তুমি অবিলম্বে কলকাতায় ফেরো।'

মরিয়া হয়েই বলছেন মদন কথাগুলো। বলছেন—'একমাত্র তুমি বললে যদি শোনে। আমি যেভাবে বললাম ঐভাবেই বলো। ওখান থেকে চলে না এলে বিপদ।'

মমতাকে ফোন করছি। ফোন বেজে যাচ্ছে। অগত্যা দোলাকে ফোন। দোলার কথা প্রায় শোনা যাচ্ছে না, চারপাশে এত গোলমাল। দোলা মমতাকে ফোনটা দিচ্ছেন। তিনি খুব উত্তেজিত। আমার কথা ভাল শুনতে পাচ্ছেন না গোলমালে। তারস্বরে চেঁচিয়ে গ্রামবাংলার অবিসম্বাদিত নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলছি : আমি তোমায় বলছি তুমি এখনই ফেরো, আর থেকো না ওখানে।

১৫ই মার্চ বিকেলে অসীম আর আমি বেরিয়ে পড়েছি কোথায় বিক্ষোভ মিছিল হচ্ছে দেখতে, যাতে আমরা যোগ দিতে পারি। তমলুক হাসপাতালে যা দেখেছি তারপর আমার মাথায় আগুন জ্বলছে। অসীমকে সব বলায় ও-ও অগ্নিশর্মা। এত কিছুর মধ্যে একটাই স্বস্তি : দৈনিক স্টেটসম্যানে'র রিপোর্টার সুকুমার মিত্রর খবর পাওয়া গিয়েছে। ছ ঘণ্টা

ধরে হেঁটে হেঁটে, লুকিয়ে লুকিয়ে ও নন্দীগ্রামে একটা নিরাপদ ডেরায় পৌঁছতে পেরেছে।

কলেজ স্কোয়ারে গিয়ে দেখছি সেখানে 'সংহতি'র মিছিল বেরোচ্ছে। কোনওদিন আমি এত জোরে স্লোগান দিইনি। অনেক নকশালপন্থীকে দেখছি। পুরনো সহযোদ্ধা অরুণের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। প্রিয়ব্রত নামে একটি ছেলের সঙ্গেও। এক তরুণ দুর্দান্ত স্লোগান দিচ্ছেন। জানছি এঁর নাম সৌম্য। একজন বলছেন—ও আমাদের মানিক মণ্ডলের ছেলে।

মৌলালির মোড়ে আমরা ভাষণ দেব। একটু দূরে এক বামপন্থী (বামফ্রন্টি নন) মহিলা সমিতি সভা করছেন। আমাদের একজন যাচ্ছেন তাঁদের কাছে—আমরাও যদি ওঁদের মাইকটা অল্প সময়ের জন্য ব্যবহার করতে পারি। ওঁরা রাজি নন। এক 'দক্ষিণপন্থী' দল তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা উড়িয়ে একটি অটোরিক্সা যাচ্ছে। সেখানে আমার চেনা একটি মেয়ে। ভারি প্রাণবন্ত। মমতার অনশন মঞ্চে এঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, প্রায়ই দেখা হত। আমাকে আর অসীমকে দেখেই কবিতা অটো থামিয়ে নেমে এসেছেন। আমাদের অবস্থা দেখে বলছেন—দাদা, আমাদের মাইক আছে, এটা ইউজ করুন।

আমাদের এই মিছিলে বোধহয় একজন তৃণমূলীও নেই। তৃণমূল কংগ্রেসের অ্যাকটিভিস্ট, বড়বাজারের মেয়ে কবিতার কিন্তু কোথাও কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তাঁদের ভাড়া করা অটোতে লাগানো সাউন্ড সিস্টেম আমাদের ব্যবহার করতে দিতে। এক 'বিপ্লবী' দলের কিন্তু খুবই অসুবিধে হচ্ছিল।

ভয়ানক এক ভাষণ দিচ্ছি মৌলালির মোড়ে। তমলুক হাসপাতালে যা দেখে এসেছি জনসাধারণকে তার অনুপুঙ্খ বিবরণ দিচ্ছি। বাস গাড়ি সব আটকে গেছে। অনেকে নেমে এসে ভাষণ শুনছেন, প্রচুর লোক। আমি চিৎকার করে সি পি আই এমের বিরুদ্ধে, সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক দিচ্ছি। বলছি—ওরা যখন অস্ত্র দিয়ে মারছে আমাদের গ্রামবাসীদের তখন ওদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত। সশস্ত্র প্রতিরোধ করুন, বিদ্রোহ করুন, নন্দীগ্রামের গণহত্যার বদলা নিন। এত হিংসাত্মক ভাষণ আমি

কখনও দিইনি। তমলুক হাসপাতালের অভিজ্ঞতা আমার ভেতরে কিছু জিনিস পালটে দিয়েছে, বোধহয় চিরকালের মতো।

আবার মিছিল চলছে। তৃণমূল কংগ্রেসের অ্যাকটিভিস্ট কাকলি ঘোষ দস্তিদার এসে পড়েছেন তাঁর দুই ছেলেকে নিয়ে। তৃণমূলেরও বোধহয় একটা মিছিল হওয়ার কথা। কবিতা, কাকলি ও তাঁর দুই ছেলে কিন্তু আমাদের মিছিলেই হাঁটছেন—একেবারে সামনেই। আমাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তাঁরাও স্লোগান দিচ্ছেন—'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'।

'উদ্ধত মূর্খের অসহ্য দম্ভ
বুদ্ধির বিরুদ্ধে রাস্তায় নামব।'

'তোমার নাম আমার নাম
সিঙ্গুর ভাঙ্গড় নন্দীগ্রাম।'

কবিতাকে কোনওদিন ভুলব না। সেদিন কাকলির মধ্যে যে তেজ দেখেছিলাম তাও ভোলার নয়। কবিতা সেদিন তৃণমূলের অটো ও তাঁদের সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার করতে না দিলে কী করতাম আমরা। ক'টি বামপন্থী দল আছেন, তৃণমূলের একটি মিছিল যাচ্ছে এবং তাঁদের মাইক নেই দেখে নিজেদের মাইক আর অটো ব্যবহার করতে দেবেন? তৃণমূলের কবিতা কিন্তু আমাদের মিছিলে কে বাম কে ডান এই বাছবিচার না করে নিজের থেকে তাঁদের মাইক দিয়েছিলেন। সাউন্ড সিস্টেম ছিল অটোয় লাগানো, ফলে অটোটিকেও আমাদের মিছিলের সঙ্গে থাকতে হচ্ছিল—যে মিছিলে অনেকেই ছিলেন র‍্যাডিকাল রাজনৈতিক মতবাদের লোক। এক জায়গায় এক যুবক বললেন—তৃণমূলের ফ্ল্যাগ কেন?

আমি বলেছিলাম—তৃণমূলের মাইক ব্যবহার করছ কেন হে?

এক জায়গায় ভাষণ দিতে গিয়ে আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করায় আর-এক যুবক বললেন—আপনি আন্দোলনটাকে অন্যদিকে নিয়ে যাচ্ছেন।

১৬ই মার্চ। সন্ধেবেলা 'মতামত'। আমার মাথায় আগুন জ্বলছে। তমলুক হাসপাতালে যা যা দেখেছি ভুলতে পারছি না। ভোলা সম্ভব নয়।

আইনজীবী অরুণাভ ঘোষকে ডাকা হয়েছে অতিথি হিসেবে। বিষয় : অবধারিতভাবেই নন্দীগ্রামে সি পি আই এমের গণহত্যা।

রীতিমত অস্বস্তিতে আছেন অরুণাভবাবু। কাতর। বিরক্ত। ক্রুদ্ধ। বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারলেন না। লেপেল মাইক খুলে উঠে চলে গেলেন স্টুডিও ছেড়ে। তারপর আমি একা। ১৯৭৫ সাল থেকে বেতারে কাজ করেছি। শর্টওয়েভ বেতার। ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত আমি ছিলাম দুটি দেশে—জার্মানি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। বেতার সাংবাদিক, বেতার ঘোষক, বেতার কথক হিসেবে কতবার কত বিষয়ে কথা বলতে হয়েছে এক টানা, কোনও স্ক্রিপ্ট ছাড়া। কিন্তু ২০০৭ এর ১৬ই মার্চ কলকাতায় 'তারা' চ্যানেলের স্টুডিয়োয় আমি যা বলছি, বলে চলেছি, বলতে বাধ্য হচ্ছি তার বিষয়, ভাষা, উদ্দেশ্য একেবারেই আলাদা। আজ আমার উদ্দেশ্য—সম্ভব হলে বিদ্রোহ জাগিয়ে তোলা টেলিভিশন দর্শকদের মনে। সি পি আই এম সরকার, সি পি আই এম দল ও তাঁদের খুনে বাহিনী নন্দীগ্রামে যে গণহত্যা ঘটালেন, তমলুক হাসপাতালে যে দৃশ্য সদ্য দেখে এলাম— তারপর আমাকেই পরীক্ষা দিতে হচ্ছে লাইভ টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে বসে। একটি শিথিল শব্দ উচ্চারণ করা চলবে না। বুকের ভেতর যে অনন্ত ক্রোধ, ঘৃণা ও যন্ত্রণা জমে উঠেছে তা নিয়ন্ত্রণে রেখে আমায় কথা বলে যেতে হবে দর্শকদের লক্ষ্য করে। তমলুক হাসপাতালে যেটা দেখে এলাম তার গ্রাফিক বর্ণনা দিতে হবে, এমনভাবে যাতে আমার প্রতিটি উচ্চারণ বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে দর্শকদের মনে, যাতে আমার কষ্ট আর আক্রোশ তাঁদের মনেও সঞ্চারিত হয়।

এক মহিলা কল্ করছেন। কী ঠাণ্ডা গলা। কী শান্ত বাচনভঙ্গি। গণহত্যার পরেও তিনি শাসকদল ও তাঁদের খুনেদের বিরুদ্ধে, ঠাণ্ডা মাথায় গণখুনের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলছেন না। তিনি বলছেন শাসক-বিরোধীদের বিরুদ্ধে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। কথাগুলো শেষ করেই তিনি তার টেলিফোন রিসিভার ঝুলিয়ে রাখলেন, লাইন কাটলেন না। অর্থাৎ স্টুডিয়োর লাইন আটকে থাকল, 'ব্যস্ত' থাকল। এবারে আর অন্য কোনও দর্শক ফোন করতে পারবেন না। বাহবা শাসকদল ও ঠিকঠিক জায়গায় তাঁদের বসিয়ে রাখা লোকজন। কন্‌ট্রোল প্যানেল থেকে আমায়

জানানো হচ্ছে—খবর আসছে, বিভিন্ন জায়গায় 'তারা'র সম্প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে কেবল্ টিভি অপারেটরদের সাহায্যে। আমি হাততালি দিয়ে বাহবা দিচ্ছি মাননীয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও তাঁর সরকারকে, শাসক দলকে। বারেবারে সেই স্বৈরাচারী অপশক্তির হিংস্রতার বিবরণ দিচ্ছি। জানাচ্ছি—পুরুষ মহিলা শিশু কিশোর নির্বিশেষে নন্দীগ্রামবাসীদের শরীরের কোন্ কোন্ জায়গা লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে শাসকদলের খুনেরা, কী ধরনের বুলেট ব্যবহার করা হয়েছে।

এমন ভয়ঙ্কর, বিধ্বংসী বেতার ভাষণ আমি জীবনে আর কখনও দিতে পারব বলে মনে হয় না। অনুষ্ঠানের শেষে বলছি : এমনিতে আমি এই অনুষ্ঠান নিয়মিত শেষ করে থাকি 'নমস্কার' ও 'আস্‌সালাম ওয়ালেকুম' বলে—অর্থাৎ, 'আপনাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।' আজ আর তা পারছি না। আপনাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হবে না, হতে পারবে না।

১৬ই মার্চের 'মতামত'-এর পর স্টুডিয়ো থেকে যখন বেরোচ্ছি—দেখছি আমার সহকর্মীদের চোখে জল। ক্যামেরা-প্রকৌশলী অনির্বাণ সাধু আমায় জানালেন অনুষ্ঠানটি আমি যখন শেষ করছিলাম 'তারা' চ্যানেলের খবর বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট দেবজ্যোতি চক্রবর্তী তখন স্টুডিয়োর এক পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ করে উঁচুতে তুলে 'পাওয়ার স্যালুট' দিচ্ছিলেন। কাঁদছিলেন দেবজ্যোতি—এক পোড় খাওয়া সাংবাদিক।

আজ, সেই সন্ধের সাড়ে তিন বছর পর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মনে পড়ছে আমার প্রাক্তন সহকর্মী, সহযোদ্ধাদের কথা। বড় উত্তাল এক যুগমুহূর্তে তাঁরা সাংবাদিক ও মিডিয়া কর্মী হিসেবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছিলেন—সাংবাদিকতা ও টেলিভিশন সম্প্রচারের প্রতিটি খুঁটিনাটি দিকের প্রতি নজর রেখে। একদিকে বহু গ্রামবাসীর আত্মত্যাগ আর অন্যদিকে বহু টেলিভিশন কর্মীর পরিশ্রম, মেধা, নীরব ঐকান্তিকতা, শারীরিক কষ্টস্বীকার (কে যে কখন খাওয়া ও বিশ্রাম নেওয়ার ফুরসত পাচ্ছিলেন তার ঠিক ছিল না) ও বড় ধরনের ঝুঁকি নেওয়ার মূল্যেও তিন দশকের এক শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটছে। কে, ক'জন মনে রেখেছেন আজ শহীদদের, ধর্ষিতাদের, ঘরহারাদের, অনাথদের? ক'জন জানতে চেয়েছেন সে-সময়কার 'তারা' ও

'কলকাতা টিভি'র কর্মীদের কথা? অন্তত এই দুটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে শাসকদল, তাদের খুনে-বাহিনী ও পুলিশের অত্যাচার, নিরীহ অস্ত্রহীন গ্রামবাসীদের ওপর তাদের গুলি চালানো এবং সেইসঙ্গে গ্রামবাসীদের প্রতিরোধ ও অভ্যুত্থানের যে ভিডিও সমানে দেখানো হয়েছিল, এ-রাজ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতাবদলের পেছনে তার ভূমিকা যে কত বড় তা আমরা ভেবে দেখি না এমনিতে। কোনও *একজন* নেতা বা দল প্রধান চালিকাশক্তি ছিলেন না। প্রতিষ্ঠিত, সংসদীয় রাজনীতিকদের ভূমিকা ছিল তুলনায় ছোট। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের সাধারণ মানুষ উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, বিপুল এক 'না' বলেছিলেন শাসকদল, শাসক-সরকার ও তাঁদের 'নীতি' ও পরিকল্পনার বিরুদ্ধে। অসংখ্য গ্রামবাসী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। কলকাতায় আমরা যখন রাতে ঘুমিয়ে নিচ্ছিলাম, নন্দীগ্রামের সাধারণ মানুষ তখন গ্রাম পাহারা দিচ্ছিলেন। মাসের পর মাস তাঁরা ভাল করে খাননি, বিশ্রাম পাননি। তাঁদের সেই লড়াই-এর মূল্যে আমার শ্রেণীর অনেক মানুষ আজ লম্বাচওড়া কথা বলছে, ক্ষমতা বদলের হাওয়ায় গুছিয়ে নিচ্ছে আখের। আরও নেবে।

খেজুরিতে সি পি আই এম কাডারদের বিরুদ্ধে গণ-সংগঠন করছিলেন যে আমিনা বিবি, সেই স্কুল-কলেজে না-পড়া, আধপেটা থাকা, ক্ষীণকায়া গ্রামের মেয়েটি আজ কোথায়? কোথায় স্থান পেলেন তিনি? কোন পদ পেলেন গণধর্ষিতা নর্মদা শীট, রাধারাণী আড়ি? জানতে ইচ্ছে করে। হয়তো পেয়েছেন, আমি জানি না। এই প্রশ্নগুলি তোলার জন্য কি ২০১১ সালের পর আমার 'চরম সর্বনাশ' হয়ে যাবে? যদি হয় তো জানব, এই গ্রন্থের পাঠকরাও জানবেন তবু একটা কাজের কাজ হল। আমি গর্বিত যে মেট্রো চ্যানেলে কৃষিজমি-রক্ষা কমিটির একটি জনসভায় আমিনা বিবি আর আমি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখতে পেরেছি জনতার সামনে। দেখতে নেহাতই সাধারণ, ক্ষীণকায়া এই মেয়েটি যে কী অসামান্য বক্তব্য রেখেছিলেন সেদিন! এঁদের লড়াই নড়িয়ে দিয়েছে সি পি আই এম শাসনের জগদ্দল পাথরটাকে।

২০০৭ সালের ১৬ই মার্চের 'মতামত' সম্পর্কে এক নামজাদা দৈনিক পত্রিকায় মন্তব্য করেছিলেন চন্দ্রিল ভট্টাচার্য। শাসকদল-বিরোধীদের ও

মমতার বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য যে মহিলা ফোন করেছিলেন এবং লাইন না কেটে ফোন ঝুলিয়ে রেখে লাইনটা সেই সন্ধের মতো ব্যস্ত রেখে দিয়েছিলেন, তাঁর সম্পর্কে চন্দ্রিল লিখেছিলেন : 'হায় গাধা, বাঘ চেনো না।'

১৬ই মার্চের 'মতামত' অনুষ্ঠানের কয়েকদিনের মধ্যে 'তারা' কর্তৃপক্ষ আমায় পরোক্ষভাবে জানিয়ে দিলেন যে 'মতামত'-এ সিঙ্গুর বা নন্দীগ্রামের প্রসঙ্গ তো দূরের কথা, নামও আর করা যাবে না। আমি ইস্তফা দিলাম। তার কয়েকদিন পর ইস্তফা দিলেন প্রয়োজক পার্থ দাশগুপ্ত। আমাদের দু'জনের হাতে তখন অন্য কোনও কাজ ছিল না।

'তারা' থেকে আমি ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছি জেনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমায় এস এম এস-এ জানালেন : 'স্বাধীনভাবে সাংবাদিকতা করার অধিকার আমি তোমায় ফিরিয়ে দেবই।' খুব মিষ্টি লেগেছিল বার্তাটি।

বড় বড় লোক কোনও কোনও মুহূর্তে ভাল ভাল কথা বলেন আবেগের বশে। আবেগটা নিখাদ। কথাটা কিন্তু একটি বিশেষ মুহূর্তের প্রসঙ্গে বলা। এই ধরনের কথা যে সিরিয়াসলি নিতে নেই, অসংখ্য বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও ঘটনায় কানায় কানায় ভরা আমার জীবন আমাকে তা শিখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ঐরকম একটা সময়ে স্বয়ং মমতা এ-কথা টেক্সট করে জানাচ্ছেন এটাই তো অনেক।

নন্দীগ্রামে সি পি আই এমের গণহত্যার জেরে কয়েকজন বন্ধু মিলে কলকাতার মেট্রো চ্যানেলে একটা সভা করছি। অসীম আছেন অন্যতম প্রধান ভূমিকায়। সঙ্গে আছেন প্রিয়ব্রত, মৃন্ময়ী, উমা, চন্দ্রাবলী, প্রসূন, শুভাশিস। হিন্দোলও এসেছেন। বন্ধু পরমেশ আসছেন নিয়মিত। ১৯৯৩ সালের শেষাশেষি কানোরিয়া শ্রমিক আন্দোলন থেকে পরমেশ আর আমি অনেক গণ-আন্দোলনে থেকেছি কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে। সিঙ্গুরে পুলিশ যেদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমেত তৃণমূলের অ্যাকটিভিস্টদের বেদম মারল, পরমেশ সেদিন ঘটনাস্থলেই ছিলেন। ফোনে আমায় সব জানিয়েছিলেন তিনি। তিনিই আমায় জানিয়েছিলেন, পুলিশ দু'বছরের

একটি শিশুকেও গ্রেপ্তার করেছে। তিনিই আমায় বলেছিলেন এই ঘটনাটি নিয়ে আমি যেন গান বাঁধি। পরমেশকে দেখলে ভরসা পাই আমি।

মেট্রো চ্যানেলের সভার আয়োজনে সাহায্য করছেন মদন মিত্র। তাঁর লোকরাই মঞ্চ তৈরি করে দিয়েছেন, সাউন্ড সিস্টেম এনে দিয়েছেন। লোকমুখে খবর ছড়িয়ে যাওয়ায় চারদিক থেকে অনেকেই এসেছেন। আমার চেনাজানাদের মধ্যে এসেছেন টিঙ্কু, সত্যবান, সৈকত, সুযোগ, পারমিতা। তাঁরা আবার তাঁদের বন্ধুদের বলেছেন। অসিত রায় এসেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপক ভাস্কর গুপ্ত ও অনুপ বন্দ্যোপাধ্যায় এমনিতেই কৃষিজমি-রক্ষা কমিটিতে আছেন, মেট্রো চ্যানেলের সভায় এসেছেন তাঁরাও। কেউ ভাষণ দিচ্ছেন, কেউ পড়ছেন প্রতিবাদী কবিতা। অভ্র আর সুমন্ত এসেছেন। অভ্র অনেক দিনের গণ-আন্দোলনের ছেলে, গান বাঁধেন, গান করেন। গান হচ্ছে মঞ্চে। অসীম গাইছেন, আমি গাইছি, প্রসূন আর অনুপদা কবিতা পড়ছেন। কবিতা পড়ছেন আরও কেউ কেউ।

নন্দীগ্রামে গণহত্যার বিবরণ দিতে গিয়ে আমি রাগ আর ঘৃণা সামলাতে না পেরে সি পি আই এমের দুই নেতার নামে কাঁচা গালাগাল করে ফেলছি। তাতে কেউ কেউ রুষ্ট, কেউ আবার রুষ্ট নন। পরে আমার খারাপ লেগেছে। একাধিকবার, একাধিক জায়গায় এ-জন্য ক্ষমা চেয়েছি আমি।

সুমনা সান্যাল মঞ্চে কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন। মাইক্রোফোনে চিৎকার করে বললেন : গ্রামের মেয়েদের কেন, সি পি আই এম বরং আমায় ধর্ষণ করুক।

অভিনেতা পরমব্রত এসেছেন। যে দলকে তিনি এতদিন সমর্থন করেছেন সেই দল গণহত্যা, গণধর্ষণ করল! পরমব্রত কাঁদছেন। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় নেই। অল্পবয়সী এক তরুণ কাঁদছেন দেখে আমি তাঁকে জড়িয়ে ধরেছি, তিনি চোখের জল ফেলছেন আমার বুকে মুখ রেখে।

সভার খবর পেয়ে অর্ণব এসেছেন—কয়েক বছরের চেনা। আলাপ হচ্ছে তিস্তা, কল্লোল আর সর্বেন্দ্রর সঙ্গে। অর্ণব ও সর্বেন্দ্র আমার দুই ছেলের মতো। সর্বেন্দ্র এক সময়ে এস এফ আই করত।

কৃষ্ণেন্দু নামে একজনের সঙ্গে আলাপ হল আমার। চিন্তাশীল মানুষ। মঞ্চের নিচে কথা বলতে বলতে তিনি বলছেন—এখন মমতাকে সমর্থন করা দরকার। সুপ্রিয় নামে এক এখনও-তরুণ এসেছেন। তাঁর প্রস্তাব—এই সভা নিয়মিত হোক।

এরপর প্রত্যেক শনিবার মেট্রো চ্যানেলে সভা। এর নাম দেওয়া হচ্ছে 'সহনাগরিকদের মুক্ত মঞ্চ।' প্রতি শনিবারই তৃণমূল কংগ্রেসের মদন মিত্র সভার জন্য অনুমতি নিয়ে রাখছেন পুলিশের। কিন্তু কখনই বিনিময়ে কিছু চাইছেন না, কোনও শর্ত আরোপ করছেন না। প্রত্যেক শনিবারই যে মঞ্চ থাকছে তা নয়। কয়েকবার একটি ম্যাটাডোর ভ্যান ও ট্রাককেও ব্যবহার করা হয়েছে মঞ্চ হিসেবে। কয়েকবার আবার স্রেফ রাস্তায় দাঁড়িয়ে সভা করা হয়েছে। সকলে ঠিক করেছে এই সভায় কোনও রাজনীতিককে বক্তব্য রাখতে দেওয়া হবে না। রাজনীতিকরা আসতেই পারেন, তবে শ্রোতা হিসেবে। তেমনি কোনও বিশেষ মতবাদও প্রশ্রয় পাবে না এই মঞ্চে। অসীম গিরি একদিন উৎসাহ ও আবেগের আতিশয্যে আমাদের নীতির খেলাপ করে বসছেন। সহনাগরিকদের সভা চলছে, একটা লরিকে আমরা ব্যবহার করছি মঞ্চ হিসেবে। প্রসূন, আমি, কল্লোল, আরও কেউ কেউ লরির ওপর। এমন সময়ে তৃণমূলের একটি মিছিল আসছে আমাদের দিকে। তাতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তৃণমূল-নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। 'লাইভ দশটায়' ও 'মতামত'-এ কয়েকবার অতিথি হিসেবে পেয়েছি তাঁকে। রাজনীতিকদের মধ্যে যে অল্প ক'জন ভদ্রলোক ও নিপাট ভাল লোককে দেখেছি, শোভনদেব তাঁদের একজন। কয়েক বছর ধরে রীতিমত বন্ধুতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তাঁর সঙ্গে। অসীম হঠাৎ শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে লরিতে উঠতে বলছেন কিছু বলার জন্য।

কয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও অসীম ভুলে গেছেন সহনাগরিকদের মুক্ত মঞ্চের নীতি : কোনও রাজনীতিক এই মঞ্চে ভাষণ দিতে পারবেন না। আমার সে কী অবস্থা। বাধ্য হচ্ছি বন্ধুবর শোভনদেবকে আমাদের নীতির কথাটা বলে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দিতে। মানুষটি এত ভাল, হাসি-হাসি মুখে নেমে যাচ্ছেন। কিচ্ছু মনে করছেন না তিনি। অসীম জিভ কাটছেন লজ্জা

পেয়ে। দুই ভাল মানুষের কী দুর্গতি। এর দু'বছর পরে আমি যখন শেষ পর্যন্ত ভোটে দাঁড়াই, তৃণমূলের বড় নেতাদের মধ্যে (মমতা ছাড়া) একমাত্র শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় আমাদের যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে টালিগঞ্জ অঞ্চলে কয়েকটি জনসভায় আমার সমর্থনে ভাষণ দিয়েছেন।

মেট্রো চ্যানেলে সহনাগরিকদের সভায় দু'একজন বক্তা অবশ্য এই মঞ্চ থেকে নকশালপন্থী বক্তব্য রাখছেন, সি পি আই এম ও তৃণমূল দুই দলের বিরুদ্ধেই কথা বলছেন চড়া সুরে। কেউ বাধা দিচ্ছে না তাঁদের। র‍্যাডিকালরা তৃণমূল-বিরোধিতা করছেন, মদন মিত্রর কোনও কোনও অনুগামী চুপচাপ শুনে যাচ্ছেন বিনা আপত্তিতে। প্রত্যেক শনিবারই মদন কিছু লোক রেখে দিয়েছেন—সি পি আই এম যদি সভায় হামলা করে তাহলে হস্তক্ষেপ করার জন্য।

এই মঞ্চে আসছেন অধ্যাপক শুভেন্দু দাশগুপ্ত। ভাষণ দিতে গিয়ে বলছেন—আমাদের আন্দোলন হবে হয়তো একটু অগোছালো। আমরা এখানে ওখানে বসে পড়ব, জটলা করব, কথা বলব, আলোচনা তর্ক করব, গান গাইব, কবিতা পড়ব, চুপ করে থাকব।

আসছেন লড়াকু ডাক্তার সিদ্ধার্থ গুপ্ত, ডাক্তার পুণ্যব্রত গুণ, ডাক্তার দেবপ্রিয় মল্লিক, অধ্যাপক কল্যাণ রুদ্র, বিজ্ঞানী অভি দত্ত মজুমদার। আসছেন সাংবাদিক সুবিদ আবদুল্লাহ। সবাই যে ভাষণ দিচ্ছেন তা নয়। অনেকেই আসছেন, মঞ্চের কাছে দাঁড়িয়ে থাকছেন। হয়তো চেনাশোনা লোকদের সঙ্গে কিছু কথা বলছেন। তাঁরা আসছেন আন্দোলনের সঙ্গে তাঁদের সংহতি জানাতে। তবে এই সভায় যাঁরা আসছেন তাঁদের বেশিরভাগই সাধারণ মানুষ। এক মা প্রতি শনিবার হাজির থাকছেন তাঁর মেয়েকে নিয়ে।

সহনাগরিকদের মুক্ত মঞ্চে এসে কবিতা পড়ছেন জয় গোস্বামী। সি পি আই এম বিরোধী গণ-আন্দোলনে জয় গোস্বামী তাঁর নতুন লেখা রাজনৈতিক কবিতাগুলি নিয়ে ক্রমশ একটা বড় ভূমিকা নিচ্ছেন।

রাস্তায় ঘাটে সভা করার জন্য (সব জায়গায় তো আর সাউন্ড সিস্টেম পাওয়া যায় না বা ব্যবহার করা যায় না) আমরা একটা ব্যাটারি-চালিত ছোট অ্যামপ্লিফায়ার স্পিকার ও মাইক্রোফোন কিনে নিচ্ছি। টিঙ্কু আর অভ্র কিনে

আনছে চাঁদনি থেকে। প্রথম দিকে মদন মিত্র সাউন্ড সিস্টেম দিলেও তার পর এই ছোট যন্ত্রই ব্যবহার করেছি আমরা।

মেট্রো চ্যানেলের শনিবারের এক সভায় গান গেয়ে গিয়েছেন বিদ্যুৎ ভৌমিক। তাঁর বাঁধা 'ভাতের জন্য গান বানাবো' গানটি শুনে কান্না আটকাতে পারিনি। মঞ্চে দাঁড়িয়েই অঝোরে কেঁদেছি। এমন গান আমি নিজে বানাতে পারিনি। ধন্য বিদ্যুৎ ভৌমিক।

জুন মাস অবধি (তার পরেই বর্ষা, কাজেই খোলা জায়গায় সভা করার জো নেই) প্রতি শনিবার সহনাগরিকদের মুক্ত মঞ্চর সভা হয়েছে মেট্রো চ্যানেলে। ঐ সভা হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের দেখা করার, আন্দোলন নিয়ে নানান পরিকল্পনা করার, তর্কবিতর্ক করার জায়গা।

সৃজনশীলতারও স্ফূরণ ঐ শনিবারের সম্মেলনে। সুপ্রিয় বানিয়ে নিয়েছেন ভারি সুন্দর মজাদার এক দীর্ঘ স্লোগান যার জবান—'জোট বাঁধো তৈরি হও।' এর দু'বছর পর লোকসভার নির্বাচনে দলহীন অথচ সি পি আই এম বিরোধী সহনাগরিকরা একটি ট্রাকে করে নানান জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে সি পি আই এম বিরোধী প্রচার করার সময়ে এই স্লোগানটি দিয়েছেন।

এপ্রিল মাসেই মমতা নন্দীগ্রামে কৃষিজমি-রক্ষা কমিটির জনসভা ডেকেছেন। নন্দীগ্রাম যাচ্ছি মমতারই গাড়িতে। এই প্রথম তাঁর সঙ্গে কোথাও যাচ্ছি। মমতা বসেছেন চালকের পাশেই। আমি তাঁর ঠিক পেছনে। আমার পাশে সমাজবাদী দলের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি বিজয় উপাধ্যায়।

মমতার সঙ্গে এক গাড়িতে করে শহর ছেড়ে গ্রামে না গেলে জীবনের মস্ত একটা দিক বিলকুল না-জানা থেকে যেত। মমতা সমানে নানান কথা বলে চলেছেন। এয়ারকন্ডিশন্‌ড্ গাড়ি। আমি অনাপোসী সিগারেটখোর।

আমি : এই জন্য বড় নেতাদের সঙ্গে থাকতে নেই। এসি গাড়ি। সিগারেট খাওয়া যায় না।

মমতা : না না, সেকি! তুমি খাও। জানলার কাঁচ নামিয়ে নাও। সিগারেট খাও।

কোনও এক রাস্তার মোড়ে পুলিশ দাঁড়িয়ে। মমতাকে দেখেই তাঁরা

লাঠি নামিয়ে হাত জোড় করে নমস্কার করলেন। মমতা করলেন প্রতি-নমস্কার।

কাছে দূরে কত মানুষ। দু'এক জায়গায় তৃণমূলের লোকজন সামিয়ানা খাটিয়ে দলনেত্রীকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য অপেক্ষা করছেন। জয়ধ্বনি। মমতা কথা বলে নিলেন টুক করে তাঁদের সঙ্গে। সাবধানে থাকতে বলছেন। সকলের মুখেই 'দিদি দিদি।'

কিন্তু তৃণমূলের পতাকার তলায় দলের মানুষ বেশি জায়গায় নয়। তার চেয়ে ঢের বেশি কোনও পতাকা না তোলা সাধারণ গ্রামবাসীরা। এক নবদম্পতি সাইকেলে করে চলেছেন। স্বামীর গায়ে নতুন জামা। বৌ-এর পরনে নতুন শাড়ি। ঘোমটা টেনে বসে আছেন তিনি কাত হয়ে সামনে, রডের ওপর। মমতাকে দেখেই দুজনে নেমে পড়ছেন। লজ্জা ভুলে, ঘোমটা খুলে বৌটি কী আদরের হাসিই না হাসছেন মমতাকে নমস্কার করতে করতে। কী যে খুশি মেয়েটি মমতাকে দেখে। নতুন বরও হাসছেন কপালে দুটি হাত ঠেকিয়ে। যেদিকে তাকাচ্ছি—গ্রামের মানুষ মমতাকে দেখে এমনভাবে হাসছেন যেন ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরছে। এতদিন এত জায়গায় গিয়েছি এর আগে, এভাবে এতজন মানুষকে এই খুশির হাসিটা হাসতে দেখিনি একজন মানুষকে দেখে। মমতা চেষ্টা করছেন সবার প্রতি সুবিচার করতে। এক জায়গায় কয়েকজন মাত্র লোক দাঁড়িয়ে, আর মমতার চালক গাড়ির গতি না কমিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। কী বকুনি মমতার : 'তোমায় কতবার বলেছি, মানুষ দেখলে আস্তে যাবে, দাঁড়াবে। এত বছর কাজ করছ আমার কাছে। এখনও ভুল হয়!'

এতক্ষণে খেয়াল করছি—গাড়ির চালক সত্যিই মানুষ দেখলে গাড়িটা আস্তে চালাচ্ছিলেন, থামিয়েও দিচ্ছিলেন অল্প সময়ের জন্য। এই একটিমাত্র ব্যতিক্রম ঘটালেন তিনি। ফলে মমতার রামবকুনি।

ছোট দু'টি ছেলে পুকুরে স্নান করছিল। মমতাকে দেখামাত্র তারা বিলকুল উলঙ্গ অবস্থাতেই ছুটে আসছে। হাত তুলে নমস্কার করছে মমতাকে! মমতাও নমস্কার করছেন ঐ দুটি ছেলেকে। দুই অপু। মমতাকে দেখে তাদের এত উৎসাহ হয়েছে যে কিছু একটা পরে নেওয়ার কথাও মাথায় আসেনি তাদের। কতই বা বয়স। ছোট্ট দুটি ছেলে। তাদের গায়ের

রং, তাদের হাসি, তাদের মুখভরা আনন্দ কী সাবলীলভাবে মিশে যাচ্ছে গ্রামবাংলার রঙের সঙ্গে, রোদ্দুরের সঙ্গে। দুত্তেরিকা, আমার চোখে জল আসছে যে। আমি লুকিয়ে চোখ মুছছি। বিজয় আমায় আড়চোখে লক্ষ্য করছেন। তাঁর মুখে অদ্ভুত এক হাসি। পলিটিক্সের কিচ্ছু বুঝি না আমি। হঠাৎ বলে ফেলছি—এই মমতা, তুমি সমাজবাদী দলের সঙ্গে মিলে কিছু একটা করো না।

মমতা খিলখিল করে হাসছেন।

আমি : মোদ্দা কথা, বিজেপি থেকে দূরে থাকো এই বাংলায়।

মমতা : কবীরদা, তুমি তো দেখেছ, কৃষিজমি-রক্ষা কমিটিতে আমি ঢুকতে দিইনি ওদের।

আমি : আমি অবশ্য পলিটিক্সের কিছুই বুঝি না। তবু মনে হয়, বিজেপিকে এড়িয়ে চলাই ভাল। কী জানি। সংসদীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে তোমাদের আবার কত রকম কম্‌পালশান থাকে। আমি তার কী বুঝি।

মমতা : দেখি কী হয়। উত্তরপ্রদেশের ইলেকশনটা হোক।

ব্যাস্‌। আমার এক্তিয়ারের বাইরে চলে গেল—উত্তরপ্রদেশের ইলেকশন। আমি চুপ।

মমতা : এই কবীরদা, বিস্কুট খাবে? কানন, সকলকে বিস্কুট দাও না! কানন, অর্থাৎ শোভন চট্টোপাধ্যায়।

মমতার সঙ্গে যখনই গাড়িতে করে কোথাও গিয়েছি শোভন থেকেছেন সঙ্গে। শান্ত। একটি কথাও বলেননি। মমতা বললে আমায়, আমাদের বিস্কুট, ছোট ছোট কেক, চা এইসব খাইয়েছেন। তাঁর সঙ্গে একটা ভাল ক্যামেরা দেখেছি। মমতার ছবি তুলছেন তিনি থেকে থেকেই। জরুরি কাজ, ডকুমেন্টেশন। একদিন হয়তো শোভন চট্টোপাধ্যায় এই ছবিগুলি প্রকাশ করবেন। দেখার মতোই হবে।

গাড়ির বাঁদিক থেকে ছুটে আসছেন এক দল মেয়ে, নানান বয়সের। 'দিদি, দিদি' করতে করতে মমতার হাত ধরছেন। একজন মমতার হাতে তুলে দিচ্ছেন বড়ি। গয়না বড়ি। কথা শুনে বুঝতে পারছি মমতা এই পরিবারগুলিকে ভাল চেনেন। ওদিক থেকে ছুটে আসছেন কিছু বয়স্ক মানুষ। একজন প্রায় কাঁদতে কাঁদতে মমতার পাশে দাঁড়িয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে

বলছেন—দিদি, তুমি ছাড়া আমাদের আর কে দেখবে বলো তো? আমাদের সামান্য জমিজমা, সব নিয়ে নেবে ওরা। দিদি, আমাদের বাঁচাও।

বাংলার এই কৃষকের মাথায় সাদা টুপি। মুখে সাদা দাড়ি। একই কথা শুনছি আরও অনেকের মুখে। মমতাকে স্বাগত জানাচ্ছেন— হাসিমুখে। ঘরের মেয়ে ঘরে এল যে। ছেলেবুড়ো নির্বিশেষে সবাই হাসছে। তার পরেই সরকার আর সি পি আই এমের বিরুদ্ধে অনুযোগ। তবে তার সবটাই তাঁদের অস্তিত্বের বিপন্নতার কারণে। সকলেই জেনে গিয়েছেন সি পি আই এম দল, বামসরকার চাষের জমি, থাকার জমি ছিনিয়ে নেবে অন্য কী-সবের জন্য। সকলের মনে ভয়। মারাত্মক ভয়। সকলের কথা শুনেই বুঝতে পারছি তাঁরা মনে করেন মমতাই তাঁদের একমাত্র ভরসা। 'দিদি, তুমি ছাড়া আর কে ভাবে আমাদের কথা!'

নীরবে দেখে যাচ্ছি, শুনে যাচ্ছি সব।

গাড়ি এসে পড়ছে একদল মানুষের কাছে। গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াচ্ছেন এক প্রবীণ মুসলমান কৃষিজীবী। মমতার জন্য তিনি দোয়া চাইছেন আল্লাহর। তাঁর পাশেই এক হিন্দু মহিলা দাঁড়িয়ে শাঁখ বাজাচ্ছেন। আশেপাশে অনেক মানুষ। আমি আমার দেশকে দেখছি।

আমার ক্যামকর্ডার নিয়ে গিয়েছি সঙ্গে। যত পারছি ভিডিও করে রাখছি। আমি খেয়াল করছি ছুটে আসা গ্রামবাসীরা তাঁর গাড়িতে অন্য কারও উপস্থিতি বরদাস্ত করছেন না। আমাকে ক্যামেরা হাতে দেখে সাংবাদিক ভাবছেন, কিছু বলছেন না। কিন্তু গাড়ির অন্য যাত্রীদের দিকে তাকাচ্ছেন চোখ পাকিয়ে। 'দিদি'র সঙ্গে এরা কারা।

এর বছরখানেক পরে এই ভিডিও দেখতে দেখতে 'মমতা যেখানে যায়' গানটি আমার মাথায় আসে। গানটির একটি মিউজিক ভিডিও আমি তৈরি করেছিলাম মমতার নন্দীগ্রাম সফর আর সিঙ্গুর অবরোধের ছবি লাগিয়ে লাগিয়ে। 'কী খবর গণতন্ত্র...'

নন্দীগ্রামে মমতার সভায় আমার স্থান হয়েছিল মমতার পাশেই। অনেকে ছিলেন সেই সভায়। আলাপ হল শিশির অধিকারীর সঙ্গে। অসীম বিশেষভাবে বললেন শিশিরদার কথা। শুভেন্দুও ছিলেন। সংক্ষিপ্ত, জোরালো ভাষণ দিলেন তিনি। এক কংগ্রেসী নেতা হঠাৎ হাসতে হাসতে

আমায় বললেন : 'এবারে এইসব জিন্‌স্‌-টিন্‌স্‌ ছেড়ে সাদা পাঞ্জাবি পায়জামা পরুন।'

সি পি আই এম ও পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত, নির্যাতিত একাধিক মহিলাকে আনা হয়েছিল। তাঁরা মমতাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছিলেন। মহাশ্বেতা দেবী পরে তাঁর একটি লেখায় লিখেছিলেন : 'মমতার বুকে মুখ রেখে কাঁদা যায়।'

সেই সভায় গান গেয়েছিলেন অসীম গিরি। আমিও ভাষণের সঙ্গে একটি গান গেয়েছিলাম। কিন্তু অসীম তাঁর গানের একটি মোক্ষম লাইনের সুর এমন বলিষ্ঠভাবে বেশ খানিকক্ষণ এক নিঃশ্বাসে ধরে রাখলেন যে হাজার হাজার গ্রামবাসী হাততালি দিয়ে উঠলেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

সামনেই বসেছিলেন সাংবাদিকরা, ক্যামেরা-প্রকৌশলীরা। তাঁদের অনেকেই আমার চেনা। সভা শেষ হওয়ার পর তাঁদের কেউ কেউ আমায় ডাকছেন কথা বলবেন বলে। আমি সামনে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতেই মমতা আমার পেছনে এসে আমায় তাড়া দিচ্ছেন—ফেরার তাগাদা।

গাড়ি থেকে নেমে সিঁড়ি বেয়ে মঞ্চে ওঠার সময়ে যেমন, সভার শেষে মঞ্চ থেকে নেমে গাড়িতে ওঠার সময়েও তেমনি—প্রচণ্ড ভীড়ের চাপ। মমতার দেহরক্ষীরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। আমিও চেষ্টা করছি মমতার গায়ে যাতে ধাক্কা না লাগে। আর মমতা সমানে আমাকে ঠেলছেন তাঁরও আগে মঞ্চে ওঠা, মঞ্চ থেকে নেমে গাড়িতে ওঠার জন্য। যত বলছি (তুমুল চিৎকার ও স্লোগান চারদিকে) 'তুমি আগে ওঠো।' ততই তিনি বলছেন, 'না, আগে তুমি।'

যতদূর মনে পড়ছে ফেরার সময়ে অসীম মমতার গাড়িতেই উঠেছেন। রাস্তার দুই পাশে পরপর বাস, ট্রাক। মমতার সভায় যোগ দিতে মানুষ দূর দূর থেকে এসেছেন। এবারে তাঁরা ফিরবেন। চারদিক থেকে জয়ধ্বনি, নমস্কার। প্রতিটি নমস্কার ফিরিয়ে দিচ্ছেন মমতা। সেই সঙ্গে প্রায় প্রত্যেকটি বাসের চালককে চিৎকার করে বলছেন গাড়ি সাবধানে চালাতে, আস্তে চালাতে। শুধু চালকদের নয়, সকলকে বলছেন—আস্তে যেও, দেখে চালিও...

আমরা চুপ করে দেখছি। আমি ভিডিও তুলে যাচ্ছি। অসীম থেকে

থেকেই বলে চলেছেন—এ-দেশে আর একজন নেতা আছে এই রকম? আর কেউ এত স্নেহ করে সাবধান করে দেবে সাধারণ লোকদের, সমর্থকদের?

মমতার গাড়ির চালকটিও দেখার মতো। প্রতিটি বাসের সামনে প্রায় দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন। গাড়ি চালাচ্ছেন অতি সাবধানে। গাড়ির সামনে লোক এসে পড়ছে হুমড়ি খেয়ে। দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে শুধু নমস্কার, নমস্কার। মমতার ঠিক পেছনে বসে সব দেখে যাচ্ছি। তাঁর দেহের ভাষাটাই আলাদা। কখনও হেলান দিয়ে বসছেন না। সোজা হয়ে বসে আছেন। কথা বলার জন্য ঝুঁকে পড়ছেন সামনের দিকে, মুখ বাড়িয়ে দিচ্ছেন জানলা দিয়ে।

ফিরতি পথে যত্নটা এবারে সহযাত্রীদের জন্য। সবার দিকে নজর। সেই সঙ্গে কথার তুবড়ি। পাঁচ সেকেন্ডও চুপ করে থাকেন কিনা সন্দেহ। কথার ফাঁকে ফাঁকে : 'কানন, খাবার বের করো। কেকগুলো দাও। টফি আছে। দাও সকলকে।' নীরবে আজ্ঞা পালন করে চলেছেন শোভন চট্টোপাধ্যায়।

সম্ভবত ২০০৪ সালে 'তারা'র 'লাইভ দশটা'য় অনুষ্ঠানে কলকাতার জল সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনার জন্য শোভন চট্টোপাধ্যায়কে পেয়েছিলাম অতিথি হিসেবে। মেয়র-ইন-কাউন্সিল। দর্শকরা সমানে ফোন করে জল সরবরাহ বিষয়ে নানান কথা জানতে চাইছিলেন। দুটি টেলিফোন লাইনে মুহুর্মুহু ফোন আসছিল। অক্লান্তভাবে প্রতিটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি, একেবারে খুঁটিনাটি বিষয়েও। বুঝেছিলাম নিজের বিষয়ে কতটা চোস্ত ও ওয়াকিবহাল তিনি। জনৈক দর্শক প্রশ্ন করতে গিয়ে নিজের এলাকায় জল সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পর্কে ভুল তথ্য দিলেন। শোভন চট্টোপাধ্যায় সঙ্গে সঙ্গে ভুল শুধরে দিলেন।

২০০৭ সালের ১৩ই মে কলকাতার উত্তম মঞ্চে কসমিক হারমোনি সংস্থার উদ্যোগে কবি জয় গোস্বামী আর আমি 'কবি ও কবিয়াল' নামে একটি অনুষ্ঠান করলাম। জয় পড়লেন তাঁর লেখা কবিতা, আমি গাইলাম গান। এই যুগলবন্দীর মূল বিষয় ছিল প্রতিরোধ। অনুষ্ঠান থেকে যে টাকা উঠল শেখ সুফিয়ান নন্দীগ্রাম থেকে এসে সেই টাকা নিয়ে গেলেন।

নন্দীগ্রামের কয়েকজন মহিলাকে নিয়ে মঞ্চে উঠলেন তিনি। আমরাও ছিলাম মঞ্চে। সি পি আই এম এবং এস এফ আই-ও উপস্থিত ছিলেন, তবে উত্তম মঞ্চের বাইরে, রাস্তার দু'পাশে দেওয়ালে সাঁটা পোস্টারে। জয় ও আমার বিরুদ্ধে আজেবাজে কথা লিখে শাসক দলের ছাত্রশাখা অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপন করছিলেন তাঁদের কায়দায়।

মেট্রো চ্যানেলে সহনাগরিকদের মুক্ত মঞ্চের সভায় আলাপ হয়েছে টেলিভিশন সাংবাদিক অনুপম কাঞ্জিলালের সঙ্গে। তিনি তখন ২৪ ঘণ্টা চ্যানেলের কর্মী, তিতিবিরক্ত ঐ চ্যানেলের সি পি আই এম-পন্থী নীতি ও অপসাংবাদিকতার কারণে। অল্প কিছুক্ষণ কথা বলেই বুঝেছি অনুপম একজন সিরিয়াস সাংবাদিক, যিনি যথাসম্ভব সৎ সাংবাদিকতা করতে চান—কারও বশংবদ না হয়ে। সেই সময়ে গোটা সমাজের মতো সাংবাদিকতার ক্ষেত্রটাও ভাগ হয়ে যাচ্ছে সি পি আই এম-পন্থী ও সি পি আই এম-বিরোধী এই দুই ভাগে। কোনও কোনও মিডিয়া হাউস আবার ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানির কৌশল অবলম্বন করে অনুষ্ঠান সাজাচ্ছে। 'তারা' চ্যানেল যেমন বেশ কয়েক মাস সি পি আই এমকে রেয়াত না করে অনুষ্ঠান চালালেও ১৪ মার্চের নন্দীগ্রাম গণহত্যার পর হঠাৎ পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতিটাকে এড়িয়ে অভিষেক বচ্চনের বিয়ে, তাঁর স্ত্রীর হাতে পায়ে মেহেন্দির কারুকাজ ইত্যাদি বিষয়ে আত্মনিয়োগ করেছে। আমাকে দিতে হয়েছে ইস্তফা। অনুপম কাঞ্জিলাল তেমনি হাঁফিয়ে উঠেছেন ২৪ ঘণ্টা চ্যানেলের সি পি আই এম ঘেঁষা অনুষ্ঠানের জন্য। চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি খুঁজছেন ঠিকঠাক সাংবাদিকতা করার সুযোগ। তিনি চাইছেন আমার সঙ্গে কাজ করতে। আর এক তুখোড় কিন্তু চলতি সাংবাদিকতার ধরনধারনে বীতশ্রদ্ধ সাংবাদিক রীতেন রায়চৌধুরীকে নিয়ে অনুপম আসছেন আমার বাড়ি আলোচনা করতে—যদি আমরা তিনজন মিলে স্বাধীনভাবে, কারও পোঁ না ধরে টেলিভিশন সাংবাদিকতার কোনও সুযোগ কোথাও পাই। কিন্তু কোথায়?

গণ-আন্দোলনের খবর ঠিকঠাক দিতে হলে একটা আলাদা চ্যানেল দরকার। মমতার সঙ্গে এ নিয়ে কথা হচ্ছে আমার। মমতাও মানছেন যে

নিজেদের একটা চ্যানেল থাকা জরুরি। কিন্তু টাকা কোথায়? মমতা বলছেন 'চ্যানেল হলে তুমিই হবে পরিচালক। কিন্তু তার নীতি কী হবে?'

আমি : "Anti-CPIM, non-anti-Mamata."

মমতা : মানে?

আমি : মানে, অবশ্যই সি পি আই এম বিরোধী। অন্যদিকে, এ-বছর আষাঢ় মাসে বৃষ্টি হল না কেন—কারণ মমতা—এই ধরনের মানসিকতা থাকবে না। গত কিছু বছরে এই রাজ্যের বামপন্থীদের প্রায় বাঁধা বুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে খারাপ কিছু হলেই অমনি মমতা দায়ী। বলা বাহুল্য, এটা হবে না। কিন্তু তোমার কোনও জন-প্রতিনিধি যদি, ধরো, দুর্নীতি করেন তো আমাদের চ্যানেল সেই খবর দিতে ছাড়বে না। কেউ যেন না বলতে পারে আমাদের চ্যানেল মমতার চ্যানেল—মমতার ব্যাপারে পক্ষপাতদুষ্ট। সেরকম কিছু হলে চ্যানেলের বিশ্বাসযোগ্যতা থাকবে না। আমরা তখন সি পি আই এমের বিরুদ্ধে ঠিকমতো লড়াই করতে পারব না। ভালো সাংবাদিকতাই হবে আমাদের হাতিয়ার।

মমতা চুপ করে ভাবছেন।

আমি ভাবছি 'তারা' চ্যানেলে ইস্তফা দেওয়ার পর মমতার পাঠানো সেই টেক্সটার কথা : 'স্বাধীনভাবে সাংবাদিকতা করার অধিকার তোমায় ফিরিয়ে দেবই।'

কিছুদিন পরে মমতা আমায় বলছেন একটা চ্যানেল চালাতে গেলে কত টাকার পুঁজি দরকার সেই আইডিয়া তাঁকে দিতে। অনুপম ও রীতেনের কাছে কথাটা পাড়ছি। আমাদের বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি আলোচনার ভিত্তিতে ক'দিনের মধ্যেই রীতেন একটা প্রজেক্ট তৈরি করে এনে দিচ্ছেন আমায়। তাঁর হিসেব আমার পছন্দ। জেলার সংবাদদাতারা কলকাতার চ্যানেলগুলোর জন্য কাজ করে এখন যা পান তার চেয়ে যথেষ্ট বেশি পাবেন। পরিচালক হিসেবে আমার মাইনে হবে কুড়ি হাজার টাকা। তার এক পয়সা বেশি নয়। এখানকার চ্যানেল পরিচালকরা এর অন্তত চার গুণ মাইনে পান। চ্যানেল চালানোর খরচের যে হিসেব রীতেন দিয়েছেন তা দস্তুরমতো ব্যতিক্রমী। মমতাকে এর একটা কপি দিচ্ছি আমি। মমতা একদিন বিধানসভায় বিরোধী দলীয় নেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অ্যাকটিভিস্ট দোলা সেনকে পাঠাচ্ছেন

আমার বাড়িতে ঐ প্রজেক্ট নিয়ে কথা বলার জন্য। অনুপম কাঞ্জিলাল ও রীতেন রায়চৌধুরি চান না, দোলা সেন ঐ মুহূর্তে জানুন যে তাঁরা এই উদ্যোগে আছেন। তাই তাঁরা আলোচনায় হাজির নেই। পার্থ আর দোলা এসেছেন। হিসেবনিকেশের ব্যাপার পার্থ ভাল বোঝেন। দোলা? ঠিক জানি না। পার্থ হিসেবটা দেখছেন এবং বলছেন যে ব্যাপারটা আরও খতিয়ে দেখতে হবে। পরে, মমতা আমায় জানাচ্ছেন তিনি এমন কাউকেই চেনেন না যে কিনা প্রয়োজনীয় পুঁজির জোগান দিতে পারবে।

আন্দোলনের পক্ষ নিয়ে প্রচার করা ও সি পি আই এমের বিরোধিতা করার জন্য নিজেদের একটা চ্যানেল যে দরকার সে-ব্যাপারে সুনন্দ সান্যাল ছিলেন সচেতন। সেই সময়ে এই বিষয়টি নিয়ে অনেক ভাবনাচিন্তা করেন তিনি। মাঝেমাঝেই আমায় ফোন করতেন এবং এ নিয়ে আলোচনা করতেন। মনে হত সুনন্দদা তাঁর চেনাজানা মানুষদের মধ্যেও খোঁজ করে দেখছেন চ্যানেলের জন্য লগ্নি করতে পারেন এমন কেউ আছেন কিনা। সুনন্দদা এমনকি এও ভাবছিলেন—গোটা একটা চ্যানেল যদি নাও পাওয়া যায় তাহলে চলতি কোনও চ্যানেলে আমাদের মতো করে একটা অনুষ্ঠান চালানো যায় কিনা—অর্থাৎ সময়ের স্লট কিনে নিয়ে।

২০০৭ সালের জুন মাস নাগাদ 'তারা' চ্যানেলের দেবজ্যোতি চক্রবর্তী আমায় ফোন করে জানালেন চ্যানেল কর্তা রথীকান্ত বসু একটি কাজের ব্যাপারে আমার সঙ্গে কথা বলতে চান। খবর বিভাগের কন্‌সাল্‌টান্ট হিসেবে আমি 'তারা'য় যোগ দিলাম আবার। কিন্তু যে দায়িত্ব আমি নিলাম তার পরিসরে গণ-আন্দোলনমুখী কোনও আলোচনার অনুষ্ঠান করা সম্ভব ছিল না।

সল্টলেকে 'তারা'র অফিস যেখানে সেই পাড়ায় আমাদের দুই সহকর্মীর সঙ্গে স্থানীয় কিছু লোকের ঝগড়া হল এক সন্ধেবেলা। খবর পেয়ে আমরা ছুটে গেলাম। দুই পক্ষেরই কেউ কেউ একটু মাথা গরম করছিলেন, কিন্তু হাতাহাতি বা ধাক্কাধাক্কি কিছুই হয়নি। 'তারা'র সাংবাদিক সায়নদেব বরং তাঁর সহকর্মীদের চিৎকার করে বলছিলেন, কেউ যেন মাথা

গরম না করে, মারামারি না করে। খবর বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট দেবজ্যোতি চক্রবর্তীও সকলের সঙ্গে গিয়েছিলেন। আমরা বুঝতে পারছিলাম ওখানে সি পি আই এমের লোকজন আছে এবং আমাদের চ্যানেলের ওপর তারা রেগে আছে, আমার ওপর তো বটেই। সাংবাদিক সায়নদেবের ওপরেও রাগ ছিল সি পি আই এমের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনশন, সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের গণ-প্রতিরোধ ও অভ্যুত্থান নিয়ে 'তারা'র নানান খবর ও অনুষ্ঠান ছিল সরাসরি শাসক দলের বিরুদ্ধে।

এই ঘটনার সূত্র ধরে সি পি আই এম বা সিটুর (CITU) কাডাররা তার পরের দিন, ১৬ই জুলাই, আমাদের অফিসে হামলা করল এবং অনির্বাণ ও সায়নদেবকে হাতের কাছে পেয়ে তাদের মারধোর করল। ঘটনাটা যখন ঘটছে, তখন চেঁচামেচি আর গালাগাল শুনে আমি চেষ্টা করছিলাম সিঁড়ি দিয়ে নেমে একতলায় যেতে। আমার ছেলেরা মার খাচ্ছে আর আমি ওপরে বসে আছি, কিছু করতে পারছি না, এ আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। অন্য কর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে শারীরিকভাবে আটকে দিলেন। সি ই ও অমিত চক্রবর্তী আমায় বললেন, লাইভ স্টুডিয়োয় গিয়ে সঞ্চালকের আসনে বসতে।

আক্রমণ চলছে আর আমি 'তারা'র খবরের সঞ্চালকের আসনে বসে অনুষ্ঠান পরিচালনা করছি। অস্বীকার করব না, আমার হাত পা নিশপিশ করছিল। 'তারা'র দপ্তর আক্রান্ত—এই খবর ছড়িয়ে পড়ায় অনেকে, এমনকি বামফ্রন্টের আর এস পি দলের নেতাও ঘটনাটাকে ধিক্কার জানালেন। সোচ্চারে ধিক্কার জানালেন আরও অনেকে, যাঁদের মধ্যে রাজনীতির বাইরের মানুষও ছিলেন। খবর পেয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বিগ্ন হয়ে 'তারা'র অফিসে চলে এলেন। গটগট করে সটান স্টুডিয়োতে ঢুকলেন মমতা। টানা এক ঘণ্টা মমতা আমার সঙ্গে লাইভ ক্যামেরার সামনে। এ এক অভূতপূর্ব এবং অভাবনীয় ঘটনা। চারদিক থেকে মানুষ ফোন করছেন মমতাকে 'তারা'র পর্দায় দেখে। মমতা আর আমি দু'জনেই উত্তর দিচ্ছি। মমতা কিন্তু একবারও তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে কিছু বলছেন না। বলছেন তিনি সি পি আই এমের গুণ্ডামি, গা-জোয়ারির বিরুদ্ধে, স্বাধীন সাংবাদিকতার পক্ষ নিয়ে।

বলা বাহুল্য, ঘটনাটি নিয়ে রাজ্যময় শোরগোল পড়ে যাচ্ছে। স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'তারা'র স্টুডিয়োয় সঞ্চালকের পাশে বসে 'তারা'র সাংবাদিকদের ওপর সি পি আই এম কাডারদের আক্রমণকে ধিক্কার জানাচ্ছেন। মার-খাওয়া দুই কর্মী সায়নদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনির্বাণ সাধুকে স্টুডিয়োয় আনা হল। অনির্বাণের ঠোঁট থেকে তখনও রক্ত পড়ছে।

'তারা'র কর্তৃপক্ষের কী আক্কেল, স্বয়ং মমতা যেখানে তাঁদের স্টুডিয়োয় সেখানে সিটুর (CITU) নিতান্ত এক জেলাস্তরের নেতাকে তাঁরা স্টুডিয়োয় আসতে দিলেন—ক্ষমা চাওয়ার জন্য। অল্পের ওপর দিয়ে পার পেয়ে গেলেন সি পি আই এমের শ্রমিক সংগঠন, বড় কোনও নেতাকে পাঠাতে হল না। রীতিমত রাগ হচ্ছিল আমার। মমতাকে যদি আমি একটুও চিনে থাকি, সেদিন তিনি রাজনীতি করতে 'তারা'র স্টুডিয়োতে ছোটেননি। 'তারা' চ্যানেল এক সময়ে তাঁর অনশন মঞ্চ সম্পর্কে, সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের আন্দোলন বিষয়ে ঠিকঠাক খবরাখবর দিয়েছিল। সেই কথা ভেবেই তিনি স্টুডিয়োতে গিয়েছিলেন, অতক্ষণ বসেছিলেন ক্যামেরার সামনে। তাছাড়া, আমার ধারণা, আমি সেখানে ছিলাম, সায়নদেব ও অনির্বাণ মার খেয়েছেন, তাঁদের রক্তপাত ঘটেছে—এইসব কারণেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছিলেন সংহতি জানাতে। অথচ সিটুর এক ছোট মাপের নেতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে লাইভ ক্যামেরার সামনে বসে ক্ষমা চাইলেন সি পি আই এম বা সিটুর কাডারদের গুণ্ডামির জন্য।

মমতার সঙ্গে মুকুল রায় ও মদন মিত্রও গিয়েছিলেন। রাতে, 'তারা'র কর্মীদের যখন অফিসের গাড়িতে করে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে, মদন মিত্র তখন একটি গাড়ি নিয়ে 'তারা'র গাড়ির পেছনে পেছনে আসেন—পাছে সি পি আই এমের মস্তানরা আবার কিছু করে বসেন অত রাতে। আমি বারবার বারণ করা সত্ত্বেও মদন আমার বাড়ি পর্যন্ত আসেন। অফিসের গাড়ি থেকে নেমে আমি বাড়ির গেট খুলে ঢোকার পরেও মদন তাঁর গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। আমি বাড়ির ভেতরে ঢুকে যাওয়ার পর তবেই মদন বিদায় নেন। তখন মাঝরাত। আমিই ছিলাম শেষ কর্মী যাকে অফিসের গাড়ি বাড়িতে নামিয়ে দিল। 'তারা'র কর্মীদের প্রত্যেককে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন তৃণমূল নেতা মদন মিত্র ও তাঁর সঙ্গীরা। এ আমি ভুলব না।

২০০৭ সালের মার্চ থেকে অক্টোবরের মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কৃষিজমি-রক্ষা কমিটির আটটি সভা হয়। আমি তার সবকটিতে থাকতে পারিনি। এইসব সভায়, দেখেছি, মমতাই একমাত্র বক্তা। যা বলার উনিই বলছেন, বাকি সকলে চুপ করে শুনছেন। একমত হোন বা না হোন—চুপ। সি পি আই এম বিরোধী গণ-আন্দোলনের এই অধ্যায়ে মমতার নেতৃত্ব নিয়ে আমার কোনও সমস্যা ছিল না। কিন্তু তিনি ছাড়া আর কারও কোনও মত নেই—এই ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছিল না। মমতার সঙ্গে ততদিনে আমার এক ধরনের বন্ধুতা গজিয়ে উঠলেও এই বিষয়টি নিয়ে কোনও কথা তাঁকে বলিনি। কৃষিজমি রক্ষা কমিটির সভায় আমি দু'একবার প্রস্তাব দিয়েছিলাম—কয়েক হাজার মানুষ মিলে চলো, আমরা মিছিল করে সিঙ্গুরে যাই, সত্যাগ্রহ করি। প্রকাশ্য জনসভায় সাধারণ গ্রামবাসী ও নাগরিকরা এই প্রস্তাবের সমর্থনে বিপুল করতালি দিলেও নেতারা গম্ভীর মুখে বসে থেকেছেন—না করেছেন সমর্থন, না করেছেন প্রত্যাখ্যান।

একেই বলে 'রাজনীতি', আমি যার লোক নই। আমার কার্যকারিতা : জনসভায় গান গেয়ে, কথা বলে জনতার ওপরে প্রভাব ফেলা, গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো তাঁদের জানানো, দরকার হলে তাঁদের খেপিয়ে তোলা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যখন পেরেছেন, এই কাজেই ব্যবহার করেছেন আমাকে, আমার মতামত জানতে চাননি, সেই প্রয়োজনও তাঁর ছিল না। এই ব্যাপারটা বুঝতে অনেক সময় লেগেছে আমার। আমার গান, গানের পর গান, তার কথা-সুর-ছন্দ, সেই গান মঞ্চে পরিবেশন করার নিজস্ব আঙ্গিক, টেলিভিশন চ্যানেলে প্রথমে 'লাইভ দশটা'য় তারপর 'মতামত'-এ আমার লাইভ আলোচনা অনুষ্ঠান পরিবেশনার ধরন, আমার বে-পরোয়া, নির্ভীক চরিত্র, প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা, সরকার-বিরোধিতা, আন্দোলনমুখিতা—সব মিলিয়ে আমার যে ভাবমূর্তি, কেউ কেউ চেষ্টা করেছেন সেটাকে কাজে লাগাতে, মমতাও চেষ্টা করেছেন। মমতার চেষ্টা সবচেয়ে জোরদার ও দীর্ঘস্থায়ী। কিন্তু সাংবাদিক ও অ্যাকটিভিস্ট হিসেবে আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা (ন' এর দশকের শেষদিকে রাজারহাটে জমি বাঁচানোর লড়াই-এ আমি যখন সামিল ছিলাম তখন কোনও রাজনৈতিক দল বা নেতাই তার ধারে-কাছেও ছিলেন

না—সকলের নাকের ডগা দিয়ে হাজার হাজার কৃষিজীবী খোয়ালেন সর্বস্ব, জমি-সদাগর, রিয়েল-এস্টেট-কারবারি আর প্রোমোটারদের কবলে চলে গেল হাজার হাজার একর জমি) থেকে যে কিছু নেওয়ার আছে সেই বোধের ছিটেফোঁটাও তাঁর বা অন্য কারও মধ্যে দেখিনি। এ থেকে আমার উচিত ছিল দু'একটা মৌলিক সিদ্ধান্তে আসা। সেই কাজটি আমি করিনি। কেন করিনি? কোনও কিছু পাওয়ার আশায়? স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরই সবচেয়ে ভাল জানার কথা যে কোনও কিছু পাওয়ার আশায় আমি গণ-আন্দোলনে আসিনি। তাঁরই সবচেয়ে ভাল জানার কথা যে সি পি আই এমের বিরুদ্ধে রাজ্যব্যাপী আন্দোলনে তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার পেছনে আমার পার্থিব কোনও স্বার্থ ছিল না।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের বছর বারো আগে আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে কানোরিয়া শ্রমিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলাম। তখন আমি ছিলাম শুধুই সঙ্গীতশিল্পী। বিদ্রোহী শ্রমিকদের এতই কাছের মানুষ ছিলাম আমি যে, শ্রমিকরা যেদিন কারখানার মূল দরজা ভেঙে কারখানার দখল নেন সেদিন 'বাইরে'র লোক হলেও আমি উপস্থিত ছিলাম। আমাকে আগেই জানানো হয়েছিল। ভোরবেলা চলে গিয়েছিলাম কানোরিয়ায়। দখল নেওয়া শ্রমিকদের সামনে প্রথমে প্রফুল্ল চক্রবর্তী ভাষণ দিয়েছিলেন, তারপরেই আমি। আমার মনে আছে—ঐ শীতের সকালে ঠাণ্ডা মাটিতে শান্ত হয়ে বসে থাকা শ্রমিকদের আমি বলেছিলাম—আপনারা ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। দীর্ঘকাল অচল থাকার পর কারখানার চুল্লি যখন আবার জ্বাললেন শ্রমিকরা, আমি তখন কারখানার দেওয়ালের বাইরে একটা দাওয়ায় বসে হারমোনিয়ম বাজিয়ে পরপর রবীন্দ্রনাথের গান গাইছিলাম। লাউডস্পীকারে সেই গান শুনতে শুনতে শ্রমিকরা কাজ করছিলেন কারখানায়।

নানান জায়গায় গান গেয়ে গেয়ে কয়েক মাস ধরে টাকা তুলেছিলাম শ্রমিকদের জন্য। যখন দেখলাম আন্দোলনের পরিসরে অন্য কীসব হচ্ছে, আন্দোলনের এক নেতা যখন আমার বাড়ি এসে আমায় প্রস্তাব দিলেন : 'এবারে আপনি একটা অনুষ্ঠান করুন যেখানে প্রত্যেক শ্রোতাকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে হবে'; যখন দেখলাম একটি পত্রিকা-কেন্দ্রিক কিছু মানুষ যেন ঠিক করে ফেলতে চাইছেন আন্দোলনের গতিপথ কী হবে; যখন বুঝতে

পারলাম এই আন্দোলনে শ্রমিকদের ভূমিকা কমে যাচ্ছে, তখনই সরে এলাম আমি ঐ জায়গা থেকে।

কানোরিয়া শ্রমিক আন্দোলনের ছ'বছর পর রাজারহাট জমি বাঁচাও আন্দোলনের অ্যাকটিভিস্ট ও সম্পাদক নীলোৎপল দত্তর আমন্ত্রণে আমি ঐ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ি। সত্যি বলতে, রাজারহাটে পশ্চিম বাংলার বামফ্রন্ট সরকার তাঁদের পুলিশ ও সি পি আই এমের কাডারবাহিনীর সাহায্যে কীভাবে যে কৃষি ও মৎস্যজীবীদের জমি হাতিয়ে নিচ্ছিলেন তার প্রায় কিছুই আমি এক সময়ে জানতাম না। এর প্রধান কারণ আমি ছিলাম সর্বক্ষণের সংগীতশিল্পী, অ্যাকটিভিস্ট না।

রাজারহাটে আজ যেখানে ব্যাপক নগরায়ণ হচ্ছে সেই বিরাট এলাকার এক লক্ষ তিরিশ হাজার মানুষ জীবিকাচ্যুত হন। এঁরা সকলেই ছিলেন কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী। রাজ্য সরকার তাঁদের কাঠাপিছু মাত্র ছ'হাজার টাকা দেন। রামকৃষ্ণ মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি, যাঁর বাড়ি ছিল বালিগড়ি মৌজায়, তাঁর জমি দিয়ে দিতে বাধ্য হন। শাসকদলের বন্দুকের নলের সামনে তাঁর এ ছাড়া আর অন্য উপায় ছিল না। রামকৃষ্ণ মণ্ডল কিন্তু টাকা পাননি। বাম সরকারের হাতে নিজের জমি তুলে দিয়ে এসে কপর্দকহীন, অপমানে ধুলোয় মিশে যাওয়া রামকৃষ্ণবাবু গলায় দড়ি দেন। এই খবর আমি আজ, ৮ই জানুয়ারি, ২০১১ তারিখের সকালে নীলোৎপলবাবুর কাছ থেকে পেলাম।

নিজের কোনও পার্থিব স্বার্থে, নিজে কিছু গুছিয়ে নেওয়ার জন্য যে আমি সিঙ্গুর নন্দীগ্রামে আন্দোলনে অংশ নিইনি কিছুটা সেই কথা বলতেই আমি অন্য দু-একটি আন্দোলনের কথা লিখেছিলাম আমার সংশ্লিষ্টতার সূত্রে। রাজারহাট বাঁচাও আন্দোলনের কথা এই গ্রন্থের প্রথম পাণ্ডুলিপিতে লিখিনি (আমি-আমির) বাহুল্য এড়ানোর জন্য। কিন্তু সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম আন্দোলনের মতো রাজারহাট আন্দোলনও কৃষিজমি রক্ষার লড়াই এবং তা আরও আগে শুরু হয়েছিল। শুধু মাত্র আমার জড়িত থাকার কারণে নয়, এই কারণেও এই আন্দোলনের উল্লেখ যে জরুরি, নীলোৎপল দত্ত "নিশানের নাম তাপসী মালিক"-এর প্রথম মুদ্রণটি পড়ে আমায় জানান।

রাজারহাট এক বিশাল জলাভূমির অন্তর্গত। জলাভূমি সংরক্ষণ বিষয়ক রামসার আন্তর্জাতিক চুক্তির আওতায় এটি পড়ে। ভারত সেই চুক্তিতে সই

করেছিল। পৃথিবী নামে এই গ্রহের পরিবেশ ও জলহাওয়ার ভারসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে কোনও সরকারেরই উচিত নয় এই অঞ্চলে ব্যাপক নগরায়ণ করা। বামফ্রন্ট সরকার তা করেছেন এবং করে চলেছেন। এটা করতে গিয়ে তাঁরা প্রথমত স্থানীয় কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবীদের কাঠাপিছু ছ'হাজার টাকা— এই নামমাত্র মূল্য ধরে দিয়েছেন। এই দাম মেনে নিতে বাধ্য করেছেন তাঁরা পার্টির কাডারবাহিনীর বাহুবল দেখিয়ে। অসহায় গ্রামবাসীরা প্রাণভয়ে সরকার ও সি পি আই এমের গা-জোয়ারি মেনে নিয়েছেন। সব তথ্যই রাজারহাট জমি বাঁচাও কমিটির সম্পাদক নীলোৎপল দত্তর কাছ থেকে পাওয়া। তাঁরই আমন্ত্রণে আমি ২০০০ সালের ২৫ জানুয়ারি বাগুইয়াটির সুখদা সিনেমা হলে গানের অনুষ্ঠান করেছিলাম জমি বাঁচানোর মামলার টাকা তোলার জন্য। যদ্দূর মনে পড়ে, ঐ অনুষ্ঠানে প্রতুল মুখোপাধ্যায়ও গান গেয়েছিলেন। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ শিক্ষক, কবি, অ্যাকটিভিস্ট তরুণ সান্যাল ও চলচ্চিত্রকার শতরূপা সান্যাল। রাজারহাট জমি বাঁচাও কমিটির মামলার টাকা তোলার জন্য গানের দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটি করেছিলাম ২০০১ সালের ৫ মে, জ্যাংড়ার আরতি সিনেমা হলে। নীলোৎপল দত্ত আমায় জানাচ্ছেন, আমি ছাড়া একমাত্র তরুণ সান্যাল, প্রতুল মুখোপাধ্যায়, স্বপন বসু (পল্লীগীতিশিল্পী) ও লোপামুদ্রা মিত্র সাড়া দিয়েছিলেন তাঁর আহ্বানে। সমান উল্লেখযোগ্য : সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম গণ আন্দোলনে যে দলগুলি সোৎসাহে জড়িয়ে পড়েন তাঁদের কাউকেই সেদিন পাশে পাননি রাজারহাটের সংগ্রামী মানুষরা। তৃণমূল কংগ্রেস এস ইউ সি আই কোনও দলই রাজারহাটের অসহায় গ্রামবাসীদের ডাকে সেদিন ফিরে তাকাননি। জানাচ্ছেন সম্পাদক নীলোৎপল দত্ত আজ, ৮ই জানুয়ারি, ২০১১। তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে যাবতীয় দলিলের ফাইল তুলে দিয়েছিলেন নীলোৎপল দত্ত, জানালেন তিনি। তারপর থেকে মমতা তাঁকে কিছু জানাননি।

কত হাজারবারের পর আকাশ দেখা যাবে
কতটা কান পাতলে তবে কান্না শোনা যাবে।

রাজারহাটে ধুপির বিল নামে ২০৯৫ হেক্টরের এক বিশাল জলাভূমি ছিল। পরিবেশ রক্ষার্থে প্রণয়ন করা সমস্ত আইন লঙ্ঘন করে, খোলা জায়গায় কোনও প্রকল্প গড়ে তুললে সমগ্র পরিবেশের ওপর কী প্রভাব পড়তে পারে

তার হিসেবের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে সি পি আই এম নেতৃত্বাধীন বাম সরকারের ঐ বিলটি বোজাতে শুরু করেন। তারপর—

নোয়ানো গাছ কোথায় গেল
পাড়ার পুকুর কে বোজালো
যুগের হাওয়া অন্য মনে
জমি বেচার টাকা গোনে।

আজ থেকে ১৭ বছর আগে লেখা আমার একটি গানের শেষদুটি লাইন।

আমাদের দেশে কটি রাজনৈতিক দল আছে যার শীর্ষস্থানীয় নেতারা তাঁদের প্রিয়তম জনের মাথায় হাত রেখে শপথ করে বলতে পারবেন তাঁদের দলের কেউ জমি বা ইমারতি ব্যবসায় লিপ্ত নন? শ্রেষ্ঠীদের কাছ থেকে একটি পয়সাও নেয় না এমন কটি সংসদীয় দল আছে?

২০০৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি, সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম আন্দোলন তখন পুরোদমে চলছে, রাজারহাটের আকন্দকেশরী মৌজার নিশিকান্ত মণ্ডলের জমি কেড়ে নেওয়ার পর তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর একটি ইটভাঁটা ছিল, সেখানে আড়াইশো শ্রমিক কাজ করতেন। ইটভাঁটাটি ডাইনামাইট দিয়ে ধ্বংস করা হয়। নীলোৎপলবাবু জানাচ্ছেন, নিশিকান্ত মণ্ডলকে আজও পাওয়া যায়নি।

২০০৯ সালে, যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে সি পি আই এমের বিরুদ্ধে তৃণমূল প্রতীকে ভোটে দাঁড়ানোর পর রাজারহাট বাঁচাও কমিটির তরফ থেকে নীলোৎপল দত্ত আমার সমর্থনে বেশ কিছু লিফলেট ছাপিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

এইখানে ১৯৯৪/৯৫ সালের একটি ঘটনা উল্লেখ করা দরকার। পেশাদার সংগীতশিল্পী হিসেবে আমি একাধিক বিজ্ঞাপনের গান তৈরি করে দিয়েছি, যেমন ১৯৯১ সালের লেক্সপো মেলা, ব্রিটানিয়া বিস্কুট, সাধনা দশন ইত্যাদি। ৯৪/৯৫ সালে কলকাতার এক অডিও-ভিজুয়াল সংস্থা আমাকে রাজারহাট এলাকায় একটি নতুন আবাসন-প্রকল্পের জন্য একটি বিজ্ঞাপন-গান তৈরি করে দেওয়ার বরাত দেন। পেশাদার সংগীতকার হিসেবে আমি গানটি তৈরি করে গেয়ে দিই। কবুল করছি, রাজারহাটে জমি-অধিগ্রহণ

বিষয়ে আমি তখন কিছুই জানতাম না। ১৯৯৭/৯৮ সালে বিশদ জানার পর আমার খারাপই লেগেছিল। ২০০০ সালে রাজারহাট বাঁচাও কমিটির নীলোৎপল দত্তর আহ্বানে তাঁদের মামলার জন্য গানের অনুষ্ঠান করতে গিয়ে ব্যাপারটি আমি বাগুইয়াটির সুখদা সিনেমা হলে সমাগত শ্রোতাদের খোলাখুলি জানিয়েছিলাম। তারপর গেয়েছিলাম রাজারহাটে বাম সরকারের জমি-অধিগ্রহণ, গ্রামবাসীদের ওপর বলপ্রয়োগ, গ্রামবাসীদের অসহায়তা, আবাদী জমিতে নগরায়ণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বাঁধা আমার গান "ইউসুফ খুব ভয়ে ভয়ে আছে, ভয়ে কাঁপে বনমালী"। এই গানটি আমার "নিষিদ্ধ ইস্তেহার" অ্যালবামে স্থান পায় (অগাস্ট, ১৯৯৮)।

২০১০ সালের শেষদিকে বাম সরকারের আবাসনমন্ত্রী গৌতম দেব রাজারহাটকে কেন্দ্র করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন আন্দোলনের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তার প্রায় চোদ্দ-পনের বছর আগে আমার তৈরি বিজ্ঞাপনের গানটি বেশ নাটকীয়ভাবে ব্যবহার করেন। তাঁর উদ্দেশ্য : তৃণমূলনেত্রী রাজারহাটে জমি-আন্দোলন করতে চাইছেন আর তাঁরই দলের এক সাংসদ, কবীর সুমন, রাজারহাট নিয়ে একটি গান গেয়ে, রেকর্ড করে বসে আছেন। সি পি আই এমের মন্ত্রীমহোদয় সম্ভবত ভালোই জানতেন যে ওটি একটি বিজ্ঞাপনের গান এবং ওটি একটি বিজ্ঞাপন-ভিডিওয় ব্যবহার করা হয়েছিল। নিষিদ্ধ ইস্তেহার অ্যালবামের (ইউসুফ খুব ভয়ে ভয়ে আছে) গানটি তিনি সম্ভবত শোনেননি। ওরকম একটি গানের খবর তাঁর রাখার কথা নয়। শুধু তিনি কেন, কোনও সংসদীয় দলের নেতারাই আমার সংগীতের খবর রাখেন না। কিন্তু কালেভদ্রে বোকাবোকা ভঙ্গিতে, সম্পূর্ণ ভুলভাল জায়গায় আমার কোনও একটি গানের কথা বলে ফেলেন। বেচারিরা।

তার পরেও কোনও কোনও শ্রমিক আন্দোলনের স্বার্থে গান গেয়েছি, টাকা তুলে দিয়েছি, কাজ করেছি। সেসব থেকে বাগিয়ে নিইনি কিছু। বাগিয়ে নেওয়া, বানিয়ে নেওয়ার ধান্দা থাকলে তো সি পি আই এমের সঙ্গেই হাত মেলানো যেত। তাতে, আর কিছু না হোক, মাসে নিয়মিত কিছু গানের অনুষ্ঠান করে কলকাতা শহরে বানানো যেত খান তিনেক ফ্ল্যাট। জনৈক নেতা তো সেরকম 'অফার' দিয়েওছিলেন। নেতাদের সামনে একটু জি-হুজুর করলেই কাজ হয়ে যেত হাসিল। কাজেই, নিজের কোনও কাজ

হাসিল করার জন্য বুড়ো বয়সে সি পি আই এম-বিরোধী আন্দোলনে যাইনি, সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের বিদ্রোহীদের, প্রতিরোধকারীদের পক্ষ নিইনি।

আসলে কোনও কিছু হিসেব মাফিক, অঙ্ক কষে করা আমার ধাতে নেই। তাই, ব্যবহৃত হচ্ছি—এটা বুঝতে পেরেও বেশি ভাবিনি, কারণ সাধারণ লক্ষ্য তখন সি পি আই এমকে যে করে হোক শাসনক্ষমতা থেকে সরানো।

আমার বন্ধু নির্বেদ রায়, যাঁর কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে কখনও কোনও কটূক্তি শুনিনি, ২০০৬ সাল থেকেই আমায় সাবধান করে দিতে চেষ্টা করেছেন কয়েকটি ব্যাপারে। শিক্ষিত, পরিশীলিত, রসিক নির্বেদ 'লাইভ দশটায়' ও 'মতামত'-এ যিনি প্রায়ই ছিলেন আমার এক প্রিয় অতিথি—আমায় বলতেন : 'একটু বুঝে চলুন।' এতদিনে বন্ধুবর নিশ্চয়ই বুঝেছেন যে বুঝেই যদি চলতাম তাহলে আমি কবীর সুমন না হয়ে অন্য কেউ হতাম। এই সুযোগে বলে রাখি—নির্বেদ রায় আমার 'নন্দীগ্রাম' ও 'প্রতিরোধ' অ্যালবাম দুটি কিনে কিনে নানান সভায় বাজানোর ব্যবস্থা করেছিলেন খুব ক্রিটিকাল এক যুগমুহূর্তে। একটি গানে, নন্দীগ্রাম প্রসঙ্গে 'বিদ্রোহ পুরনো ঘাঁটিতে' কথাটি শুনে উদ্বেল হয়ে উঠেছিলেন এই ইতিহাস-সচেতন রসিক মানুষটি।

বড় রাজনীতিকরা অনেক সময় ব্যক্তির প্রতিভা ও দক্ষতাকে তাঁদের কাজে লাগান। সেই সময়ে সেই ব্যক্তিবিশেষকে তাঁরা অল্পবিস্তর গুরুত্বও দেন। এই কাজটি তাঁরা অনেক সময়ে করে থাকেন নিজের দলের অন্য নেতা বা 'ফাংশানারি'র সামনে। লোকের মনে এরকম একটা ধারণা গজায় যে অমুক ব্যক্তিকে নেতা গুরুত্ব দিচ্ছেন। নেতা এই ধারণাটাকে কিছুদিন প্রশ্রয়ও দেন। রাজনীতির ম্যাকিয়াভেলিয় প্যাঁচপয়জারে অনভিজ্ঞ সেই ব্যক্তি ভাবতেও পারেন না যে সবটাই আসলে অন্য একটা কৌশলের অঙ্গ, দাবার বোর্ডে তিনি নিতান্তই একটি ঘুঁটি। হয়ত বোড়ে নন, হয়তো ঘোড়া—যার আড়াই ঘর যাওয়ার ক্ষমতা তাকে একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য দিচ্ছে। কিন্তু দিনের শুরুতে ও শেষে তিনি আসলে নেহাতই ঘুঁটি। খেলাটা তিনি খেলছেন না, খেলছেন আর-এক জন। কেউ কেউ এটা বুঝে যান। সব বুঝেও মুখ বুজে থাকেন, নেতার বা পার্টির মন জুগিয়ে চলেন, কারণ : তাঁর নিজের রাজনৈতিক উচ্চাশা এবং/অথবা অন্য কোনও পার্থিব স্বার্থ। থিওরির

দিক দিয়ে এ-সবই আমার জানা ছিল। কিন্তু রক্তমাংসের বাস্তব জীবনে ব্যাপারটা যে কী হতে পারে তা আমার সম্যকভাবে জানা ছিল না। কিন্তু আজ মনে হয়—আমার জানা উচিত ছিল। যদি আরও সচেতন হতাম তাহলে আমার এই জীবন-অপরাহ্ণে বিশেষ বিশেষ কিছু অপচয় ও হয়রানির হাত থেকে আমি বেঁচে যেতাম।

(এই লেখাটি লিখছি, আর পঞ্চমীর সকালে—আজ ১২ই অক্টোবর, ২০১০—অনতিদূরে পাড়ার দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল থেকে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া গান ভেসে আসছে :

'ও বক্‌বক্‌বক, বকম্ বকম্ পায়রা, তোদের
রকম সকম দেখে
মুখ টিপে যে হাসছে ভোরের আকাশটা দূর থেকে...।'

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সুর, কার লেখা মনে পড়ছে না এই মুহূর্তে। সুর, কথা দুইই চমৎকার। আর কারও কথা বলতে চাই না, অন্তত আমার রকমসকম দেখে 'আকাশ'রূপী ভাগ্যবিধাতার তো মুখ টিপে হাসারই কথা। ছেলেবেলায় প্রথম শোনা একটি বাংলা ছায়াছবির এই গানটি আজ বাষট্টিতে চলতে থাকা এই 'আমি'র বেশ লাগছে। এই মুহূর্তে আমার যা অবস্থা তার সঙ্গে মিলেও যাচ্ছে বেশ।)

২০০৭ সালের এপ্রিল মাস থেকেই নন্দীগ্রামে ভূমি-উচ্ছেদ-প্রতিরোধ কমিটির সমর্থকদের ওপর সি পি আই এম সমানে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল। অক্টোবরে তা উঠল তুঙ্গে। সবাই মিলে মিছিল করে নন্দীগ্রাম যাওয়ার কথাও উঠল, কিন্তু সেরকম কিছু হল না। ক্রমশই অশান্ত হয়ে উঠছিলাম আমি ভেতরে ভেতরে। নন্দীগ্রামে আর যেতে পারছি না কিন্তু নানান সূত্রে খবর যা পাচ্ছি তা থেকে বুঝতে পারছি শুধু মুখের কথায়, লেখার কথায়, সভা-সমিতি করে সি পি আই এমের সশস্ত্র আক্রমণ থামানো যাবে না।

এরই মধ্যে সি পি আই এম বিরোধী আন্দোলনের বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ঘুচিয়ে অল্পবিস্তর রফা করার একটা লক্ষণও দেখা যাচ্ছে। বর্ষার আগেই মেট্রো চ্যানেলে কৃষিজমি-রক্ষা কমিটির একটি সভায় নকশালপন্থী

নেতা সন্তোষ রাণা এসে যোগ দিলেন। এলেন মানবাধিকার কর্মী সুজাত ভদ্রও। সভার শুরুতে প্রতুল মুখোপাধ্যায় গান গাইলেন। বাড়ি থেকে সভাস্থলে যাওয়ার পথে দূর থেকে শুনতে পেলাম মঞ্চের লাউডস্পীকারে আমার 'নন্দীগ্রাম' অ্যালবামটি বাজছে। সভায় আমিও বক্তব্য রেখেছিলাম। আমার বক্তব্য ছিল পরিষ্কার : অনেক অপেক্ষা হয়েছে। এবারে আমরা কয়েক হাজার মানুষ সিঙ্গুরে গিয়ে সত্যাগ্রহ করি। সিঙ্গুরের অনেক কৃষিজীবী সভায় হাজির ছিলেন। তাঁরা খুব উৎসাহিত হলেন। নেতারা বিশেষ উৎসাহ দেখালেন না। মমতা সেদিন মঞ্চে বসেননি। মঞ্চ ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি অতিথিদের। তৃণমূল নেত্রী বসেছিলেন মঞ্চের বাইরে। বারেবারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন দেখাচ্ছিলেন তাঁর রাজনৈতিক নমনীয়তা ও কৌশল। রাজনীতি।

অন্যদিকে নন্দীগ্রামে রাজনৈতিক সমাধান? ভারতে একটি কেন্দ্রীয় সরকার আছে। তার মাথায় রয়েছেন কংগ্রেস দল। তাঁদের জোটসঙ্গী বাম দলগুলিও। অন্ধ্রপ্রদেশের খাম্মামে পুলিশের গুলিতে পাঁচজন শ্রমজীবী মানুষ মারা গেলেন। প্রধানমন্ত্রী গেলেন সেখানে। নন্দীগ্রামে সরকারি হিসেবে চোদ্দ জন প্রাণ হারালেন। প্রধানমন্ত্রী কি একবারও নন্দীগ্রামে আসতে পারতেন না? সরকারি হিসেবে চোদ্দ। বেসরকারি হিসেবে কতজন প্রাণ হারিয়েছেন? সি পি আই এমের খুনে-বাহিনী ও পুলিশের গুলিতে?

'তারা' চ্যানেলে 'মতামত' করার সময় নন্দীগ্রামের এক বাসিন্দার খোঁজ পেয়েছিলাম যিনি আমায় বলেছিলেন কয়েকজন ট্রেকার চালকের টেলিফোন নম্বর তিনি আমায় দিতে পারেন। গণহত্যার রাতে সি পি আই এম সেই চালকদের বাধ্য করে তাঁদের ট্রেকারে করে মৃতদেহ ফেলে দিয়ে আসতে। গণকবরের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল বলে খবর ছিল। প্রয়োজনীয় কিছু সহায়ক ব্যবস্থার অভাবে আমি খবরের সূত্র ধরে আরও গভীরে, আরও দূরে যেতে পারিনি।

আমার ভেতরে একটা কণ্ঠ সমানে বলছিল—শুধু মিটিং মিছিল করে সি পি আই এমের মোকাবিলা করা যাবে না। ওদের কাডারদের হাতে আধুনিক অস্ত্র, যথেচ্ছ বুলেট। ওদের রক্ষা করার জন্য রয়েছে পুলিশ। কেন্দ্রীয় সরকারের হাবভাব দেখে একবারও মনে হচ্ছে না যে তাঁরা সি পি

আই এমকে নিরস্ত করতে চান। আমরা তাহলে কী করব? চোখা চোখা কথা বলে সভা গরম করব? জনসভায় প্রতিরোধের গান গাইব গলা ফাটিয়ে? তারপর, হৃষ্টচিত্তে যে যার বাড়ি ফিরে খাওয়াদাওয়া করে ঘুমোতে যাব, আর আমাদের গ্রামবাসীরা, নন্দীগ্রামের মানুষ বিনিদ্র রাত কাটাবেন, খুন হবেন, জখম হবেন, ধর্ষিত হবেন। তাঁদের ছেলেমেয়েরা স্কুল কলেজে যাবেন না, অথবা যাচ্ছেন নাকি যাচ্ছেন না তা নিয়ে বেশি না ভেবে আমাদের (শহুরে) ছেলেমেয়েদের স্নান করিয়ে, খাইয়ে-দাইয়ে পড়তে পাঠাব আমরা?

এর তিন বছর পরে, ভারত সরকারের যৌথবাহিনী লালগড়ে লালমোহন টুডুকে খুন করার পর তাঁর মৃতদেহটা যখন একটা ছালায় পুরে ঝাড়গ্রামের একটা থানায় ফেলে রাখা হয়েছিল, সাত-আট দিন ধরে লালমোহনবাবুর দেহটা যখন পচছিল (নাকি, নাগরিক বাঙালির ধারণা আদিবাসীদের মৃতদেহে পচন ধরে না?) তাঁর মেয়ের তখন মাধ্যমিক পরীক্ষা। (মেয়ের পরীক্ষার আগে লালমোহন টুডু একবার দেখা করবেন বলে বাড়ি ফিরছিলেন—সেই সুযোগে যৌথবাহিনী তাকে খুন করে।) সেই খবরটা কিন্তু কলকাতার কোনও মিডিয়া দেননি। 'মাওবাদীদের' গুলিতে নিহত পুলিশ বা শাসক দলের চরদের রাস্তায় পড়ে থাকার ছবির যদিও ছয়লাপ আমাদের মিডিয়ায়। নন্দীগ্রাম গণহত্যার পর থেকেই (সি পি আই এম-এর সশস্ত্র আক্রমণ কিন্তু তার পর থামেনি, বরং পুরোদমে চলেছে) আমার মনে হচ্ছিল অস্ত্র ছাড়া উপায় নেই।

তারই মধ্যে ২০০৭ সালের ঈদের ঠিক আগে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর বাড়ির কাছে মুসলিম-প্রধান এক পাড়ায় মমতার উদ্যোগে একটি সভা হল। অসীম আর আমি দু'জনেই গেলাম সেখানে। আমার ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল। সভার শেষে মমতা অসীম আর আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিলেন তাঁর গাড়িতে। মনে আছে, ট্যাক্সিতে চেপে ঐ সভায় যাওয়ার পথে এক সংগীতকারের ফোন পাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সঙ্গীত অনুষ্ঠান থেকে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে নালিশ জানাচ্ছিলেন তিনি।

অসীমকে বলায় আমরা দুজনেই একটু অবাক হয়ে ভাবছিলাম, আলোচনা করছিলাম—রাজ্য সরকারের অনুষ্ঠান থেকে বাদ যাওয়া তো এক

ধরনের স্বীকৃতি। আমরা তো এই সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। ওই সংগীতকারও তো আন্দোলনে রয়েছেন—এবং বেশ সরবে। বাদ তো তিনি পড়বেনই।

২০০৭-এর লক্ষ্মীপুজোর ঠিক পরের দিন কৃষিজমি-রক্ষা কমিটির যে বৈঠক ছিল তাতে অংশ নিইনি আমি। অসীমকে আমি বলেছিলাম—যা ঘটে চলেছে তাতে মনে হচ্ছে অস্ত্র ধারণ করা দরকার, মিটিঙে যেতে চাই না।

অসীম কিন্তু গিয়েছিলেন। এর কিছু দিন আগেই খবর পাওয়া গিয়েছিল, নন্দীগ্রামের শাসক দলের গুণ্ডারা ছ'জন মহিলাকে ধর্ষণ করেছে। মনের দিক থেকে আমি আর পেরে উঠছিলাম না। সভাসমিতি থেকে মন উঠে যাচ্ছিল।

আট

এরই মধ্যে তৃণমূল নেতা মদন মিত্র একদিন অসীম গিরি আর আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন বিষ্ণুপুরে, কৃষিজমি-রক্ষা কমিটির একটি সভায়। আমরা সেখানে গান গাইলাম, বক্তৃতা দিলাম। সেখানে সোনালী গুহও ছিলেন। হাসিখুশি মেয়ে সোনালী বরাবরই আমার সঙ্গে আন্তরিক ব্যবহার করেছেন। অসীমের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক হৃদ্যতাপূর্ণ, দেখেছি। বিষ্ণুপুরে আমাকে আবার যেতে হয়েছে মদনের জন্য। বিষ্ণুপুরের উপনির্বাচনের কথা মাথায় রেখে অসীম ও আমি দুজনেই চেষ্টা করেছি মদনের জয়ের পথে সহায়ক হতে। মদনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রথম থেকেই খুব ভাল। বাইরের অনেক লোককে মদন মিত্র সম্পর্কে নিন্দামূলক কথা বলতে শুনেছি। মদনের সঙ্গে মিশে বুঝেছি তাঁকে না চিনেই লোকে কথা বলে। শহরের অনেক মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের মনেই সামগ্রিকভাবে তৃণমূল দল সম্পর্কে খারাপ ধারণাই দেখেছি। ভাল ধারণা বরং সি পি আই এম দল সম্পর্কে। সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম গণ-আন্দোলনের ধাক্কায় সেই ধারণা কিছুটা হলেও পাল্টেছে।

ওদিকে, নন্দীগ্রামের সি পি আই এম বাহিনীর আক্রমণ ২০০৭-এর এপ্রিল থেকে নভেম্বরের মধ্যে ক্রমশ বেড়েছে। একই তালে বেড়েছে শুধু সভা সমিতি করে বেড়ানোর ব্যাপারে আমার অনীহা। আমার সমানে মনে হয়েছে অস্ত্র ছাড়া সিপি আই এমের খুনে-বাহিনীর মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। বস্তুত, নন্দীগ্রামের সি পি আই এম-বিরোধীরা যদি নিছক মিছিল করতেন, স্লোগান দিতেন আর নিপাট অহিংস থাকতেন তাহলে সি পি আই এমের খুনেদের ঠেকিয়ে রাখা যেত না। মার খেতে খেতে, লাঞ্ছিত হতে

হতে, কোণঠাসা হতে হতে নন্দীগ্রামের প্রকৃত দেশপ্রেমীরা এক সময়ে যেভাবে হোক অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য হয়েছেন। এটা তো প্রকৃতির নিয়ম।

আমাদের দেশে অনেক জায়গাতেই প্রচুর অস্ত্র আছে মানুষের হাতে বা তাদের নাগালের মধ্যে। আমাদের রাজ্যেও বিবদমান রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থকদের মধ্যে প্রায়ই যে কাজিয়া হয় তাতে ছোট থেকে মাঝারি অস্ত্রের ব্যবহার হয়ে থাকে। এ একেবারেই নিত্য ঘটনা। নেতারা এমন ভাব দেখান যেন খুনজখম এমনি এমনি হয়ে যায়। কালেভদ্রে বেকায়দায় পড়ে গিয়ে এ-নেতা ও-নেতা চিৎকার জুড়ে দেন—অমুক দলের লোকদের কাছ থেকে অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হোক। ব্যাস। ঐ পর্যন্ত। আর এগোবে কী করে। সব দলের গুণ্ডাদের হাতেই অস্ত্রশস্ত্র আছে। সংসদীয় দলগুলোর জঙ্গীদের সশস্ত্র লড়াই-এ যে কত লোক প্রাণ হারাচ্ছে সে-দিকে না তাকিয়ে সরকার ও মিডিয়ার নজর মাওবাদীদের 'ব্যক্তিহত্যা'র দিকে। অন্য দলগুলি কি বস্তুহত্যা করছেন? তাঁরাও তো ব্যক্তিহত্যাতেই লিপ্ত!

বেশিরভাগ সংসদীয় রাজনৈতিক দলের নেতারা সশস্ত্র রাজনৈতিক কাজিয়ায় মারা যান না, তাঁদের গায়ে তেমন আঁচ লাগে না। মরে সাধারণ মানুষ। এটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। প্রাণ হারাতে দেখা যায় বরং মাওবাদী দলের নেতাদের।

সি পি আই এম দলের কাডাররা ও 'ভাড়াটে' খুনেরা যে নন্দীগ্রামে সমানে বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেছেন তা কে না জানে। পুলিশ তাঁদের হাতে। কে বলতে পারে, হয়তো পুলিশের কাছ থেকেও তাঁরা আধুনিক অস্ত্র পেয়েছেন। এসব আমার জানা ছিল। আমি শুধু ভাবছিলাম উপযুক্ত অস্ত্র কোথায় পাওয়া যায়। সাধারণ গ্রামবাসীদের ওপর সি পি আই এমের সশস্ত্র আক্রমণের মুখে রক্তমাংসের যে কোনও স্বাভাবিক মানুষের এটাই ভাবার কথা। বিষয়টা এমন যে সকলের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলা যায় না। রাজ্যে, আমাদের শহরেই অস্ত্র আছে শুনেছি। কিন্তু সেগুলো পাওয়া যায় কোথায়? কারা সেগুলো জোগায় বা বিক্রী করে? সি পি আই এমের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ নিয়ে অনেক ভাবছিলাম। উপায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

মমতার সঙ্গে যোগ তখন একটু কমের দিকে। কৃষিজমি-রক্ষা কমিটির সভায় আমি বিশেষ যাচ্ছি না। মাঝে মাঝে মমতা আমায় এস এম এস

করছেন। হতাশ হয়ো না, কবীরদা। সি পি আই এম যাইই করুক মানুষ ঠিকই রুখে দাঁড়াবে। তার অনেক আগে থেকেই মমতা আমায় গ্রেট ফ্রেন্ড বলছেন, আমিও তাঁকে বলছি গ্রেট ফ্রেন্ড।

একদিন দুপুরের দিকে মমতা আমায় ফোন করছেন। মনে হচ্ছে একটু উত্তেজিত তিনি। বলছেন : রাজ্যটাকে সি পি আই এম যা বানিয়ে দিয়েছে তাতে গণতন্ত্র-টণতন্ত্র এখানে কতদিন চলবে জানি না, কবীরদা। আমি আর একটা চান্স নেব। তারপর অস্ত্র তুলে নেব। সবদিক বিবেচনা করে আমার মনের অবস্থা তখন একই রকম। আমার ঐ বয়সে আমি অস্ত্র তুলে নেব কী করে। তাও মনে হচ্ছিল নিকুচি করেছে সব কিছুর। এভাবে বেঁচে থেকেই বা কী লাভ। সাময়িকভাবে হলেও বিষাদগ্রস্ত, মরিয়া হয়ে ওঠা মমতাকে আমি বলেছিলাম : আমি থাকব তোমার সঙ্গে। আমি ফেড-আপ হয়ে গিয়েছি। দিনের পর দিন গ্রামের লোকগুলো সি পি আই এমের খুনেদের হাতে মরে যাবে, মেয়েরা তাদের ইজ্জত হারাবে আর আমি এখানে বসে বসে গোলগোল, ভদ্রভদ্র কথা বলে যাব, এ আমি কতদিন পারব জানি না। আমি ক্রমশ ক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছি দেখে মমতা আমায় বলছেন : গ্রেট ফ্রেন্ড, ভেঙ্গে পড়ো না, গ্রামের মানুষদের ওপর বিশ্বাস হারিও না। একটু ধৈর্য ধরো। দেখো কী হয়।

কবুল করছি : সেই যুগমুহূর্তে, আমার নিজের মনের যে অবস্থা ছিল তাতে মমতার অস্ত্র তুলে নেওয়ার কথাটা আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল। ঐ মুহূর্তে আমার প্রথম মনে হয়েছিল মমতা আমার আপন মানুষ, আমার কমরেড। এটা আমার ঐভাবে আগে কখনও মনে হয়নি। একদিন হয়ত আরও অনেকের পাশে দাঁড়িয়ে মমতা আর আমিও মানবতার শত্রুদের সঙ্গে সশস্ত্র লড়াই করে মরব। এই ভাবনার মধ্যে একটা রোমান্টিকতা ছিল, স্বীকার করছি। কোনও রকম রোমান্টিকতা ছাড়া লড়াই কি হয়, হতে পারে?

২০০৭ সাল শেষ হতে আর মাসখানেক বাকি। নন্দীগ্রামের সাতেঙ্গাবাড়ি গ্রামের ওপর আক্রমণ অভিযান চালাল সি পি আই এমের খুনে বাহিনী। বলতে গেলে প্রায় ধ্বংসই করে দিল তারা সাতেঙ্গাবাড়ি।

'কলকাতা টিভি'র ক্যামেরায় তোলা সাতেঙ্গাবাড়ির ভিডিও দেখে বিশ্বাসই হচ্ছিল না। এটাও সম্ভব হল! একটি গরুর চোখে গুলি ঢুকে গিয়েছে। চোখে বুলেট বিঁধে থাকার যন্ত্রণা নিয়ে অবলা প্রাণীটি ধীরে ধীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাস্তবিকই 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' ভিডিওতে এক প্রবীণাকে দেখা গেল—তাঁর বাড়ি ধ্বংস করে দিয়েছে সি পি আই এম বাহিনী। তিনি তাঁর ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাড়ির আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সুকুমার মিত্রর প্রতিবেদন থেকে জানছি! আবার ধর্ষণ করেছে শাসকদলের বাহিনী। আবার খুন করেছে তারা। কতগুলো বাড়ি যে ধ্বংস করেছে ইয়ত্তা নেই। গ্রামবাসীদের গোরু ছাগল মুরগিগুলোকেও হয় মেরেছে ওরা, অথবা ধরে নিয়ে গিয়েছে। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে সব কিছু ছিনিয়ে নিয়েছে শাসকদলের ডাকাত বাহিনী। মহিলাদেরও পরনের কাপড়টাই একমাত্র সম্বল। থালা-বাসনও নিয়ে গেছে ওরা। চুল আঁচড়ানোর চিরুনিও। গামছাও নিতে ছাড়েনি। বিবরণ পড়ে আমার মনে হচ্ছিল : এই আক্রমণ অতি সুপরিকল্পিত। খুঁটিনাটি পর্যন্ত ঠিক করে নেওয়া হয়েছিল আগেভাগে। এতটা নিষ্ঠুর হতে পারে আমাদের দেশের সংসদীয় একটি দল।

এক সন্ধেবেলা মমতার ফোন : কবীরদা, একবার সাতেঙ্গাবাড়ি যেতে পারবে, প্লীজ?—নরম ভাবে, সবিনয়ে বললেন তিনি।

১৪ই মার্চের গণহত্যার পর সাতেঙ্গাবাড়ির খবর পেয়ে আমার মাথায় জায়গা করে নিয়েছিল সি পি আই এম ও তাদের সহযোগীদের সম্পর্কে ঘৃণা এবং এক অক্ষম আক্রোশ। আমার তখন মনে হচ্ছিল এটা যারা করতে পারে তাদের শেষ করে ফেলা দরকার। সীমাহীন ক্রোধ ও অস্থিরতায়, ভয়ানক মানসিক যন্ত্রণাদায়ক এক অসহায়তায় ছটফট করছিলাম আমি। তমলুক হাসপাতালের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর সাতেঙ্গাবাড়ির ভিডিও ছবি—আমি খুন ভাবছিলাম। আমি অনুমান করতে পারি, অনুরূপ মানসিক অবস্থাতেই সুকান্ত ভট্টাচার্য লিখেছিলেন :

'প্রিয়ারে আমার কেড়েছিস তোরা ভেঙ্গেছিস ঘরবাড়ি
সে কথা কি আমি জীবনে মরণে কখনও ভুলিতে পারি
আদিম হিংস্র মানবিকতার আমি যদি কেউ হই
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই।'

মমতা বলছেন : কবীরদা, একবার সাতেঙ্গাবাড়ি যাও। গ্রামের মানুষরা তোমায় দেখতে চাইছে।

কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না আমার, মমতা। আমার ভাল্লাগছে না কিছু।

মমতা : একবার যাও, প্লীজ। গ্রামের মানুষরা তোমায় চাইছে। পার্থদা তোমায় নিয়ে যাবে। তোমার যাওয়া দরকার। তুমি তোমার নন-পলিটিকাল কয়েকজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারো।

অসীমের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করে নিচ্ছি কে কে যাবে। আমাদের বন্ধু সত্যবান মিত্র। সুপ্রিয়। অর্ণব। প্রিয়ব্রত। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অনুপ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসূনকে বলা হবে। সকলেই সহনাগরিকদের মুক্তমঞ্চের লোক। বাইরের কেউ না। শেষ মুহূর্তে প্রসূন যেতে পারছেন না ওঁর মেয়ের কারণে। মানিক মণ্ডল নিজের থেকে চলে এসেছেন। প্রসূনের জায়গায় মানিক ঢুকে পড়ছেন। আমি খুব ওয়াকিবহাল নই এই ব্যক্তিবদলের ব্যাপারে। অসীম পরে আমায় জানান কী হয়েছিল। সাতেঙ্গাবাড়ি যাত্রা সিরিয়াস ব্যাপার। এরকম হওয়ার কথা ছিল না, কিন্তু হল।

দুটো গাড়ি যাচ্ছে। তৃণমূল নেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের গাড়িতে অসীম আর আমি। অন্য গাড়িটায় অন্যরা।

নয়

নন্দীগ্রামের এক স্থানীয় পার্টি অফিসে পৌঁছে দেখা হচ্ছে শিশির অধিকারী ও শেখ সুফিয়ানের সঙ্গে। নন্দীগ্রাম থমথমে। অসীমের মন খারাপ। আমাদের মধ্যে অসীমই সম্ভবত সবচেয়ে নরম মনের ছেলে। ওর আবেগ জোরালো। সুপ্রিয়ও আবেগপ্রবণ। পার্থ চট্টোপাধ্যায় অফিসে বসে কথা বলছেন স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে। আমি অফিসের বাইরে আমার 'নন-পলিটিকাল' বন্ধুদের সঙ্গে, নন্দীগ্রামের কিছু বাসিন্দার সঙ্গে। 'তারা' চ্যানেলের 'মতামত' অনুষ্ঠানের সঞ্চালক হিসেবে আমাকে বিলক্ষণ চেনেন নন্দীগ্রামের মানুষ। শুধু সাংবাদিক হিসেবে নয়, অ্যাকটিভিস্ট হিসেবেও কয়েকবার এসেছি এখানে। এসেছি সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরির সভায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায়। অসীমও বারবার এসেছেন নন্দীগ্রামে। মমতার বিপুল জনসভায় তিনিও ছিলেন। আজ ভাবলে একটু অদ্ভুতই লাগে—পরে, নন্দীগ্রামের বর্ষপূর্তিতে মমতা আমাদের দুজনকেই বাদ দিয়েছিলেন। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক কোনও দলেই আমরা স্থান পাইনি। বড় রাজনীতিকরা ছোট মাপের মানুষদের ব্যবহার করে থাকেন। ইউজ এন্ড থ্রো। এমনিতে মন্দ নয়। ওমনিতে? সিঙ্গুর নন্দীগ্রামে লড়াই করেছিলেন কিন্তু কোনও বড় নেতা নন, ছোট মাপের মানুষরাই। প্রাণ আর ইজ্জত দিয়েছিলেন তাঁরাই। তেমনি, আমি নিজে মিডিয়ার কর্মী ছিলাম তাই দেখেছি—প্রাণ হাতে করে উপদ্রুত ঘটনাস্থল থেকে রিপোর্ট করেছিলেন, ভিডিও ক্যামেরায় ছবি তুলে তা বেতারে কলকাতা পাঠিয়েছিলেন যাঁরা, ইতিহাস তাঁদের মনে রাখে না। ইতিহাস কি মনে রাখবে জেলার ভিডিয়োগ্রাফারদের, যাঁদের তোলা ছবিতে সারা দুনিয়ার মানুষ দেখতে পেয়েছিল সি পি আই এমের খুনেরা কিভাবে

গুলি চালাচ্ছে নন্দীগ্রামের সাধারণ মানুষদের ওপর? কোনও বড় নেতা ও ইতিহাস কি মনে রাখবে দৈনিক স্টেট্‌সম্যানের সেই ফোটোগ্রাফারকে যাঁর তোলা ছবিতে আমরা হাঁ করে দেখেছিলাম পুলিশের পোশাক পরে কে যেন লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছে এক অসহায় গ্রামবাসীকে আর আসল পুলিশরা সেই মার বিকৃত মুখ করে দেখছে? তাদের মধ্যে একজন দৃশ্যত শিউরে উঠছে। ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের সাফল্যের পেছনে ছোট মাপের, অধুনা-বিস্মৃত সেই মিডিয়া কর্মীদের ভূমিকা যে কত বড় ছিল তা কজন মনে রাখে? কজন আজ ভেবে দেখে সংবাদদাতা সুকুমার মিত্রের অবদানের কথা?

সুকুমারের সঙ্গে দেখা হচ্ছে রাণীচকে। সকলে মিলে আমরা চলেছি সাতেঙ্গাবাড়ি। নানান মিডিয়ার ক্যামেরাম্যান ও রিপোর্টাররা আমাদের পিছু নিয়েছেন। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও জানেন, অসীমও জানেন, আমিও জানি সাতেঙ্গাবাড়ি যাত্রা তাৎপর্যপূর্ণ। মমতা আমায় বলেছিলেন—গ্রামবাসীরা তোমায় দেখতে চান। সংঘবদ্ধ, সুপরিকল্পিত হামলা চালিয়ে সি পি আই এমের খুনে বাহিনী ধ্বংস করেছে সাতেঙ্গাবাড়ি। কিন্তু তখনও তারা পাকাপাকি দখল নিতে পারেনি। কতকটা blitzkrieg-এর কায়দায় তারা ঝটিকা-হানা দিয়েছে। কিন্তু তার পরেও গ্রামবাসীরা নিশ্চয়ই পাল্টা আঘাত হানতে পেরেছেন, নয়তো ঐ গ্রামে তো এখন সি পি আই এম বাহিনীর শিবির গেড়ে থাকার কথা। আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত, সংখ্যায় ভারী শাসক বাহিনীকে পাল্টা মার দিয়ে হটিয়ে দিতে পেরেছেন যে গ্রামবাসীরা তাঁরাই তাহলে চেয়েছেন আমি একবার যাই? কিন্তু আমি কেন?

ঘাস খেয়ে বয়স বাড়াইনি। দেশ-বিদেশে সাংবাদিকতা করে অভিজ্ঞতা নেহাত কম হয়নি। দুবার ফোন করে মমতা যেভাবে বলেছিলেন আমায় কথাগুলো, তা থেকে বুঝেছিলাম তিনি আমায় জরুরি কোনও বার্তা ও নির্দেশই দিচ্ছেন। কয়েকজন 'নন-পলিটিকাল' বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছিলেন তিনি। অর্থাৎ কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই যুক্ত নন এমন ব্যক্তি। আমিও তো কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নই। সূত্রটি খুব জটিল কি? সি পি আই এমের বিরাট সশস্ত্র বাহিনীকে অল্প কয়েকদিনের জন্য হলেও হটিয়ে দিতে পারেন যে

গ্রামবাসীরা তাঁরা সম্ভবত কোনও দলের নন। বিশেষ কোনও দলের অনুগত তাঁরা নন সম্ভবত।

এই ব্যাপারটি নিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বা অসীমের সঙ্গে আমার কোনও আলোচনা হয়নি। কলকাতা থেকে নন্দীগ্রাম যাওয়ার পথে আমরা হালকাভাবে কিছু কথা বলছিলাম। উল্লেখযোগ্য বাস্তববুদ্ধি ও পরিণত রাজনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁরা দুজনেই। পার্থ জানতেন তিনি তাঁর দলনেত্রীর আজ্ঞা পালন করছেন। আমি জানতাম আমি আমার বন্ধু, সহযোদ্ধা, বড় মাপের নেতার নির্দেশ পালন করছি। অসীম জানতেন—এখন যুদ্ধ, যুদ্ধের বিশেষ এক মুহূর্তে যা করা দরকার সেটাই করতে হবে। তিনজনেই জানতাম কোনও প্রশ্ন তোলার সময় এটা নয়।

সাতেঙ্গাবাড়ির কাছাকাছি পৌঁছনোর পর অবস্থাটা এমনই জটিল যে সংসদীয় রাজনীতি করেন এমন কারও পক্ষে তা সামলানো মুশকিল। আমরা ঢুকছি war zone-এ। পার্থ যা বোধহয় প্রথম থেকেই জানেন না : 'কলকাতা টিভি'র ক্যামেরাম্যান দয়াল আমাদের সঙ্গে যাবেন। আমরা তিনজন যা জানি : বেশি মিডিয়ার লোককে সঙ্গে আসতে দেওয়া যাবে না। এই বিশেষ যুদ্ধাঞ্চলটি যথাসম্ভব লোকচক্ষুর আড়ালে রাখা দরকার। ছবি তোলার তো প্রশ্নই ওঠে না। মমতা এই মর্মে কিছুই বলেননি। সেই মুহূর্তের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে আমার এটা মনে হয়েছিল। তাছাড়া, সাতেঙ্গাবাড়ির দখল ফিরে পাওয়ার লক্ষ্যে আমাদের শত্রুরা অনতিদূরেই শিবির গেড়ে সেখান থেকে যে সমানে গুলি চালাবে এ তো জানা কথা। তারা তখন মরিয়া। আমার হিসেব ছিল : শত্রুবাহিনীর হাতে লং রেঞ্জ রাইফেল থাকলে বেশ খানিকটা দূর থেকেও তারা আমাদের কাউকে কাউকে ঘায়েল করে দিতে পারে। তারা যেহেতু শাসক দলের ঘাতক বাহিনী, বুলেট তাদের যথেষ্টই আছে সম্ভবত। লং রেঞ্জ রাইফেল না থাকলে অত দূর থেকে আমাদের খুন-জখম করা প্রায় অসম্ভব। আমার প্রধান সমস্যা : শত্রুবাহিনীর হাতে কী ধরনের অস্ত্র আছে তা জানার কোনও উপায় নেই আমার। বাস্তবজ্ঞান যার একটু-আধটুও আছে তার জানার কথা—শত্রুকে কখনও খাটো করে দেখতে নেই। Combat zone journalist হিসেবে এককালে নিকারাগুয়ায় যে প্রশিক্ষণ আমায় দেওয়া হয়েছিল তাতে প্রথমেই ছিল :

শত্রুকে বেশি নম্বর দিয়ে শুরু করো। কখনও ধরে নিয়ো না তোমার শত্রু বোকা, দুর্বল বা তোমার হাতে যা আছে তার হাতে তা নেই।—আমার নিজের জীবনে আমি দেখেছি। আমার সমস্ত শত্রু, এমনকি আমার বন্ধুদের মধ্যেও কেউ কেউ আমাকে বোকা, আবেগপ্রবণ এইসব ভাবেন। পার্থিব বিষয়ে আমি অবশ্যই বোকা—এই অর্থে যে আমি একে তাকে ধরে বা ঠিক ঠিক জায়গায় মাথা ঝুঁকিয়ে, তালে তাল দিয়ে টাকাপয়সা, বাড়িগাড়ি বানাতে পারিনি। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। সব ব্যাপারে বোকা হলে বোধহয় এক জীবনে এত রকম কাজ করে যেতে পারতাম না। ২০০৯ সালে আমি লোকসভার ভোটে দাঁড়ানোর পর সি পি আই এম দল, জনাব সইফুদ্দিন ও তাঁর দল, মিডিয়ার কোনও কোনও হাউস ও শিবির এবং খোদ তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও কোনও মহল আমায় বোকা ও অসহায় ভেবে বেশ হেসেই ছিলেন। আমি জিতে যাওয়ায় তাঁরা বেশ চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন হয়তো। কিন্তু পরে দেখেছি কেউ কেউ এবং কোনও কোনও মহল আবার সেই একই ভুল করে চলেছেন।

সাতেঙ্গাবাড়িতে কোন ভুল করার অবকাশ ছিল না। ওখানে ভুল মানে তার পরিণাম ভয়ানক। আর একটু গেলেই সাতেঙ্গাবাড়ি। গাড়ি থেকে নেমে আমি মিডিয়ার ছেলেমেয়েদের বলছি আমাদের সঙ্গে না যেতে। তাঁরা চাপ দিচ্ছেন। অনেকক্ষণ বোঝানোর পর কেউ কেউ মেনে নিলেন। পার্থ আর অসীমও নেমে পড়েছেন। আমাদের হাতে সময় কম। কেউ কেউ নাছোড়বান্দা। পার্থ বিরক্ত। দয়ালকে সঙ্গে নিতেই হবে। সুকুমার তো যাবেনই। এই লেখাটি পড়ে অনেকে ভাবতে পারেন যে আমি পক্ষপাতিত্ব করছিলাম। যে যা খুশি তাই ভাবতে পারেন।

জীবনে, লড়াই-এ এমন মুহূর্ত আসে যখন সমানাধিকার আর থাকে না। আমরা যুদ্ধে আছি। যুদ্ধ। নাটক বা রাজনৈতিক তর্জা নয়। গণতান্ত্রিক আলোচনার মঞ্চ নয়। কাব্য নয়। ভাবাবেগ বা ভাবালুতার জায়গা নয় ওটা। ওখানে বিচার্য একটাই : কে আমার শত্রু বা কার কাজকর্মের ফলে আমার শত্রুদের সুবিধে হবে। সামরিক যুদ্ধে সি পি আই এমের ঘাতক বাহিনী আধুনিক অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করেছে একটি গ্রামে। নির্বিচারে ধ্বংস, অত্যাচার, ধর্ষণ করেছে তারা। দেশপ্রেমী গ্রামবাসীরা তাদের

সাময়িকভাবে হটিয়ে দিতে পেরেছেন। কিন্তু তাঁদের হাতে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র থাকতে পারে না। অর্থাৎ শত্রুদের চেয়ে তাঁরা দুর্বল। শুধু মনোবল দিয়ে যুদ্ধ জেতা যায় না। সি পি আই এমের ঘাতক বাহিনী আবার আক্রমণ করবেই। এরকম অবস্থায় আমরা কিছুতেই পারি না আমাদের ছেলেদের হাতে যা, যতটুকু আছে তার ছবি প্রচার করতে। তাঁরা কারা? গ্রামের মানুষ। আমরা কোনওমতেই পারি না সেই লড়াকু দেশপ্রেমীদের ছবি প্রচার হতে দিতে। এই রকম অবস্থায় আমি খুঁটিয়ে বাছবিচার করবই। চেষ্টা করব কোথাও কোনও ফাঁক না রাখতে। আমি, আমরা যুদ্ধে আছি।

দয়াল আমাদের গাড়িতে। সুকুমার উঠে গেছেন আমাদের অন্য গাড়িটায়। শিশির অধিকারী ও শেখ সুফিয়ান আসছেন আলাদা। একটু এগোতেই দেখছি—সামনে, কিছুটা দূরে চারটি মোটরবাইক। প্রত্যেকটিতে দুটি যুবক। তাঁদের মুখের অনেকটা ঢাকা। চোখদুটি খোলা। তাঁদের কাঁধে ঝোলানো ওয়ান শটার বা টু শটার বন্দুক। এই বন্দুকের রেঞ্জ কম। আমি বুঝতে পারছি এঁরা পাহারায় ছিলেন, আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন। দুটি বাইক এগিয়ে এসে আমাদের গাড়িটার দুই দিকে দাঁড়াল। আমার বাংলার চার সংগ্রামী গ্রামবাসী যুবকের পাহারায় আমরা ঢুকছি সাতেঙ্গাবাড়ির ভেতরে। অন্য দুটি বাইক চলেছে অন্য গাড়ির সঙ্গে। দয়াল হঠাৎ বলছেন—কবীরদা, দ্যাখো। তাঁর নির্দেশমতো একটি জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখছি বাইরে ধানক্ষেতে মাটিতে বুক দিয়ে উপুড় হয়ে আছেন কোনও কোনও গ্রামবাসী, মনে হচ্ছে অল্পবয়সী। তাঁদের হাতে ধরা বন্দুকগুলো তাক করে আছে আমাদের দিকে। তাঁদেরই পাশে কেউ কেউ আবার উল্টো দিকে ফিরে আছেন। তাঁদের বন্দুকগুলো তারা তাক করে আছেন অন্য দিকে। আমি দেখছি দু-একজন বুক দিয়ে 'ক্রল' করছেন ধীরে ধীরে। আমার মনে পড়ে যাচ্ছে ১৯৮৫ সালে নিকারাগুয়ায় দেখা একটি ঘটনার কথা : যুবকরা বিপ্লবী ফৌজে যোগ দিচ্ছেন। এ এক অনুষ্ঠান। আমি দেখছি। বিপ্লবী সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরের দুই কম্পানিয়েরা কার্লা ও মাগালি আমায় নিয়ে গিয়েছেন সেখানে। ছেলেরা একে একে এগিয়ে এসে তাঁদের দিকে বাড়িয়ে দেওয়া রাইফেল হাতে তুলে নিচ্ছেন। রাইফেল হাতে নিয়ে বলছেন :

লাতিন আমেরিকা, বিশ্বমানবতা ও চে গেভারার নামে এই অস্ত্র আমি তুলে নিলাম—ভিভা লা রেভোলুসিয়ন : বিপ্লব বেঁচে থাক।

আমি দেখছি অসীম একই দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর মুখে রোদ্দুর পড়ছে। দয়ালের মুখের ভাবে আত্মবিশ্বাস। এই দয়াল সি পি আই এম কাডারদের গুলিতে ভরত মণ্ডলের খুন হওয়ার ভিডিও তুলেছিলেন ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে। ভরতের গুলি খাওয়া পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এসেছিল। কয়েকজন গ্রামবাসী চেষ্টা করছিলেন সেই নাড়িভুঁড়ি জোর করে ঠেলেঠুলে ভরতের পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে গামছা দিয়ে পেটটা বেঁধে দিতে। শহীদ ভরত মণ্ডল, যাঁর স্ত্রী পরে 'তারা' চ্যানেলের ক্যামেরাম্যান অনির্বাণ সাধুর ক্যামেরার সামনে আমায় সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে বলেছিলেন : রাতের বেলা গুলির আওয়াজ শুনে ও আর আমি ছুট্টে বেরিয়ে গিয়েছিলাম ঘর ছেড়ে; আমরা দুজন হাত ধরাধরি করে ছুটছিলাম। কী অন্ধকার। তারপর একটা গুলির আওয়াজ, ও পড়ে গেল। শহীদ ভরত মণ্ডল, যাঁর মা আমাদের সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন : 'আমার এক ভরত গেছে, হাজার ভরত আছে।' ভরতের মায়ের জীবিত ভরতদের কেউ কেউ সাতেঙ্গাবাড়ির ঐ ক্ষেতে বন্দুক হাতে নিয়ে বুকে ভর দিয়ে সরীসৃপের মতো ধীরে ধীরে এগোচ্ছেন— সি পি আই এমের হানাদাররা হঠাৎ আক্রমণ করলে তাদের ঘায়েল করবেন বলে।

আমার মনে পড়ছে আমার সহযোদ্ধা, বিজ্ঞানী কল্যাণ রুদ্রর কথা : সুমনদা, এ হল আবার এক স্বাধীনতা যুদ্ধ। একই কথা বলেছেন, লিখেছেন মহাশ্বেতা দেবী, *দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান-এ* তাঁর কলামে।

১৯৭৪ সালে যখন প্রাণপণ চেষ্টা করছিলাম গান লিখতে, বহু ধ্বস্তাধ্বস্তি করে লিখতে পেরেছিলাম কয়েকটা লাইন :

এ কেমন আকাশ দেখালে তুমি
এ কেমন আকাশ জন্মভূমি
এ যে শুধু কান্না, শুধু কান্না, শুধু কান্না কান্না কান্না
এ কান্না চাই না, আমি চাই না, আমি চাই না চাই না চাই না
এ কেমন কান্না শেখালে তুমি, এ কেমন কান্না মাতৃভূমি।

সাতেঙ্গাবাড়িতে আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে সব-খোয়ানো, অপমানিত,

আহত, ধর্ষিত বাংলার গ্রামবাসীদের কান্না। এঁদের অপরাধ? যে শাসকদল ও তাঁদের সরকার এঁদের হকের জমি কেড়ে নিয়ে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বানাতে চেয়েছে এঁরা তাঁদের বিরোধিতা করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, ভূমি-উচ্ছেদ প্রতিরোধের সংকল্পে বুক বেঁধে এঁরা উঠে দাঁড়িয়েছেন।

অবিশ্বাস্য। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হত না। শুধু ছবি দেখে এর মাত্রা বোঝা যায় না। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে যখন লড়াই চলছিল, সীমান্তবর্তী দেশগুলিতে আশ্রয় নেওয়া দক্ষিণ আফ্রিকান মুক্তিযোদ্ধারা যখন গেরিলা আক্রমণ করছিলেন তখন দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার সাহায্য নিয়েছিলেন সাভিম্বি নামে এক ভাড়া খাটা ঘাতকবাহিনীর সর্দারের। অস্ত্রহীন, অসহায় মানুষের ওপর কত রকম অত্যাচার করা সম্ভব, সে-বিষয়ে সাভিম্বি ছিলেন গুরুস্থানীয়। নির্যাতন বিষয়টিকে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন এমন এক স্তরে যার বর্ণনা দেওয়া কঠিন। নাৎসি অপবিজ্ঞানবিশারদ ইয়োসেফ মেংগেলের মতো সাভিম্বিও স্থান পেয়েছেন নির্যাতনবিদ্যার সেরাদের তালিকায়।

ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাংবাদিকতা করার সুবাদে 'ফ্রন্ট লাইন স্টেট্স' বা দক্ষিণ আফ্রিকার সীমান্তঘেঁষা দেশগুলির গ্রামে সাভিম্বির কীর্তিকলাপের ছবি ও ভিডিও দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু ২০০৭ সালের নভেম্বর মাসের তিন তারিখ সাতেঙ্গাবাড়িতে যা দেখছি তার কোনও তুলনা নেই।

বাড়ির পর বাড়ি ধ্বংস। ধ্বংস করে তারপর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে একের পর এক বাড়ি। আমাদের দেখে গ্রামের মেয়েরা বেরিয়ে আসছেন। বলছেন তাঁদের চরম বিপদের কথা। ঘরের সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছে আক্রমণকারীরা। লুট করে নিয়ে গেছে কিছু কিছু জিনিস। মানুষ যে যাহোক কিছু খাবে, খাবার থালাও নেই। পরার কাপড় নেই। আমার সঙ্গে যাঁরা এসেছেন তাঁরা হতভম্ব। আমিও। কী বলব, কী করব বুঝতে পারছি না। গ্রামবাসীরা বলছেন—সি পি আই এমের হানাদাররা কোনও কোনও বাড়ির গোরুগুলোকে একটি ঘরে আটকে, বাইরে থেকে দরজা ভালমতো বন্ধ করে সেই ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। জ্বলেপুড়ে মরেছে গোরুগুলো আর্তনাদ করতে করতে।

আমাদের সামনে আর্তনাদ করছেন এক প্রবীণা। বুক চাপড়ে কাঁদছেন তিনি, হাহাকার করছেন। বলা নেই কওয়া নেই আমার সামনে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে বলছেন : 'আল্লাহ, আমি তো কারও কোনও ক্ষতি করিনি, তবে কেন তুমি আমার সবকিছু কেড়ে নিলে।' গ্রামবাসীরা বলছেন, হানাদাররা এঁর বাড়ি একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে, কিছুই আর বাকি রাখেনি। এঁর স্বামীর নাম ছিল মোবারক আলি। মারা গিয়েছেন। এঁকে দেখে, এঁর হাহাকার শুনে অসীম আর সুপ্রিয় চিৎকার করে কাঁদছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অনুপ বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার 'নন-পলিটিকাল' সঙ্গীদের মধ্যে বয়সে ইনিই সবার বড়, আমার পাশে এসে বলছেন—কী করা যায় বলুন তো? কিছু টাকা দিলে কি খারাপ দেখাবে? অসহায়ভাবে কিছু টাকা দেওয়া হচ্ছে সাধ্যমত।

দিনদুপুরে গ্রামের রাস্তায় কয়েকটা কুকুর একসঙ্গে কেঁদে কেঁদে ফিরছে। সাতেঙ্গাবাড়ির কুকুর।

একের পর এক বাড়ির সামনে যাচ্ছি। প্রত্যেকটি বাড়ি ধ্বংস, পোড়া পোড়া। শিশির অধিকারী বলছেন, বিহার, ঝাড়খণ্ড আর ওড়িশার ডাকাতদের নিয়ে কয়েক কোটি টাকা খরচ করে এক বিশাল খুনে বাহিনী গড়ে তুলেছে সি পি আই এম। তাদের হাতে আধুনিক অস্ত্র দেওয়া হয়েছে। তারা কিছুটা দূরে শিবির গেড়ে অপেক্ষা করছে।

থেকে থেকেই গুলির আওয়াজ শুনছি। গুলি চালাচ্ছে ভাড়া করা খুনীগুলো তাদের শিবির থেকে। গ্রামের একটি বিশেষ জায়গা থেকে দেখাও যাচ্ছে শিবিরটা। গুলির আওয়াজ থেকে বুঝতে পারছি এক জায়গা থেকে গুলি চালানো হচ্ছে না। গুলি চালানো হচ্ছে সাতেঙ্গাবাড়ির একটু বাইরে বিভিন্ন জায়গা থেকে। বুঝতে পারছি সি পি আই এমের বাহিনী ঘিরে ফেলছে এই গ্রাম। বড় ধরনের আক্রমণ, অভিযান আসন্ন। এর আগের আক্রমণ কিছুটা হলেও প্রতিহত করেছিলেন বীর গ্রামবাসীরা। নয়তো খুনীগুলো তো এই গ্রামেই শিবির গাড়ত। তা তারা পারেনি। কিভাবে তাড়ালেন গ্রামবাসীরা ঐ বাহিনীটাকে? নাকি আক্রমণকারীদের কাজ ছিল হঠাৎ হানা দিয়ে, গ্রামটাকে ধ্বংস করে, কিছু খুনজখম আর লুটপাট করে পালিয়ে যাওয়া? ভাবছি। কোথায় যেন হিসেবটা মিলছে না। পালিয়ে

যেতে হবে কেন? পুলিশ তো তল্লাটে নেই। তাছাড়া, সি পি আই এমের কাডার আর খুনীদের সাহায্য করার জন্যেই তো এই রাজ্যের পুলিশ। পুলিশ যদি এখানে থাকত তাহলেও তো তারা হানাদারদের পেছনে ধাওয়া করত না, বরং সাহায্যই করত তাদের। গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রশিক্ষিত এক দল মানুষ নিশ্চয়ই আছেন যাঁরা পাল্টা আক্রমণ করার ক্ষমতা রাখেন। ভাগ্যিস আছেন তাঁরা।

সমানে গুলির আওয়াজ আর গুলির আওয়াজ। খেয়াল করছি, আমার 'নন-পলিটিকাল' সঙ্গীদের কেউই ভয় পাচ্ছেন না, যদিও ভয় পাওয়ার কারণ যথেষ্টই আছে। সি পি আই এমের বাহিনীকে তাদের এ-গ্রামের ইনফর্মার নিশ্চয়ই জানিয়ে দিয়েছে কারা এসেছে সাতেঙ্গাবাড়িতে। দু-একটাকে সাবাড় করে দিতে পারলে, কম-সে-কম জখম করে দিতে পারলে সি পি আই এমের লাভ।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের দুই দেহরক্ষী মাঝেমাঝেই বলছেন এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া দরকার। বিধানসভায় পার্থ বিরোধী দলীয় নেতা। সঙ্গে দেহরক্ষী থাকবেনই। তাঁরা রীতিমত চিন্তিত। বেলা পড়ে আসছে, ফলে চিন্তাও বেশি। অন্ধকার নেমে এলে হানাদাররা আক্রমণ চালাতে পারবে আরও সহজে। দূরে মাঠে আমাদের পক্ষের বীর প্রহরীরা বন্দুক নিয়ে তৈরি। কতই বা বয়স। বছর পঁচিশের বেশি কেউই নন। দেখে তো মনে হচ্ছে কেউ কেউ আরও ছোট।

একটা ছোট সভা হবে। অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছি এখানে কোনও রাজনৈতিক দলেরই কোনও পতাকা নেই। একটি জায়গাতেও কোনও দলের পতাকা দেখলাম না। একটি গাছের গুঁড়িতে দেখেছি এস ইউ সি আই দলের নেহাতই ছোট একটি হাতে-লেখা পোস্টার। একটু কাঁচা হাতে লেখা। কোনও রকমে সেঁটে রাখা। এ ছাড়া কোনও রাজনৈতিক দলের নামও নেই কোথাও। খেয়াল করছি পার্থ চট্টোপাধ্যায়, শিশির অধিকারী, শেখ সুফিয়ান হাজির কিন্তু তৃণমূলের কোনও পতাকা বা পোস্টারও নেই। ভূমি-উচ্ছেদ-প্রতিরোধ কমিটির কালো নিশানও নেই। এ দিক দিয়ে সাতেঙ্গাবাড়ি এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। তাহলে এখানে সি পি আই এমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-উদ্যোগ করছেন, চালিয়ে যাচ্ছেন কারা? সূর্য

সেনের সেই বংশধরদের মনে মনে প্রণাম জানাচ্ছি। তাঁরা না থাকলে যেটুকু সশস্ত্র প্রতিরোধের মুখে সি পি আই এম পড়ছে সেটুকুও থাকত না।

গ্রামবাসীরা সভার আয়োজন করেছেন। বিদ্যুৎ নেই এই গ্রামে। জেনারেটর নেই। ব্যাটারি চালিত কোনও পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমও নেই। নেই ছোট মেগাফোনও। একটা বেঞ্চি এনেছেন গ্রামবাসীরা। সামনে মাটিতে বসে আছেন গ্রামের মেয়েরা। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি সি পি আই এমের হানাদাররা গ্রামের মুসলমানদের বাড়িগুলো বেছে বেছে ধ্বংস করেছে, সেগুলোয় আগুন লাগিয়েছে। তার মানে এই গ্রামেই হানাদারদের ইনফর্মার ছিল, আছে। নয়তো বাইরের রাজ্য থেকে ভাড়া করে আনা দাঙ্গাবাজরা জানবে কী করে কোন বাড়ি মুসলমানের। দলিতদের কিছু বাড়ি বেঁচে গিয়েছে। এক মহিলা আমায় দেখিয়ে দিচ্ছেন এক দলিত পরিবারের বাড়ি যেটার কিছুটা ঝলসে গিয়েছে, তার পাশের মুসলমান পরিবারের বাড়িতে হানাদাররা আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল বলে। এই মহিলা ঐ দলিত পরিবারের মেয়ে।

আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন দয়াল। তাঁর হাতে ভিডিও ক্যামেরা। আমি তাঁকে বলছি ক্যামেরাটা না খুলতে। জেলার এক ভিডিওগ্রাফারও কী করে জানি না আছেন। আমাদের সঙ্গে আসেননি তিনি। হয়তো তিনি এই গ্রামেরই ছেলে। তাঁকেও বারণ করছি ছবি তুলতে। এখানে কারা আছে, তারা কী বলছে তা বাইরের কারও জানার দরকার নেই আপাতত। আমরা যুদ্ধে আছি। এখানে রাজনীতি-রাজনীতি খেলা হচ্ছে না।

পার্থ খালি গলায় অতি সংক্ষিপ্ত একটি ভাষণ দিচ্ছেন। শিশিরদাও। তাঁদের ভাষণের একটাই কথা : নন্দীগ্রামের কথা আজ সারা বিশ্ব জেনে গিয়েছে। সি পি আই এমের অপশাসন আর চলবে না বেশিদিন। আমরা আছি আপনাদের সঙ্গে। পার্থ আমায় বলছেন—আসল বক্তা আপনি। আপনি যা যা বলার বলুন। আমি তাকিয়ে আছি অপেক্ষমাণ গ্রামবাসীদের দিকে। তাঁদের ক্লান্ত, বিষণ্ণ মুখে শীতের শেষ বেলার ধূসর আলো। সকলের পরনে ময়লা পোশাক। সকলের শরীরে অপুষ্টির ছাপ। সকলের চোখে অদ্ভুত এক দৃষ্টি : অসহায়তা, ক্লান্তি, দুঃখ, ভয়। কিন্তু সেই একই সঙ্গে সংকল্প। কেউ কেউ বসে পড়েছেন। অনেকে দাঁড়িয়ে।

একটু বিপন্ন বোধ করছি। এই গ্রামে, এই অবস্থায়, এই মানুষদের, এই রকম এক মুহূর্তে কী বলব আমি? নিজের পরিচয় দিচ্ছি। গানবাজনা আর সাংবাদিকতা করি। ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধের আন্দোলনে আছি আমরা, যারা কলকাতা থেকে এসেছি। বলছি, বাইরের লোকদের আপনারা খুব ভেবেচিন্তে গ্রামে ঢুকতে দেবেন। বিন্দুমাত্র সন্দেহ হলেই তাকে ছেড়ে দেবেন না। যে কেউ সি পি আই এমের চর হতে পারে। সি পি আই এম যা যা করেছে ও করছে তার জবাব কী হওয়া উচিত তা আপনারা ভালোই জানেন। তরুণদের দল জোরে হাততালি দিয়ে উঠছেন।

আমি বলছি, অবস্থা আজ এমন যে মেয়েদেরও অস্ত্র হাতে লড়তে হতে পারে। আপনারা অনেক ক্ষমতা রাখেন। পুরুষদের চেয়ে কিছু কম যান না। মেয়েরা শরীর চর্চা করুন। শরীরের দিক দিয়ে দুর্বল যেন আপনারা না হন। লড়াই-এর প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলছি আমি। বলে চলেছি, কিন্তু মনে মনে জানি অপুষ্টিতে ভোগা আমাদের এই অসহায় গ্রামবাসীরা মার খেতে খেতে, নির্যাতিত হতে হতে আজ যে জায়গায় এসে পৌঁছেছেন সেখানে দস্তুরমত প্রশিক্ষিত যোদ্ধা ছাড়া কেউই তাঁদের বাঁচাতে পারবে না। নিজের ক্লীবত্বের কথা ভেবে ঘেন্না ধরে যাচ্ছে নিজের ওপর। এরই মধ্যে আমি বলছি, তাঁদের কী কী লাগবে তা যদি তাঁরা আমাদের জানান।

শ্রোতাদের সারি থেকে এক প্রবীণ এগিয়ে আসছেন আমার দিকে। তাঁর মাথায় সাদা টুপি। গালে সাদা দাড়ি। দীর্ঘদেহী সেই মানুষটি আমায় বলছেন: আমায় নামাজ পড়তে যেতে হবে, বেশি সময় নেই। **শুনুন—আমি বেঁচে থাকলে আপনি ভাত পাবেন। তাই চাল ডাল পাঠাবেন না আমাদের। একখানা এস এল আর দিন।**

'আমি বেঁচে থাকলে আপনি ভাত পাবেন'— জীবনে কোনও দিন এমন কথা শুনিনি কারও মুখে। কথাগুলো আমার মাথার ভেতরে খোদাই হয়ে যাচ্ছে। আমি আর ঠিকমতো ভাবতে পারছি না। এস এল আর? প্রথম কয়েক মুহূর্ত প্রায় খাবি খেতে খেতে ভাবছি : সিংগ্‌ল লেন্স রিফ্লেক্স ক্যামেরা! কেন! ক্যামেরা কেন!

(সেল্ফ লোডিং রাইফেল কথাটা আমার মাথায় আসেনি।)

আমার বোকাবোকা মুখ দেখে আর-এক গ্রামবাসী এগিয়ে এসে বলছেন : চাচা বলছেন কালাশনিকভ রাইফেলের কথা। সি পি আই এমের সঙ্গে ওয়ান শটার টু শটার দিয়ে লড়াই করা যাচ্ছে না। ম্যাগাজিনওলা বন্দুক চাই। এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা দাম। একটা যদি দেন তো খুব উপকার হবে আমাদের।

সাতেঙ্গাবাড়ি থেকে ফেরার পথে সুকুমার মিত্র আমাদের গাড়িতে। আমার মাথায় শুধু কালাশনিকভ। তৃতীয় বিশ্বের মুক্তিসংগ্রামের প্রতীক। ফারুক, তোর মনে আছে? কত বছর আগে খবর তর্জমা করতে করতে হঠাৎ বলেছিলি তুই আমায়? তার এক বছর পরই আমেরিকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিকারাগুয়া চলে গেলাম আমি। নিকারাগুয়া লিব্রে। মুক্ত নিকারাগুয়া। তুই মুক্তিযুদ্ধ দেখেছিলি বাংলাদেশে। অংশ নিয়েছিলি সেই যুদ্ধে। বাংলাদেশ লিব্রে! আমি কোনও মুক্তিযুদ্ধেই সামিল হতে পারিনি। কিন্তু ২০০৭ সালের নভেম্বর মাসের তিন তারিখ পশ্চিম বাংলার সাতেঙ্গাবাড়ি গ্রামে এক মুক্তিযোদ্ধা প্রবীণ কৃষকের কাছে শুনলাম কালাশনিকভ রাইফেলের দাবি। তৃতীয় বিশ্বের এক অত্যাচারিত, ধর্ষিত গ্রাম সাতেঙ্গাবাড়ির মুক্তিসংগ্রামের প্রতীক সেই কালাশনিকভ। এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা আমরা কয়েক জন বন্ধু মিলে জোগাড় করে ফেলব। কিন্তু ম্যাগাজিনওলা সেই রাইফেলটা কোথায় পাবো, সাতেঙ্গাবাড়ির চাচা?

ফারুক, সি পি আই এমকে হারিয়ে আমি লোকসভা ভোটে জিতেছি এই খবরটা পেয়েই তুই আমায় ফোন করেছিলি জার্মানি থেকে। ভোটের ফল বেরোনোর পরের দিনই। বলেছিলি : দেখিস, দুম করে ছেড়ে দিস না যেন। তুই তো এসবের লোক নস।

কিসের লোক আমি বল তো?

এই বইটা লিখতে লিখতে সাতেঙ্গাবাড়ির জায়গায় এসে আর একবার মনে হচ্ছে কিছুরই লোক নই বোধহয় আমি। নই সাপ নই ব্যাং নই আমি কিচ্ছু। সুকুমার রায়ই সত্য, বুঝলি? এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা তুলতে পারতাম রে। দু দিনে। কিন্তু এ কে ফর্টি সেভেন কোথায় পাওয়া যায় আমি

জানতাম না, জানি না। বম্বের এক অভিনেতার বাড়িতে নাকি পাওয়া গিয়েছিল। নামজাদা হিরো রে। তার মানে লোকটা কোনও একটা সোর্স থেকে পেয়েছিল বা কিনেছিল। সে-সব সোর্স কি আর আমার মতো নই-সাপ-নই-ব্যাংদের থাকে? আমরা সাতেঙ্গাবাড়ি যাওয়ার ঠিক দু দিন পরে সি পি আই এমের খুনে-বাহিনী ঐ গ্রামে জেনোসাইড করে। গণহত্যা। আবার। সেই চাচা, যিনি এস এল আর চেয়েছিলেন, যিনি বলেছিলেন আমি বেঁচে থাকলে আপনি ভাত পাবেন তাই চাল ডাল দেবেন না, একটা এস এল আর দিন, সেই চাচার ওপর কটা গুলি চালিয়েছে শাসকদলের ভাড়াটে কিলাররা? আর সেই মানুষটি, যিনি এগিয়ে এসে বলেছিলেন ওয়ান শটার টু শটার দিয়ে সি পি আই এমের সঙ্গে লড়া যায় না, যিনি এমনকি কালাশনিকভের দামও বলে দিয়েছিলেন, তিনি? কটা বুলেট তাঁর শরীরে ঢুকেছে ২০০৭ সালের পাঁচই নভেম্বর?

দশ

পাঁচই নভেম্বর ২০০৭ সাতেঙ্গাবাড়িতে সি পি আই এমের ঘাতক বাহিনী চরম আক্রমণ ও গণহত্যা শুরু করল। নন্দীগ্রাম গণহত্যার দ্বিতীয় পর্যায়। তার ঠিক দু দিন আগে আমরা সাতেঙ্গাবাড়ি থেকে ফিরেছি। আমার সমানে মনে পড়ছে সেই চাচার কথা যিনি একটা সেল্ফ লোডিং রাইফেল চেয়েছিলেন। যিনি বলেছিলেন : আমি বাঁচলে আপনি ভাত পাবেন। মনে পড়ছে সেই গ্রামবাসীর কথা যিনি বলেছিলেন : 'ওয়ান শটার টু শটার দিয়ে সি পি আই এমের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব নয়।'

এবারে কী করব আমরা। মিটিং মিছিল করে আর কি কোনও লাভ আছে। আমার আর তা মনে হচ্ছে না। আমি প্রস্তাব দিচ্ছি—মহাশ্বেতা দেবী আর আমি এই শহরে কোথাও একটা গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিই, তাতে যদি গণহত্যা থামে। পাগলের প্রলাপ। যাদের বলছি তারা আমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকছে কিছুক্ষণ। এখানে ওখানে সভা হচ্ছে খবর পাচ্ছি। আর ভাল্লাগ্‌ছে না।

৬ই নভেম্বর তৃণমূল ভবনে কৃষিজমি-রক্ষা কমিটির সভা। আমি একটা গাড়ি ভাড়া করেছি। অসীম আর আমি সেখানে গিয়ে দেখছি কয়েকজন নামজাদা মানুষ হাজির। দুই অবসরপ্রাপ্ত আই এ এস দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুরশেদ মহাশয়। এই প্রথম এই ভদ্রলোককে দেখছি এই ধরনের সভায়। দেবব্রতবাবু, যিনি ছিলেন বামফ্রন্টের প্রসিদ্ধ 'অপারেশন বর্গা'র স্থপতি, কৃষিজমি-রক্ষার আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। 'তারা চ্যানেলে'র 'মতামত' অনুষ্ঠানে জমি অধিগ্রহণ, সিঙ্গুর, সি পি আই এম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকারের ভ্রান্ত নীতি ইত্যাদি বিষয়ে একাধিক আলোচনায় তাঁকে অতিথি

হিসেবে পেয়েছি এবং পাণ্ডিত্য, অভিজ্ঞতা, ধারালো মেধা ও ব্যঙ্গের এক অনন্য মিশেল দিয়ে রাজ্য সরকার, বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করে মাতিয়ে দিয়েছেন সকলকে। তৃণমূল ভবনের সভায় হাজির হয়েছেন তৃণমূল দলের নেতা সৌগত রায়, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, পি ডি এসের নেতা সমীর পুততুণ্ড, দুই অ্যাকটিভিস্ট রাজা সরখেল ও প্রসূন চট্টোপাধ্যায়, যাঁরা বর্তমানে ইউ এ পি এ নামে এক ভয়ঙ্কর আইনে জেলে আটক রয়েছেন, টাসাম সংগঠনের ভাস্কর গুপ্ত ও অনুপ বন্দ্যোপাধ্যায়, নকশালপন্থী পূর্ণেন্দু বসু, প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দোলা সেন এবং আরও অনেকে। আমি তখন এত উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ যে ভাল করে খেয়ালও করছি না কে আছে কে নেই।

মমতার সঙ্গে তার আগেই আলাদা একটা ঘরে কিছু কথা হয়েছে। সেখানে সুনন্দ সান্যালও ছিলেন। মমতাও দৃশ্যত ক্রুদ্ধ। আমি তাঁকে বললাম— সাতেঙ্গাবাড়িতে যা দেখে এসেছি এবং তারপর সি পি আই এম সেখানে যেভাবে নির্বিচারে আক্রমণ করছে, গ্রামবাসীদের খুন করছে তারপর আমি সশস্ত্র প্রতিরোধ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছি না। এইসব বিষয়ে সবার সঙ্গে আমি আর নিজেকে মেলাতে পারছি না। আমার মনের অবস্থাটা মমতা বুঝলেন বলেই মনে হল। আমি তাঁকে এও বললাম যে আমি আশা করেছিলাম সি পি আই এম আবার নন্দীগ্রামে গণহত্যা শুরু করার জবাবে আমরা আজ কলকাতা শহরটাকে অচল করে দেব। লাগাতার অচল রেখে দেব কলকাতাকে। সি পি আই এম গ্রামবাসীদের ওপর যা খুশি তাই করছে, আমরা তা আটকাতে পারছি না, কেন্দ্রীয় সরকারও কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না, কোনও চেষ্টাই করছে না পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বাধা দিতে, অতএব আমরা কলকাতার নগরজীবন বানচাল করে দেব। কাউকে ভাল থাকতে দেব না। মমতা বললেন, রাজ্যপালের কাছে আমাদের এক প্রতিনিধি দল যাবেন। আমাকেও তিনি বললেন সঙ্গে যেতে। আমায় ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করছিলেন তিনি। আমি তাঁকে সরাসরি বললাম, আমি যাব না। সাতেঙ্গাবাড়ির গণহত্যার পর আমি আর মিটিং, মিছিল, প্রতিনিধি দল এসব ব্যাপারে নেই।

সভায় ভাষণ শুরু হলে আমি মমতাকে বললাম, আমার কিছু কথা

বলার আছে। আমি এই সভায় বেশিক্ষণ থাকতে চাই না, অতএব আমাকে আগেভাগে বলতে দেওয়া হোক।

আমি এত উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ যে আমার সারা শরীর কাঁপছিল। ভাল করে কথা বলতে পারছিলাম না। কাঁপা হাতে মাইক্রোফোন ধরে আমি সাতেঙ্গাবাড়ির বর্ণনা দিলাম। সেই চাচার কথা বললাম। বললাম অন্য গ্রামবাসীর কথাও। আমি জানালাম, আমি মনে করি আমার দায়িত্ব ছিল অন্তত একটা কালাশনিকভ রাইফেল জোগাড় করে সেটা গ্রামবাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। বাস্তবে সেটা সম্ভব নয়। সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া আর কোনও বিকল্প আছে বলে আমি মনে করি না। কিন্তু অস্ত্র জোগাড় করার ক্ষমতা আমার নেই। তাছাড়া, এই সভায় যাঁরা উপস্থিত তাঁরা অস্ত্র প্রয়োগে বিশ্বাসী নন। কাজেই আলোচনা সভায় হাজির থেকে ভাল ভাল কথা বলে ও শুনে আমার কোনও লাভ নেই কারণ আমি রাজনীতিক নই। আমি মূলত সঙ্গীতকার। এর চেয়ে আমি বরং বাড়িতে বসে সঙ্গীতে আমার দক্ষতা বাড়াব, সঙ্গীত রচনা করব। আর এই মুহূর্তে আমি মনে করি এখানে বসে কথা না বলে আমার উচিত কলকাতার অন্তত একটা বড় সড়ক সীমিত সময়ের জন্য হলেও অবরোধ করা। যাঁরা আমার সঙ্গে যেতে চান আর সময় নষ্ট না করে চলুন।

সৌগত রায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, কবীর সুমন ঠিক কথাই বলছেন। অসীম, রাজা, প্রসূন, ভাস্কর, অনুপদা উঠে এলেন।

মমতা বলে উঠলেন—এই কবীরদা, রাজ্যপালের কাছে যেতে হবে যে।

আমি আর কথা বাড়ালাম না। ভাড়া করা গাড়িটায় সকলে মিলে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। গন্তব্য ধর্মতলার মোড়।

আমি চাইছি মেট্রো সিনেমাহলের সামনে বড় রাস্তাটা অবরোধ করতে। অসীম এর আগেই ফোনে খবরটা দিয়ে দিয়েছেন আমাদের অন্য কিছু বন্ধুদের। মেট্রোর সামনে দেখছি আমাদের অনেক দিনের সহযোদ্ধা অরুণকে। তরুণ অ্যাক্টিভিস্ট সৌম্য মণ্ডলকেও দেখছি। ওদিকে অসীমের ফোন পেয়ে সহনাগরিকদের মুক্তমঞ্চের অর্ণব ও সর্বেন্দ্র এসে পড়েছে। একটু আগে কাছেই কোথাও একটা বিক্ষোভ হয়েছে। সেই বিক্ষোভকারীদের কেউ কেউ এসে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সঙ্গে।

সোজা গিয়ে রাস্তার প্রায় মাঝখানে বসে পড়েছি আমি। আমার বাঁদিকে বসে পড়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ভাস্কর গুপ্ত। ভাস্করের বাঁদিকে সৌম্য। অন্যরা বেশ তাড়াতাড়িই বসে পড়েছেন ফাঁকে ফাঁকে। অবস্থান নেওয়ার আগে আমি সকলকে বলে রেখেছি হিংসাত্মক কিচ্ছু করা চলবে না। কাউকে কোনও খারাপ কথা বলা চলবে না। কোনও গাড়ি যদি আমাদের দিকে ধেয়ে আসে তাহলে শুয়ে পড়তে হবে গাড়ির সামনে। যা হয় হোক।

সাতেঙ্গাবাড়ির গণহত্যার খবরে সকলে ক্রুদ্ধ এবং একই সঙ্গে দিশেহারা। আমরা কেউই ভেবে পাচ্ছি না ঠিক কী করা দরকার। সকলের মুখে স্পষ্ট যন্ত্রণার ছাপ। অক্ষম আক্রোশের সঙ্গে অসহায়তার মিশেল। থেকে থেকেই মনে হচ্ছে এখানে যাঁরা মিলিত হয়েছেন তাঁরা সকলেই গণহত্যার প্রতিশোধ নিতে চান—দরকার হলে যে কোনও চরম পন্থায়। আমিও তাইই চাই। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি অহিংস সত্যাগ্রহের পন্থা নিচ্ছি।

এস এন ব্যানার্জি রোডের মোড় পেরিয়ে ধর্মতলার মোড়ের দিকে ধাবমান গাড়িগুলো হঠাৎ অবরোধকারীদের দেখতে পেয়ে সশব্দে ব্রেক কষছে। কোনও কোনও গাড়ি আমাদের অবস্থান রেখা ঘেঁষে দাঁড়াচ্ছে। ইঞ্জিন চালু। আমার ডান দিক থেকে এগিয়ে আসছে পুলিশ বাহিনী। সামনে একাধিক পদস্থ অফিসার। দেখতে পাচ্ছি মেট্রো চ্যানেলে দাঙ্গা পুলিশ বাহিনী নামছে। তাদের হাতে ঢাল আর লাঠি। একজন অফিসার আমার কাছে জানতে চাইছেন, কতক্ষণ এই অবরোধ চালাতে চাই আমরা। আমি বলছি এখনও ঠিক করিনি, আমাদের গ্রেপ্তার করতে পারেন, শুধু হিংসাত্মক কিছু করবেন না, যদি করেন তো তার পরিণামের দায় আপনাদের, আমি এবং আমার কমরেডরা এখন পর্যন্ত অহিংস। আমাদের ওপর জোর খাটাতে এলে আমরা কিন্তু আর অহিংস থাকতে পারব না।

অফিসারটি ভদ্রভাবে জানাচ্ছেন যে তাঁরা আমাদের ওপর কোনও জোর খাটাবেন না।

হঠাৎ দেখতে পাচ্ছি আমার ডানদিকের ফুটপাথে মদন মিত্র দাঁড়িয়ে আছেন শান্ত মুখে। তিনি আমাদের রাস্তা অবরোধে সামিল হচ্ছেন না, কারণ এটা তৃণমূল দলের ডাকা রাস্তা অবরোধ নয়। কিন্তু তিনি হাজির, যদি তাঁকে দরকার হয়।

এদিক ওদিক থেকে আরও লোক আসছে অবরোধে যোগ দিতে। প্রসূন ভৌমিক এসে গিয়েছেন। এবারে আমি এখানকার অবরোধ তুলে ধর্মতলার মোড় আটকে দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছি। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তা কার্যকর। আমি দাঁড়িয়ে আছি মোড়ের ঠিক মাঝখানে। বিক্ষোভকারীরা একটা বড় বৃত্ত তৈরি করে ফেলেছেন। চারদিকের চারটি রাস্তার সমস্ত বাস, মিনিবাস, প্রাইভেট গাড়ি, ট্যাক্সি সব থমকে আছে। ঢাল আর লাঠি নিয়ে পুলিশ তৈরি। দাঙ্গাপুলিশদের মধ্যে অনেকেই দেখছি তরুণ। মুখগুলো শুকনো। তাঁদের কাছে এগিয়ে গিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করছি—কখন থেকে ডিউটি করছ গো তোমরা? কখন খেয়েছ শেষ? মুখগুলো যে বড্ড শুকনো। তোমরা সবাই আমার ছেলের বয়সী।

কয়েকজনের মুখ একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একজন অফিসার আমার দিকে এগিয়ে এসে বলছেন : স্যার, আপনাকেও কিন্তু একটু অসুস্থ দেখাচ্ছে। বেশি স্ট্রেন নেবেন না। আপনি বরং বাড়ি চলে যান। আমরা কি পৌঁছে দিতে পারি আপনাকে?

পুলিশ অফিসারটি খুব ভুল বলেননি। উত্তেজনায়, রাগে, অসহায় ক্ষোভে, ক্লান্তিতে আমি একটু অসুস্থই বোধ করছি। আমি তাঁকে বলছি—অনেক ধন্যবাদ, আমার সঙ্গে গাড়ি আছে আমি নিজেই চলে যাব। তার আগে, এই অবরোধটা চলুক।

পুলিশ আমাদের বাধা দিচ্ছে না, একটু দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য রাখছে আমাদের ওপর। মোড়ে ফিরে আসতেই একদল লোক ওদিকের ফুটপাথ থেকে নেমে এসে আমায় বলছেন : এই সরকারটাকে আর সহ্য করা যাচ্ছে না। আপনি বলুন আমরা কী করতে পারি।

আমি : আমি বলব? সেকি? আমি কি নেতা?

জনতার মধ্যে থেকে একজন : আপনাকে আমরা আগেও দেখেছি। এখানে অনেক সভায় আপনি বক্তৃতা করেছেন, টেলিভিশনের অনুষ্ঠানেও দেখেছি সরকারের বিরুদ্ধে, জনগণের পক্ষ নিয়ে কথা বলতে। আপনিই আজ কিছু বলুন।

আমি : দেখুন, আপনারাই ভোট দিয়ে সরকারকে ক্ষমতায় আনেন, আবার তাকে সরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতাও আপনারাই রাখেন। আপনারাই

পরিশ্রম করেন। আপনারাই দেশ। আপনারাই বিচার করুন। সি পি আই এম এই যে আমাদের গ্রামবাসীদের খুন করছে, ধর্ষণ করছে, তাঁদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করছে, পুড়িয়ে দিচ্ছে, আমাদের চাষের জমি বেচে দিতে চাইছে দেশবিদেশের পুঁজিপতিদের কাছে, এই সি পি আই এম দল ও তাদের সরকারকে হটিয়ে দিন, ফেলে দিন। দূর করে দিন ওদের।

আটকে যাওয়া বাস থেকে অনেকে নেমে এসেছেন। পথ অবরোধকারীদের সঙ্গে তাঁরা কথা বলছেন, আলোচনা করছেন। একজনও ঝগড়া করছেন না। কেউ অভিযোগ করে বলছেন না—এসব কী হচ্ছে, আমাদের গাড়িগুলোকে ছেড়ে দিন, রাত হচ্ছে, আমরা বাড়ি যাব।

বেশ খানিকক্ষণ হয়ে গেল ধর্মতলার মোড় অবরুদ্ধ, কিন্তু জনসাধারণ কী ধৈর্য ও সহমর্মিতার সঙ্গে দেখছেন এই অবরোধ। অভূতপূর্ব এক সংহতিতে আমরা সকলেই আজ বাঁধা। আমার মনে হচ্ছে আজকের মতো যথেষ্ট হয়েছে। আমরা চেয়েছিলাম প্রতীকী অবরোধ করতে। জনগণকে ও সরকারকে আমরা জানাতে চেয়েছিলাম যে আমরা এই গণহত্যার বিরুদ্ধে আছি এবং থাকব। আমরা দেখিয়ে দিতে চেয়েছিলাম সকলে সবকিছু মেনে নেবে না। আমরা জানাতে চেয়েছিলাম সি পি আই এম ও তাদের সরকারের বিরুদ্ধে আমরা অনেকেই আছি ঐক্যবদ্ধ হয়ে এবং সেখানে কোনও দলের পতাকা নেই।

অবরোধে আটকে পড়া সহনাগরিকদের যেতে হবে তাঁদের গন্তব্যে। রাত হয়ে এল। নিজেদের মধ্যে কথা বলে আমরা অবরোধ তুলে নিলাম।

স্বতঃস্ফূর্ত পথ অবরোধে জনগণের এ হেন সহযোগিতা খুব কমই দেখা যায়। সেই রাতে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম শাসকদলের সময় ঘনিয়ে এসেছে।

এগারো

সাতেঙ্গাবাড়ি গণহত্যা বা নন্দীগ্রাম গণহত্যার দ্বিতীয় পর্যায়কে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আখ্যা দিলেন 'নন্দীগ্রামে সূর্যোদয়'। মানুষই পারে।

সেই সূর্যোদয়ের জন্য সি পি আই এম বাহিনী ও পুলিশ কজন গ্রামবাসীকে খুন করেছিলেন কেউ জানে না। মৃতদেহ লোপাট করা খুব শক্ত নয় যদি মোটের ওপর বড় একটা এলাকা হত্যাকারীর দখলে থাকে। এক্ষেত্রে তো খোদ পুলিশই ছিল শাসক দলের পক্ষে। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে সি পি আই এম নেতৃবৃন্দ ও এই রাজ্যের পুলিশ এক নতুন নজির সৃষ্টি করেন। পুলিশের পোশাক পরে সি পি আই এম কাডাররা গ্রামবাসীদের ওপর নির্বিচারে অত্যাচার চালায়। *দৈনিক স্টেট্‌স্‌ম্যান* পত্রিকার এক ফোটোগ্রাফার এই রকম একটি ঘটনার ছবিও তোলেন। এর উল্লেখ আমি ইতিপূর্বে করেছি।

নন্দীগ্রামে একাধিক জায়গায় ডাঁই করা পুলিশের পোশাকও পাওয়া গিয়েছিল। দস্তুরমত অর্ডার দিয়ে বানানো হয়েছিল পুলিশের পোশাক। তবে পুলিশ যে বুটজুতো পরে সেই বিশেষ ধরনের জুতো অর্ডার দিয়ে বানানো হয়নি, রেডিমেড কেনাও হয়নি। প্রায়ই তাই দেখা গিয়েছে সি পি আই এম কাডারদের গায়ে পুলিসের পোশাক, কিন্তু পায়ে সাধারণ জুতো এমনকি চপ্পল। মাথার টুপি বা হেলমেটও পেয়েছিল বিচিত্র রূপ। এই হচ্ছি আমরা। কোনও কাজই ঠিকমতো করে উঠতে পারি না। জোচ্চুরিটাও ঠিকমতো পারি না, ধরা পড়ে যাই। ঠিক ফাঁক থেকে যায় কোথাও না কোথাও। গুণ্ডা-বরতনু পুলিশের পোশাকে ঢাকা, বাংলা-জুতো পায়ে আর স্কুটার-চালকদের সবচেয়ে সস্তা হেলমেট কোনওরকমে মাথায় বসানো সি পি আই এমের

কাডারদের ছবি কাগজে দেখে হাসব না কাঁদব ভেবে পাচ্ছিলাম না। এই দিকটায় বুদ্ধদেববাবুদের একটু নজর দেওয়া উচিত ছিল। জাতি বটে একখানা। এই দেশের কোনও শাসককেই সিরিয়াসলি নেওয়া মুশকিল। তবে জনগণের ওপর যে অত্যাচার তাঁরা করেন সেটিকে সিরিয়াসলি নিতেই হয়।

নন্দীগ্রাম গণহত্যার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হওয়ার পর আমি কিছুদিনের জন্য হলেও এক ধরনের মানসিক বৈকল্যের শিকার হলাম। আগেই বলেছি সাতেঙ্গাবাড়ির অভিজ্ঞতা, সি পি আই এম ঘাতক বাহিনীর অত্যাচারের যে নিদর্শন সেই গ্রামে দেখেছিলাম, প্রবীণ এক কৃষিজীবী এবং মধ্যবয়সী এক গ্রামবাসীর কাছে শেষবেলায় যা শুনেছিলাম তা ভোলা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না, আজও হয়নি, কোনওদিন হবেও না। আমার মৃত্যুর মুহূর্তেও হয়ত শুনতে পাবো সেই প্রবীণের শান্তকণ্ঠ : 'আমায় নামাজ পড়তে যেতে হবে, বেশি সময় নেই। শুনুন, আমি বাঁচলে আপনি ভাত পাবেন, তাই চালডাল দেবেন না। একটা এস এল আর দিন।'

২০০১/২০০২ সালে বাংলাদেশের *প্রথম আলো* পত্রিকায় একটা খবর পড়েছিলাম, যার শিরোনাম ছিল : আল্লাহ্, আমার গেরামে ভাত ছেটাইয়া দাও। বাংলাদেশের কোনও এক গ্রামের কৃষকের উক্তি। তিনিও প্রবীণ। তাঁর ছবিও ছাপা হয়েছিল।

আমার সময়ে বাংলার দুই প্রবীণ কৃষক। একজন বলছেন : আল্লাহ্, আমার গেরামে ভাত ছেটাইয়া দাও। আর-একজন বলছেন : আমি বাঁচলে আপনি ভাত পাবেন।

বেশ কয়েক বছর হল, এখানকার এক পত্রিকায় এক খনি দুর্ঘটনার রিপোর্ট পড়েছিলাম। কিছু খনি শ্রমিক আটকা পড়েছিলেন খনিতে। জল ঢুকতে শুরু করে। ত্রাণচেষ্টায় কাজ হয়নি। শ্রমিকরা জলে ডুবে মারা যান। পরে দেখা যায় এক শ্রমিকের হাতঘড়ির নিচে একটা চিরকুটে পেন্সিল দিয়ে হিন্দি ভাষায় লেখা : 'এখন সকাল দশটা বেজেছে। আমি এখনও বেঁচে আছি।' *অভি তক জিন্দা হুঁ।*

আজ ২১ অক্টোবর ২০১০। আমি এই বইটি লিখে চলেছি। এক একটা অংশ লিখছি আর পি ডি এফ ফাইল করে পাঠিয়ে দিচ্ছি ইন্টারনেটে

আমার প্রকাশকের কাছ। এখনও বেঁচে আছি আমি। এই বইটি যদি কেউ পড়েন তিনিও জীবিত মানুষ হতে বাধ্য। জলে ডুবতে ডুবতে (সেই মুহূর্তে হয়তো জল তাঁর কোমর অবধি উঠেছে। তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা অপেক্ষা করছেন শেষ মুহূর্তে যদি কোনক্রমে প্রাণে বেঁচে যান তাঁরা!) এক শ্রমিক পকেটে এক টুকরো কাগজ খুঁজে পেয়ে পেন্সিল দিয়ে তাতে লিখছেন : এখন সকাল দশটা বেজেছে। আমি এখনও বেঁচে আছি। তারপর সেই চিরকুট তিনি গুঁজে রাখছেন তাঁর হাতঘড়ির নিচে। হাতঘড়ি আর তাঁর কব্জির চামড়ার মাঝখানে কাগজের টুকরোটা।

কেন লিখছিলেন তিনি ঐ কথাগুলো? কী মনে করে? ইনি কি টের পেয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁর বাঁচার কোনও সম্ভাবনাই নেই, তাও তিনি লিখে রাখছেন অথবা সেই কারণেই তিনি লিখে রাখছেন যাতে কেউ একজন তাঁর মৃতদেহ থেকে চিরকুটটা পেয়ে যান এবং পড়েন। কাগজের রিপোর্টে বিষয়টা জানার পর আমার মনে হয়েছিল আমিই সেই ব্যক্তি যে চিরকুটটা পেয়েছে।

এখনও বেঁচে আছি আমি। খানিক পরে আর থাকব না। তখন তুমি জানবে যে তোমার জন্য আমি লিখে রেখে গিয়েছিলাম কথাগুলো। তুমি বেঁচে থাকবে এই জ্ঞান নিয়ে তোমার দেশের, পৃথিবী নামে তোমার এই সুন্দর গ্রহের একজন শ্রমিক খনিতে নেমে কাজ করতে গিয়ে খনিতে ঢুকিয়ে দেওয়া জলে ডুবে মারা গিয়েছিল। সকাল দশটা অবধি সে কিন্তু বেঁচে ছিল, এই মুহূর্তে তুমি যেমন বেঁচে আছো।

সাতেঙ্গাবাড়ি থেকে ফিরতে ফিরতে (এখনও, এই বইটা লিখতে লিখতেও ফিরছি আমি ঐ গ্রাম থেকে/বাকি জীবনও আমি হয়তো ওখান থেকেই ফিরব) আমার সমানে মনে হচ্ছিল শেষবেলায় দুই বয়স্ক গ্রামবাসীর কাছে শোনা কথাগুলো। ***আমি বাঁচলে আপনি ভাত পাবেন। এস এল আর দিন। চাচা বলছেন, ম্যাগাজিনওলা বন্দুক...ওয়ান শটার টু শটার দিয়ে সি পি এমের সঙ্গে লড়াই করা যায় না...***

পাঁচই নভেম্বর সাতেঙ্গাবাড়িতে ঘাতক বাহিনী গণহত্যা শুরু করার পর আমার শুধু মনে হচ্ছিল —আমার কাছে আমার অন্নদাতারা প্রাণের দায়ে, ভাতের দায়ে যা চেয়েছিলেন আমি তাঁদের তা দিতে পারিনি। বুদ্ধদেব

ভট্টাচার্য মশাই-এর সূর্যোদয়ের মরণকামড়ে সেই দুজন কি আর বাঁচতে পেরেছেন? সাতেঙ্গাবাড়ির সেই মহিলারা, যাঁরা আমাদের কাছে কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন তাঁদের সর্বনাশের কথা? আর, বিরসা মুণ্ডা, সূর্য সেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকি, গোপীনাথ সাহা, বিনয়-বাদল-দীনেশের সেই শ্যামলবরণ, নবীন নাতিপুতিরা, যাঁরা অনতিদূরে ছাউনি গেড়ে থাকা সি পি আই এমের ঘাতকদের বন্দুকের গুলি থেকে আমাদের রক্ষা করার জন্য মাঠে মাঠে বন্দুক উঁচিয়ে ক্রল্ করছিলেন আশ্চর্য সরীসৃপের মতো আর মাঝেমাঝেই গুলি চালাচ্ছিলেন জানান দিতে যে আমরাও তৈরি? এখনও বেঁচে আছি। নভেম্বরের তিন, চার তারিখ পর্যন্ত তাঁরা সম্ভবত বেঁচে ছিলেন। তারপর?

আমি কিন্তু এখনও বেঁচে আছি।

কবুল করছি, নন্দীগ্রামে সূর্যোদয় অর্থাৎ গণহত্যার খবর পাওয়ার পর থেকে আমি বিকল হয়ে গিয়েছিলাম। বাড়ি থেকে আর বেরোইনি। শুনতে পাচ্ছিলাম এক মহামিছিলের প্রস্তুতি চলছে। শুনতে পাচ্ছিলাম হাজার হাজার মানুষ তাতে অংশ নিতে চলেছেন। শুনতে পাচ্ছিলাম কোনও কোনও সুধী নাগরিক ও সংগ্রামী বলছেন **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেন সেই মিছিলে না হাঁটেন**। পরিচিত কারও কারও নাম শুনতে পাচ্ছিলাম, সেই মর্মে এস এম এস বার্তা প্রচারিত হচ্ছে। আমি ঠিক করে ফেলেছিলাম যে মিছিল থেকে মমতাকে দূরে রাখার এ হেন চেষ্টা আয়োজকরা করতে পারেন সেই মিছিল থেকে আমারও দূরে থাকাই ভাল।

'বামের পাশে বসলে সিদ্ধকাম
বামের ঘরে সেঁধিয়ে গেলেই হয়
তোমার পাশে বসলেই বদনাম
সেই কারণেই চাইছি তোমার জয়।'

টেলিভিশনে সেই বিশাল মিছিলের ধারাবিবরণে দেখলাম—দু বছর ধরে সিঙ্গুর নন্দীগ্রামে এত কিছু ঘটে যাওয়ার সময়ে যাঁদের কোথাও দেখা যায়নি, যাঁদের কণ্ঠ শোনা যায়নি, একটুও ট্যাঁ-ফুঁ করেননি যাঁরা, এমনকি তাঁরাও মিছিলে আছেন কোনও না কোনওভাবে। চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেনও সেই মিছিলে ছিলেন বলে শুনলাম। শুনলাম, বন্ধুবর অঞ্জন দত্তও মিছিলে

হেঁটেছেন মৃণাল সেনের কাছাকাছি। দু বছরের গণ-আন্দোলনে এঁদের কণ্ঠ কখনও শোনা যায়নি। অঞ্জন অন্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মানুষ ও শিল্পী। কোনওদিন, কোনও গণ-আন্দোলনেই তিনি থাকেননি। তাঁর শিল্পকর্মে ও সৃষ্টিতে বিশেষ কোনও মতবাদ, পলিটিকাল মনোভাব বা উদ্দেশ্যর পরিচয় পাওয়া যায় নি, যদিও পোখরানের পরীক্ষামূলক আণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর তাঁর একটি গানে ছিল 'দেশপ্রেমের মানে পোখরান'। সেই কাজটিও আবার অঞ্জনই করেছিলেন একটি আধুনিক গান লিখতে গিয়ে, ইন্ডাস্ট্রির অন্যকোনও গান-বাঁধিয়ে করেননি। কিন্তু কখনও কোনও রাজনৈতিক দল বা শিবিরের ঘনিষ্ঠ ছিলেন না অঞ্জন। কারও ব্রিফ তিনি বহন করেননি, থেকে গিয়েছেন নির্দল, সুনির্দিষ্ট মতবাদহীন। সি পি আই এম ঘনিষ্ঠ সোনার দৈনিক পত্রিকা *সোনার বাংলায়* সেই সোনার দলকে না ভজানো, না ডরানোর অপরাধে এই অধমের পাশাপাশি অঞ্জনেরও ঘটা শ্রাদ্ধ করা হত থেকে থেকেই।

আমার মনে পড়ে যাচ্ছে, ১৪ই নভেম্বরের মহামিছিলে তিনি মৃণাল সেনের সঙ্গে থাকবেন এই খবরটা পেয়ে অঞ্জনকে আমি ফোন করেছিলাম। মৃণালবাবু (যাঁর কিছু ছবি আমার খুবই ভাল লাগে এবং যিনি তাঁর সাংসদ-স্থানীয়-উন্নয়ন-তহবিল থেকে হুগলির সংখ্যালঘু বিদ্যাপীঠ আল আমিন মিশনকে বড় অঙ্কের টাকা সুপারিশ করছেন জেনে খুবই ভাল লেগেছিল) সি পি আই এমেও থাকবেন আবার এই মহামিছিলেও, এই তথ্যের প্রেক্ষিতে অঞ্জনকে আমি ঠাট্টা করে বলেছিলাম, জানো তো, জার্মান ভাষায় একটা প্রবাদ আছে : Man kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen। শিথিল তর্জমায় : কেউই একসঙ্গে দুটো বিয়েবাড়ির খ্যাঁট সাঁটাতে পারে না। অঞ্জন হয়তো একটু রুষ্ট হয়েছিলেন। বলেছিলেন, মৃণাল সেনকে তিনি শ্রদ্ধা করেন, এই মিছিলে তিনি হাঁটবেন, অঞ্জনও হাঁটবেন, ব্যাস। এর বেশি কিছু তিনি জানেন না। তবে অঞ্জন যে গণহত্যার বিরোধী তা তিনি বিলক্ষণ বলেছিলেন।

আমি জানি, আমার এই লেখাটি পড়ে অঞ্জন একটুও রাগ করবেন না বা দুঃখ পাবেন না। তাঁর আত্মসম্মানবোধ আছে, আছে উঁচুমানের পরিহাসবোধ। যে আন্দোলনে তিনি জড়িত থাকেননি, যে বিপুল বিচিত্র

গণ-আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি সম্ভবত একটি গানও বাঁধেননি দু বছরে, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পাল্টে যাওয়ার পর একটি বিশেষ যুগসন্ধিক্ষণে পার্থিব কোনও লাভের কথা ভেবে তিনি সেই আন্দোলনে ভিড়ে যেতে চাননি। ফায়দা লোটার আসরে তিনি অনুপস্থিত।

অঞ্জন, তুমি আর আমি এখনও বেঁচে আছি। শুধু, নন্দীগ্রামে আমাদের অন্নদাতাদের মধ্যে অনেকেই আজ বেঁচে নেই। আর সিঙ্গুরে যাঁরা...

বারো

সাতেঙ্গাবাড়ির অভিজ্ঞতা আর দ্বিতীয় পর্যায়ের গণহত্যায় আমি এতটাই বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করে আমি জানিয়ে দিই এই গণ-আন্দোলনে আমি আর থাকতে চাই না। শাসকদল আমাদের গ্রামবাসীদের মেরে ফেলবে, ধর্ষণ করবে আর আমি খালি লম্বাচওড়া কথা বলে সভা গরম করব এ আমি মেনে নিতে পারছি না। কখনোই মমতা আমার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেননি বা কোনও জ্ঞানের কথা বলেননি। সেই সময়ে মমতার মধ্যে এমন এক দার্শনিক স্থৈর্য ও stoicism দেখেছি যা আগে কখনও দেখিনি।

আমার তখন কোনও চাকরি নেই। 'তারা' চ্যানেলের খবর বিভাগের কন্‌সাল্‌টান্ট হিসেবে দ্বিতীয় দফায় যে চাকরিতে ঢুকেছিলাম সেটি যাতে আমি ছেড়ে দিই তার ব্যবস্থা করলেন এক নবাগত নামী সাংবাদিক যাঁর কথা 'তারা'র কর্তৃপক্ষ তখন মেনে চলছিলেন। এত অপমান করলেন তিনি আমায় যে কাজটা আমি ছেড়ে দিলাম। এই গুণধর সাংবাদিকেরই কারণে খবর বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট দেবজ্যোতি চক্রবর্তীও পরে 'তারা'র চাকরিতে ইস্তফা দেন—দেবজ্যোতি তো সেই ব্যক্তি যাঁর উৎসাহে ও সহযোগিতায় 'তারা' চ্যানেলের খবর বিভাগ সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের আন্দোলন ও অভ্যুত্থানের খবর সমানে দিয়ে যেতে পেরেছিল দেশের জনসাধারণকে। বয়সে আমার চেয়ে অন্তত দশ বছরের ছোট দেবজ্যোতি না থাকলে 'তারা'র ক্যামেরা-প্রকৌশলীরা, সাংবাদিকরা, প্রযোজকরা ও সঞ্চালকরা সিঙ্গুরে যাওয়ার পথে পুলিসের হাতে মেধা পাটেকারের হয়রানি থেকে শুরু করে ২০০৭ সালের ১৪ই মার্চ নন্দীগ্রামে গণহত্যা পর্যন্ত বাস্তবভিত্তিক খবরের

ধারা এক নাগাড়ে পরিবেশন করে যেতে পারতেন কিনা সন্দেহ। আপাদমস্তক সৎ ও নির্ভীক সাংবাদিক দেবজ্যোতিকে আমি শুধু সহকর্মী নয়, গণ-আন্দোলনে আমাদের সহযোদ্ধা হিসেবেও দেখেছি এবং মনে রেখেছি।

একে তো চাকরি নেই, তার ওপর সাবিনার তার আগেই ক্যান্সার ধরা পড়েছে। বাংলাদেশ ও সারা দুনিয়ার অসংখ্য ভক্তের প্রার্থনা ও আর্থিক অবদানে সাবিনার চিকিৎসার ব্যাপারে কোনও অসুবিধে ছিল না। কিন্তু চাপা কষ্ট ছিল আমার মনের ভেতর সারাক্ষণ। মমতার সঙ্গে কথা হলে তিনি সব সময়ে বলতেন, কবীরদা, গণ-আন্দোলন নিয়ে এই মুহূর্তে আর বেশি ভেবো না, বরং বৌদিকে সাহস দাও।

কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা কোথাওই নেই দেখে নভেম্বর মাসেই আমি বাড়িতে গান শেখাতে শুরু করি। জীবনে সেই প্রথম গান শেখানোর কথা ভাবলাম। আমার এক বান্ধবী, যিনি মনোরোগ-বিশেষজ্ঞ, শুধুমাত্র আমার রোজগারের কথা ভেবে মিউজিক থেরাপির কোর্স চালু করার পরিকল্পনা করছিলেন।

এইরকম সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন আমায় ডাক পাঠালেন। সি পি আই এম বিরোধী গণ-আন্দোলনের খবর টেলিভিশনে স্বাধীনভাবে দেওয়ার জন্য নিজেদের একটা চ্যানেল যে চাই সে-ব্যাপারে মমতা আর আমি এমনিতেই একমত ছিলাম। ফোনে মমতা জানালেন সেই বিষয়েই তিনি কথা বলতে চান আমার সঙ্গে। সি পি আই এম ঘেঁষা চ্যানেল ২৪ ঘণ্টা ছেড়ে বিরক্ত হয়ে চলে আসা সৎসাংবাদিকতানিষ্ঠ অনুপম কাঞ্জিলাল ও আর এক বেপরোয়ারকম অঙ্গীকারবদ্ধ সাংবাদিক রীতেন রায়চৌধুরী সমানে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে আসছিলেন প্রকৃত টেলিভিশন সাংবাদিকতার কোনও সুযোগ পাওয়া গেলে তার সদ্ব্যবহার করার লক্ষ্যে। আমরা তিনজনই চাইছিলাম কারও পোঁ না ধরে টেলিভিশন সাংবাদিকতা করতে যার বৈশিষ্ট্য আপাতত হবে সি পি আই এম ও বামফ্রন্ট সরকারের বিরোধিতা করা। অনুপম ও রীতেনের ধারণা ছিল আমার যোগাযোগ ভাল, কোনও না কোনও চ্যানেল আমায় খবরভিত্তিক অনুষ্ঠান করার জন্য ডাকবেই।

ধারণাটা যে কতটা ভুল তা তাঁরা এতদিনে বুঝেছেন নিশ্চয়ই। যাই হোক, টেলিভিশন চ্যানেলের বিষয়ে কথা বলার জন্য মমতা আমায় ডাকায় অনুপম ও রীতেনের সঙ্গে এবারে বোধহয় ভাল একটা অনুষ্ঠান করার সুযোগ মিলবে এই ভেবে আমি বেশ পুলক বোধ করছিলাম। মনে মনে ছক করতে শুরু করেছিলাম তার আগের চার বছরে দেখে নেওয়া আর কোন্ কোন্ টেলিভিশন কর্মীকে ডেকে নেওয়া যায়। পার্থ দাশগুপ্ত, অনির্বাণ সাধু, তুহিন, সুকান্ত, শুভেন্দু এরকম কারও কারও কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছি তখন। অনেকদিন পর মনটা বেশ তাজা।

মমতার অফিসঘরে মমতা একাই ছিলেন, অপেক্ষা করছিলেন আমার জন্য। আমি ঘরে ঢুকতেই মমতা আমায় বললেন, চলো, ভেতরে যাই।

যে ঘরে তিনি থাকেন সেই ঘরে নিয়ে গেলেন তিনি আমায়। কী ছোট্ট একটা ঘর। জানলা আছে কি? বসলাম। নিষ্প্রভ আলো। মমতা চলে গেলেন দেয়ালে ঝোলানো বা লাগানো একটা র‍্যাকের কাছে। সেখানে কোনও এক বিগ্রহ। আমার কমজোরি হয়ে আসা চোখ দিয়ে ঠাহর করতে পারলাম না বিগ্রহটি কার। সেই বিগ্রহের দিকে মুখ করে মমতা আমায় বললেন, কবীরদা, তুমি তো জানো আমাদের টাকা নেই। এদিকে নিজেদের একটা টিভি চ্যানেল থাকাও দরকার। অনেক টাকার ধাক্কা। এখন পর্যন্ত তুমি আমায় যা যা বলেছ আমি মেনে চলেছি, বলো? এবারে কবীরদা, তুমি আমায় বলো—মমতা, আমি তোমায় আজ্ঞা করছি SEZ মেনে নিতে। এক ঘণ্টার মধ্যে আমি প্রেস কন্‌ফারেন্স করব। কাল সকালে তুমি, ধরো, আশি কোটি টাকা পাবে। তাই দিয়ে তুমি তোমার নিজের চ্যানেল খুলবে, তুমি হবে তার পরিচালক। মনের মতো করে চ্যানেল চালাতে পারবে তুমি।

একটু ধীরে বললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কথাগুলো—এবং জোরে নয়, আস্তে। আমি বললাম, মমতা, চা খাবো। সিগারেটও খেতে হবে। বাইরে চলো, চা খাই।

মমতা সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। তাঁর ছোট্ট ঘরের দেয়ালে ঝোলানো বা লাগানো একটি র‍্যাকে রাখা বিগ্রহের সামনে, শান্ত ভঙ্গিতে। আমার কথা শুনে তিনি বললেন, কবীরদা, আমি অপেক্ষা করছি। আজ্ঞা করো আমায়।

তাঁর ব্যক্তিগত ঘরের নিষ্প্রভ আলোয় আমি দেখছি আমার দিকে প্রায় পেছন ফিরিয়ে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকা আমার যুগের সম্ভবত সবচেয়ে লোকপ্রিয় জননেতাকে। এঁর জন্য বাংলার গ্রামের অনেক মানুষ আজ প্রাণ দিতে পারেন। এঁকে সামনে রেখেই আজ আমরা অনেকে লড়াই করছি মহাবলশালী সি পি আই এম দল আর বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে। ইনি সেই নেতা যাঁকে শাসকদলের একটা গুণ্ডা আর একটু হলেই মেরে ফেলেছিল আর কি। সেই নোংরা ও মারাত্মক আঘাতের জের এই মানুষটি আজও বয়ে বেড়াচ্ছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি একজন রাজনীতিক অতএব তাঁর সঙ্গে আমি এক মঞ্চে থাকব না তাই আমি ১৯৯৪ সালে উলুবেড়িয়ার ময়দানে কানোরিয়া শ্রমিকদের বিশাল জনসভা থেকে একটু দূরে একটি গাড়ির ভেতর অপেক্ষা করছিলাম—কখন তিনি মঞ্চ থেকে নেমে যাবেন আর আমি আমার ব্যাঞ্জো-গিটারটা নিয়ে মঞ্চে উঠব শ্রমিকদের গান শোনাতে, তাঁদের জন্য টাকা তুলতে। মুহূর্তগুলো যে গতিবেগে যাওয়ার কথা তার চেয়ে অনেক ধীরে চলেছে।

কবীরদা, আমি কিন্তু অপেক্ষা করছি। আজ্ঞা করো আমায়। আমায় ন্যাশনাল মিডিয়া ডাকতে হবে। বেশি সময় কিন্তু নেই।

মমতা সেই একই ভঙ্গিতে বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে। আমি হেসে ফেললাম, বললাম, কী হচ্ছে মমতা, জানোই তো ওসব আমি বলব না। প্রশ্নই ওঠে না। আমরা SEZ-এর বিরুদ্ধে লড়াই করছি।

পারলে না, কবীরদা, তাই না? আচ্ছা বেশ, ঐ বিষয়টা বাদ দাও। এবারে তুমি আমায় বলো, মমতা, আমি তোমায় আজ্ঞা করছি পাইকিরি আর খুচরো ব্যবসা বড় পুঁজিপতির হাতে তুলে দেওয়ার বিষয়টা মেনে নিতে। তুমি আমায় একবার বললেই আমি এক ঘণ্টার মধ্যে ন্যাশনাল মিডিয়া ডাকব। কাল সকালে তুমি, ধরো, একশো কোটি টাকা পাবে। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। টেলিভিশন চ্যানেল খুলতে পারবে। তুমিই হবে ডাইরেক্টর। নিজের ইচ্ছেমত চালাতে পারবে সব কিছু।

আমার দিকে একবারও না ফিরে, না তাকিয়ে কথাগুলো বললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঠায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি।

মমতা, আর পারছি না। এবারে চা আর সিগারেট খেতেই হবে।

খাবে। তার আগে আজ্ঞা করো। আমি অপেক্ষা করছি, কবীরদা। মিডিয়া ডাকতে হবে। সময় কম।

আমি সশব্দে হেসে ফেললাম। এতক্ষণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিগ্রহ থেকে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কবীরদা, পারলে না, তাই না?

না। পারলাম না।

আমার দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে মমতা বললেন, তুমি পারলে না। এই হচ্ছে কবীর সুমন আর এই হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের কিছু হবে না, কবীরদা। চলো, বাইরে যাই, চা খাই।

তেরো

লড়াই-এর বিভিন্ন পর্যায় থেকে উঠে আসছে একের পর এক গান। গান উঠে আসছে ঘটনা থেকে, বোধের নানান স্তর থেকে। রিজওয়ানুর রহমানের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গান বাঁধতে শুরু করি ২০০৭ সালেই, যখন তিনি খুন হন। ২০০৮-এর বইমেলায় 'রিজওয়ানুর বৃত্ত' নামে আমার আটটি গানের একটি সিডি-সংকলন প্রকাশ করি আমরা, বন্ধুরা। রিজওয়ানুরের আম্মা কিশওয়ার জাহান সংকলনটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে আমায় কোনও উদ্যোগ নিতে হয়নি। আমার তরুণ কবি-বন্ধুরাই সব ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রসূন ভৌমিক ছিলেন তাঁদের মধ্যে। সত্যি বলতে, আমি ভাবতেও পারিনি রিজওয়ানুর রহমানের মা নিজে এসে দাঁড়াবেন। লজ্জাই করছিল আমার।

২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শ্রেষ্ঠী-পরিবারের মেয়ে প্রিয়াঙ্কা টোডির সদ্যবিবাহিত স্বামী রিজওয়ানুর রহমানের মৃতদেহ পাওয়া যায় পাতিপুকুরে রেললাইনে। তার পর ওঠে প্রতিবাদ বিক্ষোভের তুফান। এই মৃত্যুর পেছনে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে চারদিকে প্রশ্ন ওঠার পর মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য রিজওয়ানুর রহমানের আম্মার সঙ্গে দেখা করতে যান এবং তাঁকে কথা দেন যে ছেলের মৃত্যুর ব্যাপারে তিনি সুবিচার পাবেন। নাগরিক সমাজের নানান স্তর থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও যান সন্তানহারা মায়ের কাছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও যান। এই সময় থেকে বেগম কিশওয়ার জাহানের পরিবারের সঙ্গে মমতার ঘনিষ্ঠতা হয় এবং তা বাড়তে থাকে। ঐ মহল্লায় মমতা একটি সভার আয়োজন করেন এবং আমায় তিনি সেখানে নিয়ে যান। তৃণমূলের রাজনীতিকরা ছাড়াও কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক সেখানে

ছিলেন। এর পর থেকে মমতার বিভিন্ন সভায় এই পরিবারের কাউকে না কাউকে দেখা গিয়েছে। ২০০৮ সালের অগাস্ট মাসে বিভিন্ন দলের অংশগ্রহণে সিঙ্গুর অবরোধের সময়ে মমতার মঞ্চেও রিজওয়ানুর রহমানের মা ও বোন উপস্থিত ছিলেন। বেগম কিশওয়ার জাহান সেই মঞ্চ থেকে ভাষণও দেন। আমি সেদিন মঞ্চে হাজির ছিলাম। জনসাধারণ স্লোগান দিচ্ছিলেন 'রিজওয়ানুর রহমান অমর রহে'। অন্য সকলের মতো আমিও বুঝতে পারছিলাম ঐ যুবকের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের ট্র্যাজেডি রাজনীতির বিষয় হয়ে উঠছে। রাজনীতিতে এমনই হয়ে থাকে।

ভেবে দেখার বিষয় হল— ২০০৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি গভর্নমেন্ট রেলওয়ে পুলিশ অফিসার অরিন্দম মান্নার মৃতদেহ পাওয়া যায় রিজওয়ানুরের মতোই রেললাইনের ধারে, তাঁর কর্মস্থল থেকে অনেকটা দূরে। জি আর পি অফিসার অরিন্দম মান্না রিজওয়ানুরের বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করছিলেন। তাঁর মৃতদেহের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। তাঁর দুটি মোবাইলের দুটিই পুলিশ খুঁজে পায়, কিন্তু তার একটিতেও সিম কার্ড ছিল না।

রিজওয়ানুর রহমানের মৃত্যু বেশ তাড়াতাড়িই রাজনীতির মঞ্চে স্থান পেল। অরিন্দম মান্নার মৃত্যু কিন্তু পেল না। দুটি মৃত্যুই খুন। দুটির মধ্যে স্পষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। তাহলে অরিন্দম মান্নার খুন হওয়া নিয়ে বামসরকারবিরোধীরা সরব হলেন না কেন? রিজওয়ানুর রহমান মুসলমান। অর্থাৎ আবার সেই মুসলিম ভোটব্যাংক? এটা লক্ষ্য করার মতো যে অরিন্দম মান্নার মৃত্যু নিয়ে এখনও (অক্টোবর, ২০১০) কোনও আলোড়ন হয়নি।

আলোড়ন ঢের বেশি হয় লালগড় বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে। রামবিলাস পাসওয়ান, জিতেন প্রসাদ ও এক শ্রেষ্ঠীকে নিয়ে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী গিয়েছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে একটি ইস্পাত কারখানার শিলান্যাস করতে। ফেরার পথে ভাদুতলায় একটা ল্যান্ড মাইন ফাটে। দিনটি ছিল নভেম্বর মাসের দু তারিখ, ২০০৮। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গায়ে কোনও আঁচ লাগেনি। কিন্তু ছজন পুলিশকর্মী আহত হন, দুজন গুরুতরভাবে। পুলিশ এর বদলা নিল পার্শ্ববর্তী লালগড়ে ঢুকে সাধারণ মানুষদের ওপর অকথ্য

নির্যাতন করে। এর জবাবে আদিবাসীরা পুলিশ সন্ত্রাসবিরোধী জনসাধারণের কমিটি গঠন করেন, যার নেতা হন ছত্রধর মাহাতো। মমতা লালগড়ে গিয়ে ছত্রধর মাহাতোর সঙ্গে দেখা করেন, সভা করেন। সেই সময়কার ছবি সি পি আই এম দল তারপর ঘটা করে দেখিয়ে বেড়ান 'মাওবাদী' ছত্রধরের সঙ্গে মমতার সম্পর্ক যে কত ঘনিষ্ঠ তা প্রমাণ করতে। পুলিশ সন্ত্রাসবিরোধী জনসাধারণের কমিটি 'মাওবাদী' ছিল না। নিরীহ গ্রামবাসীদের ওপর পুলিশের নির্যাতনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়াতেই এই কমিটি গঠিত হয়েছিল এবং কমিটির দাবি ছিল পুলিশ এসে ক্ষমা চাক। রাজ্য সরকার তার ধারকাছ দিয়েও না গিয়ে জনসাধারণের কমিটিকে আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল বানিয়ে তোলেন।

লালগড়ে আদিবাসীরা বিদ্রোহ করার পর কলকাতা থেকে কয়েকজন অভিনেতা অভিনেত্রী ও লেখক লালগড়ে যান এবং ছত্রধর মাহাতোর সঙ্গে কথা বলেন। তাঁরা সম্ভবত লালগড়ের আদিবাসীদের ক্ষোভের কারণ, তাঁরা কী করতে চান, তাঁদের কী দাবিদাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে জানতে চাইছিলেন।

এঁদেরই কয়েকজন সিঙ্গুরে মমতার ধর্ণামঞ্চে মমতার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। মঞ্চের নিচে একটা অফিস-ঘর মতো করা হয়েছিল। কলকাতার দুই অভিনেত্রী ও এক নাট্যকর্মী সেই ঘরে গিয়ে মমতার সঙ্গে দেখা করেন। বৈঠকের পর তাঁরা মঞ্চে গিয়ে মাইক্রোফোনে বলেন: আমরা মঞ্চে আসিনি, আমরা জানতে এসেছি। 'মমতার মঞ্চে আসতে, ঐ মঞ্চ থেকে সিঙ্গুরের কৃষিজীবীদের সঙ্গে সংহতি জানাতে' যাঁদের মনে সে-সময়ে দ্বিধা ছিল ২০০৯-এর লোকসভা ভোটে মমতার দলের বিপুল সাফল্যের পর, তাঁরা (একজন বাদে) 'পরিবর্তিত পরিস্থিতির' সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছেন। এই ধরনের নমনীয়তা না থাকলে আজকের যুগে বোধহয় চলে না। কোনও এক রসিক কবির কটি কথা ইদানীং বড় বেশি মনে পড়ে: 'নইলে রইলে ভ্যাবাচ্যাকা রাস্তায় পড়ে বেঘোরে।'

চোদ্দ

কুৎসিতরকম শ্রেণীবিভক্ত এই দেশে দৈবক্রমে যারা শ্রেণী-আনুকূল্যভোগী পরিবারে জন্মে গিয়েছি তারাই সাধারণত মওকা বুঝে গোছগাছ করে নিতে পারি ভাল। বন্ধুদের মধ্যে এক সময়ে ঠাট্টা করে বলতাম—জন্ম থেকে যা দেখতে দেখতে বুড়ো হচ্ছি তা থেকে মনে হয় আমাদের দেশে বেশিরভাগ মানুষের দুটি পদবি বা উপাধি থাকতে পারে: দাস অথবা গুছাইত। যারা গুছিয়ে নিতে পারে তারা গুছাইত। যারা তা পারে না, তারা দাস। আমি যেমন গুছিয়ে নিতে পারলাম না। দাসই থেকে গেলাম। দাসরাই আমাদের দেশে সংখ্যাগুরু। কারও না কারও, কিছুর না কিছুর দাস। 'ভাগ্যে'র দাস (দৈবক্রমে এমন শ্রেণী বা এমন পরিবারে কেউ জন্মেছে— যেখান থেকে আধুনিক জীবনে ও জগতে এগিয়ে যাওয়া দুষ্কর)। সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দাস। মালিকের দাস। দলের দাস। দলনেতার দাস। অভ্যেসের দাস। বিশেষ একটি সম্পর্কের কারণে কোনও ব্যক্তির দাস। কোনও রীতি বা নিয়মের দাস। ইত্যাদি।

সি পি আই এম এবং তাঁদের নীতি ও পরিকল্পনার বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে যাঁরা দলের কাডার ও পুলিশের হাতে মার খান, ইজ্জত হারান সেই অ-গুছাইতদের কয়েকজনের বক্তব্য জাতীয় মিডিয়ার সামনে ইংরিজি ভাষায় পেশ করার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে দিল্লি পাঠিয়েছিলেন ২০০৮ সালের গরমকালে। রাজ্যবিধানসভায় বিরোধীদলের নেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায় আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার আলাপ ২০০৩ সালের 'তারা' চ্যানেলের 'লাইভ দশটা'য় অনুষ্ঠানের আমল থেকে। বলিয়ে কইয়ে মানুষ। মিশুকে। আবার একটা দূরত্বও রাখতে জানেন। পরিণত

বুদ্ধি ও বিবেচনাবোধের অধিকারী বলেই মনে হয়েছে তাঁকে। ২০০৪ সালের লোকসভা ভোটের সময়ে 'তারা' চ্যানেলের ইলেকশন স্পেশাল অনুষ্ঠানে (লাইভ সম্প্রচারিত) তাঁর সঙ্গে তর্কাতর্কি কম হয়নি, বিশেষ করে বিজেপির সঙ্গে তাঁর দলের গাঁটছড়ার সুবাদে। সেই তর্ককে পার্থ কখনও স্টুডিয়োর বাইরে টেনে আনেননি। টেলিভিশন আলোচনায় যতো তর্ক, কথা কাটাকাটিই হোক আলোচনা শেষ হওয়ার পর কিন্তু আমাদের মধ্যে সম্প্রীতির সম্পর্ক। ২০০৬ সালের গণ-আন্দোলনের সময় থেকে পার্থর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। সেই ঘনিষ্ঠতার জের তিনি কিন্তু কখনই 'তারা' চ্যানেলের (লাইভ) 'মতামত' অনুষ্ঠানে টেনে নিয়ে যাননি। তার ফলে যুক্তিনিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা ও তর্কও হতে পেরেছে আমাদের মধ্যে। মমতার নির্দেশে সাতেঙ্গাবাড়ি গিয়েছিলাম পার্থরই গাড়িতে। অনেক কিছুর সাক্ষী তিনি।

দিল্লিতে জাতীয় মিডিয়ার সামনে মঞ্চে ছিলেন প্রধানত তাপসী মালিকের মা বাবা, সিঙ্গুরের আরও কয়েকজন সংকট-কবলিত কৃষিজীবী এবং নর্মদা শীট। পি ডি এস দলের নেতা সইফুদ্দিনও ছিলেন মঞ্চে। আমার মনে আছে মমতা ছিলেন উইংসের ধারে। কিভাবে তাপসীকে সুপরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়, তাঁকে পুড়িয়ে মারা হয়, তাপসীর বাবা তার বর্ণনা দিচ্ছিলেন। আমার দায়িত্ব ছিল তাঁর কথাগুলি ইংরিজি ভাষায় বলে দেওয়া। আমার যে কী হচ্ছিল তা আমিই জানি। এ-জীবনে আমি অনেকবার দোভাষীর কাজ করেছি—প্রধানত জার্মানিতে ও কলকাতায়। একবার ডর্টমুণ্ড শহরে জার্মানিতে খেলতে যাওয়া ভারতের জুনিয়র হকি দলের দোভাষী ছিলাম আমি ১৯৭৬ সালে। তারপর নানান সময়ে জার্মানির আদালতে বাংলাভাষীদের মামলায় দোভাষী হিসেবে কাজ করেছি। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮০ সাল আমি কলকাতায় করেছি জার্মান-ইংরিজি/বাংলা ভাষার পেশাদার দোভাষীর কাজ। কিন্তু ২০০৬/২০০৭ সালের সি পি আই এম বিরোধী গণ-আন্দোলনে যাঁরা চরম ক্ষতিগ্রস্ত হন তাঁদের দোভাষীর কাজ করতে গিয়ে আমায় ভয়ানক মানসিক কষ্ট পেতে হচ্ছিল। সদ্য-যুবতী তাপসী মালিক তো আমারই মেয়ে। আমার জানা ছিল কিভাবে তাঁকে একাধিক লোক প্রথমে ধর্ষণ করে ও তারপর তাঁকে পুড়িয়ে মারে।

প্রথমে শাসকদল ও তাদের পেটোয়া মিডিয়া বলছিল যে তাপসীর

নিকট-আত্মীয়রাই তাঁর খুনী। এতটাই নিষ্ঠুর ও নির্লজ্জ এই শাসকদল ও তাদের বশংবদ মিডিয়া যে তাপসীর বাবা সম্পর্কেও তারা কুৎসিততম ইঙ্গিত করতে ছাড়েনি। এটাও রাজনীতি। এ জীবনে ভাল অভিজ্ঞতা কিছু হয়েছে। সেজন্য জীবনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু শোচনীয়রকম খারাপ, জঘন্য অভিজ্ঞতা যা হল তারপর এই জীবনটাকে ধিক্কারই দিতে ইচ্ছে করে। তাপসী মালিকের মৃত্যু নিয়ে সি পি আই এম দল ২০০৯ সালের লোকসভা ভোটের সময়ে একটি ভিডিও নাটক করেছিল তাপসীর বদলে অন্য একটা নাম দিয়ে। একাধিক নামজাদা অভিনেতা ও এক জনপ্রিয় মহিলা কবি তার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। শুধুমাত্র দলানুগত্য এবং টাকার জন্য এমন কাজ যে 'শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান' মানুষ করতে পারে কে জানত। একটি মেয়েকে, তা সে যে-দলের সমর্থক যে-দলের বিরোধীই হোক, ঐভাবে শেষ করে দেওয়া হল, সেটা যেন যথেষ্ট নয়। এরপর তাঁকে ও তাঁর মৃত্যু নিয়ে চরম তথ্যবিকৃতি ঘটিয়ে হত-কুৎসিত একটা নাটকের স্ক্রিপ্ট লেখা হল, পেশাদার লোকরা অভিনয় করলেন, নাটকটি শুট করে, এডিট করে সিডি করে সেটি পাড়ায় পাড়ায় দেখানো হল, এত কালের এক রাজনৈতিক দল সি পি আই এম সেই কাজটি করলেন—এর পর আমাদের দেশের রাজনীতি, গণতন্ত্র, ভোট কোনওকিছুর ওপরেই আর আস্থা থাকে না। ভাবি, সি পি আই এম দলে কি একজনও ছিলেন না যিনি এই জঘন্য উদ্যোগে, আর কিছু নয়, শুধু রুচির জায়গা থেকে বাধা দিতে পারতেন?

২০০৯ সালের লোকসভা ভোটে আমায় হারানোর লক্ষ্যে সি পি আই এম দল আমার সম্পর্কে যাচ্ছেতাই কুৎসা ছাপিয়ে তার অসংখ্য কপি বিলি করেছিলেন। কী রুচি তাঁদের। তেমনি, তৃণমূল কংগ্রেসের কয়েকটি স্থানীয় ব্যাপার নিয়ে যখন আমার সঙ্গে দলের কারও কারও বিরোধ দেখা দিল, যখন আমি 'ছত্রধরের গান' অ্যালবামটি বের করলাম, 'অপারেশন গ্রীন হান্ট' ও পশ্চিম মেদিনীপুরে যৌথবাহিনী পাঠানোর বিরোধিতা করলাম, সংসদ ভবনের বাইরে নীরবে, পোস্টার হাতে বিক্ষোভ দেখানোর দাবি জানালাম তখন তৃণমূলপন্থী মহলের কোনও কোনও সাংবাদিক ও লেখক একই ধরনের কুরুচির পরিচয় দিয়ে আমার বিরুদ্ধে লেখালেখি করলেন। যুক্তি দিয়ে বিরোধিতা করা আর ব্যক্তিগত আক্রমণ এক জিনিস নয়।

নচিকেতা চক্রবর্তী, সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময়ে যিনি প্রতিবাদ-বিক্ষোভসভায় অনুপস্থিত ছিলেন, একটি গানও সে সময়ে যাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি, তিনি 'গানওলার অধঃপতন' শিরোনামে একটি ব্যঙ্গ-পদ্য প্রকাশ করেন একটি পত্রিকায়। এই নচিকেতা চক্রবর্তী আমার সঙ্গে বিভিন্ন মঞ্চে যুগলবন্দী অনুষ্ঠান করেছেন, এমনকি ২০০৯ সালে তৃণমূলের মুখপত্র 'জাগো বাংলা'র শারদীয় সংখ্যা প্রকাশ উপলক্ষ্যে কলকাতার উত্তম মঞ্চে। ১৯৯৫ সালে এইচ এম ভি প্রকাশিত 'ছোট বড় মিলে' অ্যালবামে তিনি পেয়েছিলেন আমার আমন্ত্রণ, আমার কথায় সুরে একাধিক গান গেয়েছিলেন তিনি; ১৯৯৬ সালে প্রভাত রায়ের পরিচালনায় 'সেদিন চৈত্রমাস' ছবিতে আমার সঙ্গীত পরিচালনায় তিনি নায়কের লিপে একাধিক গান গেয়েছিলেন। কাক কাকের মাংস খায় না। আমরা, সঙ্গীতশিল্পীরা অভিনেতারা এ ওর বিরুদ্ধে কিছু লিখি না, বরং কেউ আক্রান্ত হলে তার পক্ষ নিয়ে থাকি। নচিকেতা চক্রবর্তী সম্পর্কে প্রকাশ্যে, পত্রপত্রিকায় আমি ভাল কথাই বলে এসেছি বরাবর। তিনি কিন্তু অযাচিতভাবে আমায় আক্রমণ করলেন লেখার আকারে। আবার সেই রুচির প্রশ্ন। অর্থাৎ, আমাদের রাজনৈতিক জীবনে ও রাজনৈতিক অভ্যেসে আমরা কারও বা কোনও কিছুর বিরোধিতা করতে গেলে আর রুচির ধার ধারি না। এই ব্যাপারে, যা দেখা যাচ্ছে, রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিশেষ ফারাক নেই।

দিল্লির জাতীয় মিডিয়ার সামনে তাঁদের মেয়ে তাপসীর মৃত্যু সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাপসীর বাবা মা সমানে কেঁদে যাচ্ছিলেন। উইংসের ধারে মমতা আঁচলে চোখ ঢেকে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম দিল্লির সাংবাদিকদের মধ্যেও কেউ কেউ চোখ মুছছিলেন।

বিন্দুমাত্র কাঁদলেন না বীরাঙ্গনা নর্মদা শীট। নন্দীগ্রামের নর্মদা শীট। মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি আমায় বললেন, দাদা, ওদের বলো—আমার ছেলের বয়সী সি পি আই এমের অনেকগুলো ছেলে এসে আমায় রেপ করল।

পুরুষ হিসেবে লজ্জা করছিল আমার এই কথাগুলি অনুবাদ করে মিডিয়ার সামনে বলতে, তাও বলতে হল। নর্মদা শীট বলে চললেন, দাদা ওদের বলে দাও—আমি আবার রেপ হবো, কিন্তু জমি দেব না।

পনেরো

শাসকদল ও বামফ্রন্ট সরকারবিরোধী গণ-আন্দোলনে বিজ্ঞানী, গবেষক ও শিক্ষকরা এমন এক ভূমিকা নিয়েছিলেন যা সচরাচর দেখা যায় না। সি পি আই এম ও তাঁদের নেতৃত্বাধীন সরকার 'উন্নয়ন উন্নয়ন' করে আস্ফালন করছিলেন সমানে। দীর্ঘকাল এই শব্দটি তাঁদের মুখে শোনা যায়নি। শিল্পোন্নয়ন বিষয়টি নিয়ে হঠাৎই খুব সরব হয়ে উঠলেন তাঁরা। বছরের পর বছর শিল্পোৎপাদন, কৃষি-উৎপাদন, শিক্ষা, কর্মসংস্থান সব ব্যাপারে ভুলভাল তথ্য ও পরিসংখ্যান প্রচার করে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে শুধু দলীয়করণ ঘটিয়ে, পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি চালিয়ে, বিরুদ্ধবাদীদের কণ্ঠরোধ করে, সর্বত্র, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে জুলুমবাজি খাটিয়ে সি পি আই এম এই রাজ্যটাকে সাফল্যের সঙ্গে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন— 'সবার পিছে সবার নিচে সব-হারাদের মাঝে।'

অন্যদিকে, ভারত সরকারও অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাঁদের নব-উদারনীতির মায়া-চশমা পরে জমি অধিগ্রহণ, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন কেন্দ্র, পরমাণু চুল্লি ও পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প ইত্যাদি বিষয়ে কিছু বছর যাবৎ যে মনোভাব পোষণ করছিলেন, যেসব জনবিরোধী-পরিবেশবিরোধী নীতি গ্রহণ করতে চাইছিলেন সেগুলি নিয়েও সমাজের সচেতন লোকস্তরে জমে উঠছিল প্রশ্ন, ক্ষোভ, বিরক্তি, আশঙ্কা। পশ্চিম বাংলার শাসক দল 'মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট' নাম নিয়েও কার্যত ভারত সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী পরিকল্পনা ও নীতির হাত ধরেই চলতে চাইছেন বলে মনে হচ্ছিল। SEZ, Chemical Hub, পরমাণু চুল্লি, কৃষির ক্ষেত্রে আমাদের দেশ, আমাদের দেশের কৃষকসমাজ ও স্বাভাবিক

কৃষিপদ্ধতি বিরোধী নীতি ও পন্থা, বিশেষ করে বৃহৎ পুঁজি ও বহুজাতিক সংস্থাগুলির ক্রমবর্ধমান ভূমিকা ও ক্ষমতা এইসব বিষয়ে—আমাদের বিজ্ঞানী ও অধ্যাপকসমাজের এক অংশ ক্রমশই সরব হয়ে উঠছিলেন। কয়েক বছর ধরে তঁদের মধ্যে কেউ কেউ, যাঁরা শাসকদলের বশংবদ নন, বিভিন্ন পুস্তিকা লিখছিলেন। এই ধরনের বিজ্ঞানীরা আমাদের সমাজে যথাযোগ্য মর্যাদা পাননি। নদীর বাঁধ, নদীর ভাঙ্গন, নদীর গতিপথের সম্ভাব্য পরির্বতনের মতো অতি জরুরি বিষয় নিয়ে যে বিজ্ঞানীরা গবেষণামূলক কাজ করে চলেছেন তাঁরাও জনসাধারণকে তাঁদের কথাগুলো জানানোর সুযোগ পাননি বিশেষ। তেমনি, পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প সম্পর্কে সরকারের তরফে প্রচার করা মিথ্যে ও 'মিথ' এবং পরমাণু চুল্লির সম্ভাব্য বিপদ নিয়েও বিবেকবান পণ্ডিত ব্যক্তিরা দেশের সাধারণ মানুষদের কাছে বিশেষ কিছু জানানোর সুযোগ পাননি।

'তারা' চ্যানেলের 'লাইভ দশটায়'ও 'মতামত' অনুষ্ঠানদুটি করতে গিয়ে আমরা, অনুষ্ঠান-পরিকল্পকরা, চেষ্টা করে গিয়েছি বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে বিভিন্ন জরুরি তথ্য জেনে নিতে এবং টেলিভিশন দর্শকদের সামনে তা পেশ করতে। ভারত সরকারের নানান ভ্রান্ত নীতির কারণে মানুষ, প্রাণীজগৎ, উদ্ভিদজগৎ ও জলহাওয়ার যে কী সর্বনাশ হতে পারে সে বিষয়ে যখন পেরেছি আলোচনার ব্যবস্থা করেছি আমরা আমাদের 'মতামত' অনুষ্ঠানে। সেই সুবাদে পরিচয় হয়েছে অধ্যাপক সুজয় বসু, অধ্যাপক শুভেন্দু দাশগুপ্ত, অধ্যাপক কল্যাণ রুদ্রর সঙ্গে। অধ্যাপক সুজয় বসু যেমন মাত্র কয়েক বছর আগে আমায় বলেছিলেন : কবীরভাই, আমায় তুমি তিন-চার জন মানুষ এনে দাও, আমি একটা ল্যাম্পপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হলেও তাদের বোঝাবো পরমাণু চুল্লী কী ভয়ানক, পরমাণু বিদ্যুৎ সম্পর্কে সরকার যা বলছেন তা কতোটা অযৌক্তিক ও অসত্য।

বাংলার বিজ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা জনদরদী ও জীবনদরদী, স্বাধীনচেতা ও বিবেকবান তাঁরা নানা বিষয়ে সরব হতে শুরু করেছিলেন, বই ও পুস্তিকা লিখছিলেন, বিষয়ভিত্তিক সেমিনারে ভাষণ দিচ্ছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন নীতির কারণে বিচলিত বোধ করছিলেন, ক্রমশ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিলেন। শেষে, সিঙ্গুরে টাটার ন্যানো গাড়ির কারখানা তৈরি নিয়ে

সি পি আই এম সরকার উন্নয়ন-বুকনির তুবড়ি ছোটানোয় বাংলার বিভিন্ন মহলের লোকদের সঙ্গে বিজ্ঞানীরাও চলে এলেন প্রত্যক্ষ সরকারবিরোধিতার ময়দানে। সি পি আই এম ও তাদের সরকারের বিরুদ্ধে যে গণ-আন্দোলন তার একটা আবেগময় দিক ছিল। জনগণকে খেপিয়ে তোলা ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য রাজনৈতিক অ্যাক্টিভিস্টরা তাঁদের বক্তৃতায় সেই আবেগের শরণ নিচ্ছিলেন। শিল্পী, কবি, অভিনেতা, নাট্যকর্মী ও সঙ্গীতশিল্পীরা সেই একই আবেগকে করে তুলছিলেন তাঁদের উপাদান ও হাতিয়ার।

তাঁদের পাশাপাশি বিজ্ঞানীরা শান দিচ্ছিলেন অনেক বেশি যুক্তিতে, বৈজ্ঞানিক কারণ-ব্যাখ্যায়। সিঙ্গুরের বিক্ষোভ-বিদ্রোহ ও নন্দীগ্রামের গণ-অভ্যুত্থানের সমর্থনে বিজ্ঞানীরা যেভাবে তাঁদের যুক্তিসমৃদ্ধ বক্তব্য ছোট-বড় জনসভার পর জনসভায় পেশ করছিলেন সেটা ছিল, আমার মতে, এই বিপুল গণ-আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বময় বৈশিষ্ট্য। কারণ রাজনৈতিক আবেগ ভাবাবেগের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ মতবাদের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকে। বিশেষ একটি যুগমুহূর্তে কোনও না কোনও দল সেই আবেগের ঢেউ-এর মাথায় চেপে নিজেদের মতবাদগত বা তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধি করে থাকেন। এটাই দুনিয়ার নিয়ম। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও যুক্তি কোনও দলের তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির চেয়ে পরিসরে ঢের বড়। যে যে বাস্তব কারণে একটি দলকে শাসন ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে আর-একটি দলকে ক্ষমতায় আনার কথা ভাবা হচ্ছে সেইসব কারণেই ক্ষমতায় আনা দলটিকেও একদিন উৎখাত করার কথা বিবেচনা করা হবে : যৌক্তিকতার লড়াই-এর এ হল এক অমোঘ প্রতিপাদ্য। ভাবাবেগসর্বস্ব রাজনীতিক ও রাজনৈতিক মতবাদওয়ালারা এই কারণে যুক্তিকে ডরান, ভাবালুতাকে দেন প্রশ্রয়। ২০০৭ সাল থেকেই আমার মনে হয়েছিল সি পি আই এম ও তাদের লেজুড়দের হটিয়ে দিয়ে নতুন যে শক্তির শাসনক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি (বিশেষ করে গ্রামবাংলায় ও সাধারণ মানুষজনের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার নিরিখে) তার শীর্ষস্থানীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আন্দোলনকারী বিজ্ঞানীদের পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া একান্তই দরকার।

ষোলো

বিজ্ঞানীদের সঙ্গে মমতার যে একবার অন্তত মুখোমুখি দেখা ও কথা হওয়া দরকার, বন্ধু, সহযোদ্ধা ডক্টর কল্যাণ রুদ্রকে তা মাঝেমাঝেই বলছিলাম ২০০৮ সালের গোড়া থেকে। অভিভাবকস্থানীয় বিজ্ঞানী ও শিক্ষক ডক্টর সুজয় বসুকেও বলেছিলাম কথাটা। 'তারা' চ্যানেলের লাইভ আলোচনা অনুষ্ঠান 'মতামত'-এ দুজনের সঙ্গেই পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। আমার প্রস্তাবে দুজনেই একমত হয়েছিলেন। সি পি আই এম সরকারের বিপজ্জনক নীতি ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আমরা অনেকে যে লড়াইয়ে নেমেছিলাম তার পরিসর কিন্তু ছিল অনেক বড়। সি পি আই এম বিদেয় হোক, নতুন কেউ আসুক, ব্যস্, ল্যাঠা চুকে গেল, আমরা সব বাড়ি ফিরে গিয়ে ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি—এরকম কিন্তু ছিল না ব্যাপারটা আমাদের কারও কারও কাছে। ভারত সরকারের অনেক নীতির বিরুদ্ধেও ছিল আমাদের লড়াই। কৃষি, সেচ, খাদ্যবন্টন, কারিগরি শিল্প, বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরমাণু বিদ্যুৎ, জ্বালানি, বিকল্প-জ্বালানি, জমি অধিগ্রহণ, উৎখাত, পুনর্বাসন, নদীর ভাঙ্গন, জঙ্গলের অধিকার, খনি খনন, বহুজাতিক সংস্থার ভূমিকা, জল সরবরাহ, রোগ সংক্রমণ, চিকিৎসাব্যবস্থা, পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখা, ভাবা, সরকারি নীতিগুলিকে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করা, প্রয়োজনে তার বিরোধিতা করা এবং শ্রেয়তর নীতি ও পরিকল্পনার প্রস্তাব দেওয়াও যে জরুরি, এই দিকটাও হয়ে উঠেছিল এই গণ-আন্দোলনের অঙ্গ। বিজ্ঞানী কল্যাণ রুদ্র, যেমন, অনেক দিন আগে আমায় একবার বলেছিলেন যে ভারতের স্বাধীনতালাভের এত বছর পরেও আমাদের রাজ্যের কোনও **জমি-ব্যবহার নীতি** নেই। কোন জমি

কোন কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে সে ব্যাপারে সরকার ভাবনাচিন্তাই করেননি, করেন না।

অন্যদিকে, কার দিকে, কোন্ দিকে সরকারের আগে দৃষ্টি দেওয়া উচিত, এই আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় সরকারকে কার সবচেয়ে বেশি দরকার সেই বিষয়েও কোনও চিন্তা নেই কোথাও। আমার মনে আছে, প্রান্তিক মানুষদের অধিকার, তাঁদের কী কী পাওনা, বাস্তবে তাঁরা কী পাচ্ছেন সেই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নাগরিক অধিকার সংগ্রামী নব দত্ত একদিন 'তারা' চ্যানেলের 'মতামত' অনুষ্ঠানে বলেছিলেন: কবীর সুমন, সরকারকে আপনার মতো মানুষের কখন কতটা দরকার? বড়জোর আপনার পাসপোর্টের রিনিউয়ালের সময়ে। কিন্তু প্রান্তিক, বঞ্চিত মানুষদের সরকারকে দরকার প্রায় সারাক্ষণ, বিভিন্ন বিষয়ে। সরকারের দায়িত্ব কাদের প্রতি সবচেয়ে বেশি, সবার আগে এই বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে সরকারকে—এটাও ছিল চলতি আন্দোলনের এক অংশের দাবি।

আন্দোলনে জড়িত বেশ কিছু মানুষ ও পক্ষের কাছে অবশ্য একমাত্র লক্ষ্য ছিল সি পি আই এম ও তাঁদের সরকারকে সরিয়ে দিয়ে নতুন সরকার গঠন। কিন্তু সুশীল সমাজের অনেকের কাছে লক্ষ্যটা ছিল আরও বিস্তৃত। আমি নিজেও ছিলাম এই ধারণায় সামিল। শুধু সি পি আই এমকে তাড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠন করলে চলবে না। নতুন সরকার যাতে আগের সরকারের ভুল ও দোষগুলোকে পরিহার করে, বিভিন্ন জরুরি বিষয়ের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে আরও জনমুখী, পরিবেশবান্ধব, দেশহিতৈষণার পরিচয়বাহী নীতি ও পরিকল্পনা হাতে নেন সেই অভিমুখে লড়াই করে যাওয়াও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

অনেকের মনেই এই প্রশ্ন উঠেছিল : সি পি আই এমকে না হয় হটানো হল, কিন্তু ক্ষমতায় আনা হবে কাদের? কেমন কাজ করবে তারা? এর উত্তরে আমাদেরই মধ্যে কেউ কেউ বলা শুরু করেছিলেন : আগে সি পি আই এম-টা যাক, তারপর দেখা যাবে। এই দলটা, এই লোকগুলো আর নয়। আর পারা যাচ্ছে না। কেউ কেউ এও বলছিলেন : যারা ক্ষমতায় আসবে তারাও যদি দুর্নীতিগ্রস্ত, দাম্ভিক আর স্বৈরাচারী হয় তো তাদেরও সরিয়ে দেব।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে আছে কিনা জানি না, ২০০৭ ও ২০০৮ সালেও আমি তাঁকে বলেছিলাম—শাসনক্ষমতায় আসার পর মমতা ও তাঁর দল যদি দুর্নীতিপরায়ণ ও স্বৈরাচারী হয়ে যান তাহলে আমিই প্রথম তাঁর বিরুদ্ধে রাস্তায় নামব, আন্দোলন করব তাঁকেও ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য।

মনে রাখা দরকার, সি পি আই এম বিরোধী গণ-আন্দোলনে প্রথম থেকে বিভিন্ন মঞ্চ বা মহল ছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যেমন অনেক দল জোট বেঁধেছিলেন, তেমন এস ইউ সি আই দলের কোনও কোনও অ্যাক্টিভিস্টকে দেখা যাচ্ছিল অন্য একটি মঞ্চে। সেখানে সাবেক সি পি আই দলেরও কেউ কেউ ছিলেন। সেই মঞ্চের আমন্ত্রণেও আমি পথসভায় অংশ নিয়েছিলাম। সেখানে আমাদের অভিভাবকস্থানীয় তরুণ সান্যাল যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন বিভাস চক্রবর্তী, ডক্টর সুজয় বসু, অপর্ণা সেন। যদি খুব ভুল না জেনে থাকি, শাঁওলী মিত্রর সঙ্গে এই মঞ্চেরই প্রথমে ঘনিষ্ঠতা ছিল। এই মঞ্চে যাঁরা নিয়মিত অংশ নিচ্ছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার প্রথম দিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন না। ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে অনুষ্ঠিত একটি বড় সভায় একাধিক বক্তা বাম-ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিচ্ছিলেন, যার বিরোধিতা করেছিলাম আমি আমার বক্তব্যে। 'স্বজন' নামে যে নাগরিক গোষ্ঠী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন, তাঁরাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জোট থেকে দূরত্ব রক্ষা করে চলছিলেন। 'স্বজনে'র সদস্য অভিনেতা, নাট্যকর্মী কৌশিক সেন, যেমন, ২০০৯ সালের লোকসভা ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপুল সাফল্যের পরেও বিভিন্ন কমিটি ও আঁতাত থেকে দূরেই থেকে গিয়েছেন। এক ব্যতিক্রমী স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন কৌশিক এই ব্যাপারে।

২০০৬ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত পশ্চিম বাংলার সুশীল সমাজের যাঁরা মমতা ও তৃণমূল দল সম্পর্কে এক ধরনের ছুঁলে-জাত-যাবে মানসিকতা লালন করছিলেন, লোকসভার ভোটের পর তাঁদের অনেকেই সেই মানসিকতা ত্যাগ করেন। এস ইউ সি আই দল তো তৃণমূলের সঙ্গে কাঁধে

কাঁধ মিলিয়ে লোকসভার ভোটে লড়াইই করেন। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে আমার সমর্থনে এস ইউ সি আই দল ও তাঁদের অ্যাক্টিভিস্টরা যে উদ্যম ও অঙ্গীকার নিয়ে সংগ্রাম করেছিলেন আমি অন্তত তা কখনও ভুলব না। সেই সময়ে চাক্ষুষ দেখেছি এস ইউ সি আই দলের অঙ্গীকার, দায়বদ্ধতা, শৃঙ্খলাবোধ, অধ্যবসায় ও তাগিদ। অসামান্য। তৃণমূল ও এস ইউ সি আই-এর সাধারণ কর্মীরা একজোট হয়ে কী লড়াইই না করেছিলেন। এক সময়ে কিন্তু এস ইউ সি আই দল অত খোলাখুলি মমতার সমর্থনে ছিলেন না।

২০০৯ সালের লোকসভা ভোটে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রচারে সন্তোষ রাণার নেতৃত্বাধীন নকশালপন্থীরাও আমার হয়ে প্রচার করেছিলেন। আমি ছিলাম তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী। সি পি আই এমের বিরুদ্ধে এক তৃণমূলপ্রার্থীকে সমর্থন করছেন, তাঁর হয়ে প্রচার করছেন নকশালপন্থীরা —এ অতি বিরল ঘটনা। কোনওদিন ভোলা যায় না তাঁদের এই অবদান। এমনিতে কিন্তু এই দল মমতার মতবাদের বিরুদ্ধেই।

তেমনি ২০০৮ সালের মাঝামাঝি সময়েও বিজ্ঞানীদের মধ্যেও কেউ কেউ মমতা সম্পর্কে একটু হলেও মতবাদগত মানসিক অস্বস্তিতে ছিলেন বোধ হয়। ফলে, বিজ্ঞানীদের একটি প্রতিনিধি দলকে মমতার কাছে নিয়ে যাওয়া সহজ কাজ ছিল না। আমাদের সঙ্গে আবার বিজ্ঞানীদের সকলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বা সামাজিক যোগাযোগ ছিল না। বিজ্ঞানীদের রাজি করানোয় আমি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছিলাম বন্ধুবর কল্যাণ রুদ্রর ওপর।

বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যে তাঁর সম্পর্ক ও যোগাযোগ থাকা দরকার এই কথাটি আমি মমতাকে বলতে শুরু করেছিলাম ২০০৮ সালের প্রথম দিকেই। বিজ্ঞানী ডক্টর অভি দত্ত মজুমদারকে রাজ্যসভায় পাঠানো যায় কিনা সেই কথাও বলেছিলাম তাঁকে—কল্যাণ রুদ্র আমায় কথাটা বলার পর। যতদূর মনে পড়ে, ২০০৮ সালের মার্চ মাসে মেট্রো চ্যানেলে কবি জয় গোস্বামী ও আমি 'কবি ও কবিয়াল' পরিবেশন করার আগে বা পরে অভির ব্যাপারে কল্যাণের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। কল্যাণই আমায় মনে করিয়ে দিয়েছিলেন বিজ্ঞানীপ্রবর মেঘনাদ সাহাও তো রাজ্যসভার সদস্য হয়েছিলেন এক সময়ে।

অভিকে রাজ্যসভায় পাঠানো যায় না? মমতাকে আমি তার পরের দিনই ফোনে জিজ্ঞেস করি। মমতা জানতে চেয়েছিলেন—কেন। আমি বলেছিলাম, এমন কিছু কিছু বিষয়ে সরকার আইন প্রস্তাব আনেন যেগুলি একজন বিজ্ঞানী আরও ভাল বুঝবেন, যেগুলির ওপর তিনি একজন পেশাদার রাজনীতিকের চেয়ে অনেক ভাল আলোকপাত করতে পারবেন। ফলে সংসদে আরও ভালো বক্তব্য রাখতে পারবেন একজন বিজ্ঞানী। মমতাকে আমি বলেছিলাম আজকের রাজনৈতিক নেতাদের উচিত এক ও সম্ভব হলে একাধিক ভাল, সমাজ ও ইতিহাস-সচেতন বিজ্ঞানীকে পরামর্শদাতা হিসেবে পাশে রাখা। আমাদের দেশের যা অবস্থা তাতে নীতিগ্রহণ ও আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় ও শাখার বিজ্ঞানীদের শরণ নেওয়া উচিত রাজনীতিকদের। মমতা মেনে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন, পরে আমি নিশ্চয়ই ভেবে দেখব।

২০০৮ সালের ১৬ই মার্চ আমি ষাটে পা দিই। সেই উপলক্ষ্যে 'কলকাতা টিভি'র কর্তৃপক্ষ একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। দু এক জন বাদে কলকাতার নামজাদা গায়ক/গায়িকারা এবং তিন-চারটি ব্যান্ড একটি গোটা সন্ধে শুধু আমার রচনা করা গান গাওয়ার প্রস্তাবে সোৎসাহে সায় দেন। চমৎকার এক যন্ত্রশিল্পী দলের সঙ্গে তাঁরা মহড়াও দেন কয়েক সপ্তাহ ধরে।

সেই অনুষ্ঠানের সপ্তাহখানেক আগে 'কলকাতা' টিভির তথাগত দত্তর বাড়িতে সস্ত্রীক শুভাপ্রসন্ন, সস্ত্রীক ব্রাত্য বসু, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি আমন্ত্রিত হই। কী একটা কারণে শুভাপ্রসন্ন ও তাঁর স্ত্রী খাওয়াদাওয়ার আগেই বিদায় নেন। তারপর ব্রাত্য হঠাৎ বলে ওঠেন, কবীরদা, আপনার উচিত লোকসভায় যাওয়া। ভোটে দাঁড়ানো উচিত আপনার।

এই আকস্মিক ও অদ্ভুত কথায় আমি প্রচণ্ড আপত্তি করি। আমাকে অবাক করে দিয়ে মমতা ব্রাত্যর মুখের কথাটা তুলে নিয়ে সোৎসাহে বলতে থাকেন, ঠিকই তো কবীরদা, তোমার উচিত লোকসভায় যাওয়া।

যথাসম্ভব জোর দিয়ে আমি এর বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাতে থাকি। আমার যুক্তি ছিল : আমি পলিটিকাল লোক নই। সঙ্গীতকার ও সঙ্গীতশিল্পী। সাংবাদিক, অ্যাকিটিভিস্ট। কিন্তু **পলিটিক্সের লোক আমি নই**। রাজনীতিকরা

যেভাবে ভাবেন, আমি সেভাবে ভাবি না। রাজনীতিকরা যে ভাষায় কথা বলেন আমি সেই ভাষায় কথা বলি না। ভয়ানক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী আমি। দল-টল আমার পোষায় না। আমি শিল্পী, তাই স্বাভাবিকভাবেই অধৈর্য হয়ে পড়ি, মুখে যা আসে বলে দিই, কারুর পরোয়া করি না। রাজনীতিতে থাকতে গেলে এরকম হলে চলে না। আমি ভোটে দাঁড়াতে চাই না। এ আমার স্বভাববিরুদ্ধ।

মমতা ছাড়ার পাত্রী নন। তিনি তর্ক চালিয়ে গেলেন। তথাগত দত্তও ব্রাত্যর সুরে সুর মিলিয়ে বলতে লাগলেন—রাজনীতিতে, লোকসভায় তোমার মতো মানুষ আসা দরকার। এটাও তো 'পরিবর্তনে'র একটা অঙ্গ। ভাষার ওপর তোমার যে দখল, সেটা লোকসভায় আমাদের কাজে লাগবে। মমতা বলতে লাগলেন, বাংলার অত্যাচারিত মানুষের কথা তোমার মতো করে আর কে বলতে পারবে লোকসভায়?

অনেক জাগতিক বিষয়ে আমি সত্যিই বোকা। এত বছর ধরে এত বিচিত্র ও ঘটনাবহুল জীবন কাটিয়ে, এত কিছু দেখে শুনে জেনেও অনেক কিছুকে যা দেখছি যা শুনছি সেইভাবে নেওয়াই আমার স্বভাব থেকে গিয়েছে। এই ঘটনার কিছুদিন পরে খতিয়ে দেখে আমার মনে হয়েছিল সেই সন্ধের একটা শিথিল পরিকল্পনা ছিল হয়তো। নিতান্ত গাড়োল বলে ঐ মুহূর্তে কিছু বুঝতে পারিনি আমি।

আমি এতটা তেজের সঙ্গে ব্রাত্য-মমতা-তথাগতর বাণীর বিরোধিতা করেছিলাম যে মমতা শেষকালে বলেছিলেন, ঠিক আছে, আজ থাক।

এই সন্ধে থেকে 'বালাই ষাট' অনুষ্ঠান পর্যন্ত মমতার সঙ্গে কোনও কথা হয়নি। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ২০০৮ সালের ১৬ মার্চ কলকাতার নামজাদা শিল্পীদের কণ্ঠে একের পর এক আমার রচনা মমতাও শুনেছিলেন। আশা করি আমার এই মন্তব্যটির জন্য তিনি আমায় মার্জনা করবেন। সেই সন্ধেতে গানবাজনার অনুষ্ঠানটি তিনি যদি সত্যিই মন দিয়ে শুনতেন এবং পুরো ব্যাপারটা একটু অনুধাবন করতেন, তাহলে তিনি বুঝতেন যে রাজনীতিতে ঢোকা, ভোটে দাঁড়ানো, কোনও দল বা 'সভায়' যাওয়া আমার একেবারেই উচিত নয়। আমার উচিত সঙ্গীতে থাকা, এই ধরনের সৃজনশীল কাজে থাকা।

মমতার যে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলাপ করা উচিত, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা উচিত— আমার এই প্রস্তাবে তিনি প্রথমে বিশেষ উৎসাহ দেখাননি। আবার আমার প্রস্তাব নাকচও করেননি তিনি। তাঁকে আমি বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম: সি পি আই এমের বিরুদ্ধে যে গণ-আন্দোলন দানা বেঁধেছে তার পরিসর বিরাট। এমন অনেক বিষয় এর মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে এসে পড়েছে যেগুলি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের সম্যক ধারণা আছে, রাজনীতিকদের অতোটা নেই, থাকার কথাও না। এই সব বিষয় নিয়ে মমতার মতো নেতাকে কখনও না কখনও কথা বলতেই হবে, মন্তব্য করতেই হবে। তখন বিষয়টা না জেনে কিছু বলা উচিত হবে না। তাই, বিজ্ঞানীদের সঙ্গে নিলে মমতা পাবেন তাঁদের পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের সহায়তা। এক্ষেত্রে আন্দোলনরত বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তাঁর সলিড্যারিটি থাকাটা একান্তই জরুরি।

ডক্টর কল্যাণ রুদ্রর সঙ্গে আমার মোটামুটি নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। তিনি বলছিলেন বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তিনি চেষ্টা করছেন এ-ব্যাপারে কথা বলতে।

মে মাসে পঞ্চায়েত ভোটে সি পি আই এম দলের দুর্দশা ও তৃণমূল দলের সাফল্য গোটা সমাজেই একটা জোরালো ধাক্কা দিল। তাপসী মালিক, ভরত মণ্ডল, শেখ সেলিম, সুপ্রিয়া জানা ও অন্যান্য শহীদদের আত্মা পেলেন যেন একটু শান্তি। অনেক কাল পরে অদ্ভুত এক আনন্দ আর উদ্দীপনা আরও অনেকের মতো আমাকেও টেনে নিল নিজের আবর্তে। যে সি পি আই এম দল গ্রামবাংলার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে গোঁফে তা দিয়ে এসেছেন কয়েক দশক, সেই সি পি আই এম পঞ্চায়েতের ভোটে কুপোকাৎ।

জানান দিচ্ছে এই মেয়েটা
সরল একটা গ্রামের মেয়ে
নিজের মাটি আঁকড়ে ধরে
করছে লড়াই বিচার চেয়ে
জানান দিচ্ছে এই জাগরণ
লাগল ধাক্কা পঞ্চায়েতে
শিল্প আসুক আপত্তি নেই

ধানই ফলুক ধানের ক্ষেতে।
জানান দিচ্ছে জমির লড়াই
শ্যামলবরণ মানুষগুলো
পথ কেটেছে পথ দেখাতে
উড়ছে হাওয়ায় যুগের ধুলো
জানান দিচ্ছে এই জাগরণ
লাগল ধাক্কা পঞ্চায়েতে
শিল্প আসুক আপত্তি নেই
ধানই ফলুক ধানের ক্ষেতে

গানের পর গান লিখছি আমি। গানের পর গান।

জানান দিচ্ছে ঐ ছেলেটা
যাচ্ছে পড়তে মাদ্রাসাতে
নন্দীগ্রামের সব মিছিলে
হাত রাখে সে তোমার হাতে
জানান দিচ্ছে এই জাগরণ
লাগল ধাক্কা পঞ্চায়েতে
শিল্প আসুক আপত্তি নেই
ধানই ফলুক ধানের ক্ষেতে।

কল্যাণ ই-মেলে জানাচ্ছেন বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তিনি একে একে কথা বলছেন। ডক্টর সুজয় বসু রাজি। ডক্টর অভি দত্ত মজুমদার রাজি। কল্যাণ চেষ্টা করছেন আরও কয়েকজন বিজ্ঞানীর সঙ্গে কথা বলতে। আমি এদিকে কথা বলে চলেছি মমতার সঙ্গে। পঞ্চায়েত ভোটের আগে ও পরে তাঁর কাজ আরও বেড়ে গিয়েছে।

অগাস্ট মাসে কল্যাণ রুদ্র জানালেন এক দল বিজ্ঞানী রাজি হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে। অনেক ভেবেচিন্তে বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের বেছে নিয়েছিলেন কল্যাণ। আমার সঙ্গে বারবার কথা বলার পর মমতাও আলোচনা বৈঠকে রাজি। কিন্তু কোথায় হবে

বৈঠক? বিজ্ঞানীরা চান না মিডিয়া এই বৈঠকের খোঁজ পাক। অমনি বিপুল প্রচার করে এক কাণ্ড ঘটিয়ে বসবেন সাংবাদিকরা, টিভি চ্যানেলগুলো। মমতাও ভাবছেন। তৃণমূল ভবন? আমার দিক থেকে সরাসরি না। বিজ্ঞানীরা বলছেন তাহলে কি অন্য কোথাও? আমার ধারণা, মমতা তাঁর বাড়ি ছেড়ে বেরোলেই মিডিয়া তাঁর পিছু নেবে। তার চেয়ে মমতার বাড়িতেই হোক। এরকম একটা বৈঠক যে হচ্ছে তা নিয়ে কেউ আগে থেকে কোনও কথা না বললে মিডিয়া খুব একটা গা করবে না। অনেকেই তো মমতার বাড়ি যান। মিডিয়া কি সবকিছু তুলে ধরে?

২০০৮ সালের ১৮ অগাস্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বসতবাড়িতে কাউকে কিছু আন্দাজ করার সুযোগ না দিয়ে আন্দোলনকারী বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক আলোচনা বৈঠক হ'ল। এসেছেন সমর বাগচি (সবার সিনিয়র), সুজয় বসু, মেহের ইঞ্জিনিয়ার, অনুপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাস্কর গুপ্ত, অভি দত্ত মজুমদার ও কল্যাণ রুদ্র। এঁদের মধ্যে অনুপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভাস্কর গুপ্ত প্রথম থেকেই কৃষিজমি-রক্ষা কমিটিতে।

জীবন বড় বিচিত্র। কল্যাণ আর আমি ঠিক করে রেখেছিলাম সন্ধে সাড়ে ছটা নাগাদ মমতার বাড়ি ঢুকব। যে ট্যাক্সিতে চেপে যাচ্ছিলাম সেটি বিশ্রী যানজটে আটকে গেল সাদার্ন এভেনিউ-তে। কল্যাণরা তখন এগোচ্ছেন মমতার বাড়ির দিকে। ফোনে তিনি আমায় বললেন, সুমনদা, আমরা অপেক্ষা করছি তোমার জন্য।

আমার ট্যাক্সি ঠায় দাঁড়িয়ে।

অনেক যুগ ধরে ফ্রাঁসোয়াজ সাগাঁ নামে এক ফরাসী লেখিকার লেখা একটি উপন্যাস ও তার নাম আমায় ভাবিয়েছে : Bonjour Tristesse. বাংলায় বলা যায় 'সুপ্রভাত দুঃখ'। মমতার সঙ্গে বিজ্ঞানীদের বৈঠকের কিছুকাল আগে থেকেই ভাবছিলাম ঐ শিরোনামটি নিয়ে বাংলায় একটা গান লিখব। কিন্তু 'সুপ্রভাত দুঃখ' কথাটা আমার পছন্দ হচ্ছিল না। কল্যাণদের সঙ্গে মিলিত হয়ে মমতার বাড়ি যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠে যানজটের পিতৃশ্রাদ্ধ করছি, এমন সময়ে হঠাৎ আমার মনে হল 'তোমার আমি তোমার' এই কথাগুলো। ট্যাক্সি এক চুলও এগোচ্ছে না, সাদার্ন অ্যাভেনিউ আর ল্যান্সডাউন রোডের সংযোগস্থলের কিছুটা পরে দাঁড়িয়ে

আছি, কল্যাণ আমায় ফোন করে জানাচ্ছেন, সুমনদা, আর অপেক্ষা করা যাচ্ছে না, তুমি তোমার মতো এসো, আমরা মমতার বাড়িতে ঢুকছি, ভেতরে গিয়ে আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করব। কী আশ্চর্য, ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মাথায় খেলে যাচ্ছে গানের প্রথম লাইনের পুরোটাই : 'সুপ্রভাত বিষণ্ণতা, তোমার আমি তোমার'। সুর সমেতই মাথায় এলো। তাড়াতাড়ি মোবাইল ফোনে রেকর্ড করে নিচ্ছি আমি প্রথম লাইনটা। খুব ভাল লাগছে গানের শুরুটা। বুঝতে পারছি একটা ভাল গান হবে। মিটিং-এর পর বাড়ি ফিরে লিখতে হবে। পরের লাইনটা কী হবে ভাবতে ভাবতে ট্যাক্সি এগোতে শুরু করেছে। রাসবিহারির মোড় থেকে মমতার বাড়ি পৌঁছনোর মধ্যে আমি তৈরি করে ফেলেছি :

সুপ্রভাত বিষণ্ণতা, তোমার আমি তোমার
হঠাৎ স্মৃতির বিপন্নতা,
তোমার আমি তোমার
বয়স হলো বেলা গড়ায়
তোমার আমি তোমার
অকারণে মনে পড়ায়
তোমার আমি তোমার।

ট্যাক্সিতে যেতে যেতে, সন্ধের কলকাতার বড়-রাস্তার অন্তহীন আওয়াজের মধ্যে আমি আমার মোবাইল ফোনটা প্রায় মুখের সঙ্গে চেপে ধরে গেয়ে গেয়ে রেকর্ড করে নিচ্ছি গানটা।

মমতার ঘরে ঢুকছি আর মাথার ভেতর ঘুরঘুর করছে 'বয়স হলো বেলা গড়ায় তোমার আমি তোমার'। মমতা বসে আছেন। টেবিলে শুধু একটা পেপারওয়েট। বিজ্ঞানীরা বসে আছেন তাঁর সামনে। মমতা আমায় বলছেন তাঁর পাশে বসতে। জনসভার মঞ্চে ছাড়া (তাও তিনি বললে তবেই) কখনও তাঁর পাশে বসিনি। অস্বস্তি হচ্ছে। Mamata, the phenomenon ! সামনে কতো পণ্ডিত মানুষ। আমি কী করে মমতার পাশে বসি এই ঐতিহাসিক বৈঠকে। কিন্তু-কিন্তু করছি। দীর্ঘদেহী, বেজায় স্নেহপ্রবণ বিজ্ঞানী সুজয় বসু বসে আছেন মমতার ঠিক সামনে নয়, একটু পাশের দিকে। তাঁর পাশে একটি খালি চেয়ার। তিনি ডাকছেন: এসো, কবীর ভাই।

আমি বসতেই মমতা বলছেন, আলোচনায় যাওয়ার আগে একজনকে আমি এই ঘরে ডেকে আনতে চাই। ঘরে আসছেন সর্বাঙ্গে হিজাব পরা, শুধু মুখটি অনাবৃত রাখা এক যুবতী। মমতা বলছেন, কবীরদা, এ হলো শমীমা শেখ। একে আমি দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলা পরিষদের সভাধিপতি করে দিয়েছি। মমতার নির্দেশে শমীমা আমায় ও বিজ্ঞানীদের প্রণাম করতে এগিয়ে আসছেন। কেমন দেখছ কবীরদা তোমার মেয়েকে?—

ফুলের মতো।

তাই? আর কবছর অপেক্ষা করো, কবীরদা। তারপর যখন ওর টেবিলে লাখ টাকা নেচে বেড়াবে, তখন দেখো তো তোমার মেয়ের মুখ আর ফুলের মতো থাকে কিনা।

সুজয়দা তাড়াতাড়ি বলে উঠছেন: কখ্খোনো হবে না তা। আমাদের মেয়ে এরকমই থাকবে। ফুলের মতো।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাত দিয়ে পেপারওয়েটটা ঘোরাচ্ছেন, কবীরদা, তুমি এই বৈঠক ডেকেছ। তুমি শুরু করো।

আমার বক্তব্য ছোট্ট। এই গণ-আন্দোলনে কোনও রকম মতবাদগত ছ্যুঁৎমার্গ আন্দোলনেরই ক্ষতি করতে বাধ্য। অতীতে কার কী ধ্যানধারণা ছিল, অতীতে কী পরিস্থিতি ছিল, সেই বিচার-বিশ্লেষণের কোনও ব্যবহারিক মূল্য আর নেই আজকের সি পি আই এম বিরোধী লড়াইয়ের বাস্তবতায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এড়িয়ে গিয়ে সারা বাংলাজুড়ে আন্দোলন করা যাবে না, করার চেষ্টা করলে তাতে সাফল্য আসবে না। আজ আমাদের মমতার পাশে দাঁড়াতে হবে। তেমনি মমতাকেও বুঝে নিতে হবে বর্তমান গণ-আন্দোলনে বিজ্ঞানীদের কী বিরাট, ঐতিহাসিক গুরুত্ব। শাসকদল, তাদের সরকার এবং গোটা একটা সিস্টেমের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানীরা রাস্তায় নামছেন, বিভিন্ন জরুরি বিষয়ে জনগণকে ওয়াকিবহাল করার লক্ষ্যে সহজ ভাষায় পুস্তিকা লিখে, নিজেদের পয়সায় ছাপিয়ে সেগুলি বিতরণ করেছেন, সভার পর সভায় বিষয়মুখী, প্রশ্ননিষ্ঠ ভাষণ দিয়ে বেড়াচ্ছেন—এই ঘটনা এ-দেশে তো বটেই অন্য কোন দেশেও বোধহয় এভাবে ঘটেনি। ভবিষ্যতেও তাঁদের এই গুরুত্বই থাকবে। আমার প্রস্তাব, বিজ্ঞানীরা সকলে মমতার ফোন নম্বর রেখে দিন, আর মমতাও রেখে দিন বিজ্ঞানীদের ফোন

নম্বর। মমতা যেন যে কোনও বিষয়ে পরামর্শের জন্য বিজ্ঞানীদের ফোন করতে পারেন। বিজ্ঞানীরাও যেন মমতাকে ফোন করে নিজেদের থেকে কিছু আইডিয়া, পরামর্শ দিতে পারেন। খোলামেলা একটা সম্পর্ক ও যোগাযোগ থাক।

ডক্টর কল্যাণ রুদ্র বলছেন : সলিড্যারিটি।

আমরা সকলে সলিড্যারিটি, সংহতির পরিমণ্ডলে থাকব। আমাদের মধ্যে বয়সে সবার বড় অধ্যাপক সমর বাগচি উজ্জ্বল উৎসাহ নিয়ে প্রস্তাব দিচ্ছেন : মমতা, এসো, আমরা এক আদর্শ পঞ্চায়েত গড়ে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করি।

ঠাণ্ডা মাথায়, শান্ত ভঙ্গিতে মমতা বলছেন, দাদা, টাকা তো রাজ্য সরকারের হাতে। ওরা আটকে দেবে।

বিজ্ঞানী অভি দত্ত মজুমদার ছবি দেখাচ্ছেন—তাঁর পরিবারকে শায়েস্তা করার জন্য সি পি আই এম কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে। তাঁদের বাড়িটা টিন দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। বেরোনোর রাস্তা নেই। শাসকদল সব পারে।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থার সাহায্যে কী করে গ্রামবাসীদের জন্য সত্যিকার উন্নয়ন করা যায় তা নিয়ে কথা হচ্ছে। প্রাণবন্ত আলোচনা। আমি নিছক শ্রোতা অনেকক্ষণ ধরে। মমতা বলছেন, রাজ্য সরকারের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। সপ্রাণ সংলাপ জমে উঠেছে। সলিড্যারিটি।

কেউ জানতেও পারছে না—আমার মাথার ভেতরে ঘুরঘুর করছে ঘুণপোকার মতো একটা সদ্য-বাঁধতে শুরু করা গান :

বয়স হলো বেলা গড়ায়
তোমার আমি তোমার
অকারণে মনে পড়ায়
তোমার আমি তোমার
দুপুর হলে মেঘের উঁকি
তোমার আমি তোমার
বিকেল-মনে আঁকিবুকি
তোমার আমি তোমার

বেলাশেষের পুকুরপাড়ে
তোমার আমি তোমার
সন্ধে আসছে চুপিসাড়ে
তোমার আমি তোমার

সলিড্যারিটি। বিজ্ঞানীদের সঙ্গে বৈঠকের পর থেকে মমতা যখনই এস এম এস পাঠাচ্ছেন আমায়, সব সময়ে শেষে লিখছেন: সলিড্যারিটি।

অনেকদিন কোনও চাকরি নেই। গান শেখানো ছাড়া রোজগার নেই। আমার এক বান্ধবী আমায় একটা গবেষণামূলক কাজের রিপোর্ট লেখার দায়িত্ব দিয়েছেন যাতে আমি এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কিছু টাকা পাই। বীরভূমের কোনও একটি জায়গায় জাতিভেদ ও জাতি-ধর্ম-ভিত্তিক বৈষম্যের প্রভাব ছোট ছেলেমেয়েদের ওপর কিভাবে পড়ছে সেটা তাদের সঙ্গে কথা বলে জেনে নিতে হবে। এক বয়স্ক সমাজকর্মী ঐ এলাকায় সাধারণভাবে গবেষণামূলক কাজ করেছেন এবং তার রিপোর্ট পেশ করেছেন আমার কাছে। এবারে, আমাদের কাজের দ্বিতীয় পর্যায়ে ঐ অঞ্চল থেকে একটি আদিবাসী মেয়ে, একটি খৃষ্টান ছেলে, দুটি দলিত ছেলে ও দুটি মুসলমান ছেলেকে আনা হয়েছে আমার কাছে। আমি তাদের সঙ্গে গল্প করছি আর তাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জেনে নিচ্ছি। বিভিন্ন প্রশ্নের মধ্যে আমার একটি প্রশ্ন: পঞ্চায়েত কী? জানো? তোমাদের অঞ্চলে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজকর্ম কেমন চলছে?

একটি দলিত ছেলে, যার স্বামী-পরিত্যক্তা মা এতই গরিব যে ছেলেটিকে তার মাকে সাহায্য করার জন্য লোকের বাড়িতে খুব অল্প বয়স থেকেই কাজ করতে হয়েছে (ছেলেটি স্কুলে যেতে পারে না), স্পষ্ট ভাষায় বলছে : জানি। পঞ্চায়েত মানে চোর।

আমি (সচকিত হয়ে) : সে কী!

ছেলেটি (সহজ ভঙ্গিতে) : আমি পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়িতে কাজ করেছি। সবাই ভাবত আমি স্কুল যাইনি, তাই বোকা, কিচ্ছু বুঝব না। আমার সামনেই পঞ্চায়েত প্রধান পঞ্চায়েতের কয়েকজন লোককে বলল—তিনটে

রাস্তায় মোরাম ফেলার কথা, কিন্তু আমরা একটাতে কম ফেলব, দুটোতে ফেলবই না। তোরা বুঝে নিস। টাকার ব্যাপারটা পরে বুঝে নেব আমরা, গত বার যেমন করেছিলাম। হিসেবটা পরে হবে। আমি ঘরের ঠিক বাইরেই ছিলাম। সব শুনেছি।

আদিবাসী মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করছি একই কথা। পঞ্চায়েত মানে কী?

কিশোরী (একটু লাজুক): ঐ ভাই যা বলল। চোর। আমরা জানি গ্রামের রাস্তাঘাট তৈরি করার জন্য টাকা থাকে। কিন্তু কেউ কোনও কাজ করে না। সব টাকা চুরি হয়।

আমি: কে চুরি করে?

আদিবাসী কিশোরী: ঐ পঞ্চায়েতের প্রধান আর ওর লোকজন।

আমি: এইসব কথা কি বড়রা তোমাদের শিখিয়ে দিয়েছে?

ছেলেমেয়েরা প্রায় সমস্বরে : না। আমরা সব জানি।

প্রথম দলিত কিশোর: আমি তোমায় বললাম না জেঠু, আমি তো পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়িতে কাজ করেছি, কয়েক বছর। সব কথাবার্তা নিজের কানে শুনেছি। পঞ্চায়েতের লোকদের সঙ্গে প্রধান চুরি করার কথা বলত।

খৃষ্টান ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করছি পঞ্চায়েত থেকে তাদের গ্রামে কোনও কাজ হয় কিনা। এতজনের মধ্যে এই ছেলেটি মনে হচ্ছে স্কুলের ইউনিফর্ম পরে এসেছে। নীল শার্ট, খাকি প্যান্ট। ছেলেটি বলছে সে কোনওদিন কোনও কাজ হতে দেখেনি।

জাতি-ধর্ম-ভিত্তিক বৈষম্য? সকলেই একই কথা বলছে, যদিও আলাদা আলাদা। দলিত, মুসলমান ও আদিবাসীদের ক্লাসের একেবারে পেছনে বসতে হয়। 'হিন্দু' ছেলেমেয়েরা তাদের স্কুলের ব্যাগ দূরে অন্য জায়গায় রাখে, ব্যাগে ব্যাগে ছোঁয়াছুঁয়ি এড়াতে। একসঙ্গে খেলে না কেউ। আদিবাসী মেয়েটিকে কেউই খেলতে নেয় না। খৃষ্টান ছেলেটি একটি খৃষ্টান মিশনারিদের স্কুলে পড়ে। স্কুলে বৈষম্য কাকে বলে সে জানে না। একটি দলিত ছেলে বলছে—জানো জেঠু, হিন্দু ছেলেমেয়েদের স্কুলের পর বাড়ি ঢুকতে হয় জামাকাপড় ছেড়ে। স্কুলের জামাকাপড় পরে বাড়িতে ঢুকতে পারে না। হি হি, ল্যাংটা হয়ে ঢোকে। ইস্কুলে আমাদের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হয় তো, সেই জন্য।

হ্যাঁরে, তোরা গান গাস? আদিবাসী মেয়েটি মাথা ঝোঁকাচ্ছে একটু লাজুক মুখ করে। অন্য ছেলেমেয়েরা বলছে 'না'।

আদিবাসী মেয়েটি আর তার সঙ্গে আসা মা একসঙ্গে গান ধরছেন। আমার ঘরের ইলেকট্রনিক পিয়ানোটার সুইচ অন করে আমি তাঁদের পর্দাটা চট করে বুঝে নিয়ে সঙ্গে বাজাচ্ছি। তালটা ঝুমুরের। সুরটা পাঁচ-স্বরের। সব শুদ্ধ স্বর। দিব্যি গেয়ে যাচ্ছেন দুজন আমার পিয়ানোর সঙ্গতে। কোথাও বেসুর হচ্ছে না, তাল কাটছে না। মনে হচ্ছে আমরা তিনজন চিরকাল এমনি করেই একসঙ্গে গান-বাজনা করে এসেছি। বীরভূমের এক গণ্ডগ্রামের দুই আদিবাসী মেয়ে আর কলকাতার এক বাঙালি প্রৌঢ়। সলিড্যারিটি।

সবই ২০০৮ সালের অগাস্ট মাসে ঘটেছে।

কোথা থেকে শুরু করব আমরা, বন্ধুরা? পরিবর্তন? কোন পরিবর্তন আসছে? কোথায়?

সতেরো

মে মাসের পঞ্চায়েত ভোটে সি পি আই এমের ব্যর্থতা ও তৃণমূলের সাফল্যের পর থেকে পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক জলহাওয়া দ্রুত পাল্টাতে শুরু করে। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে গ্রামবাসীদের লড়াই ও আত্মত্যাগ, সি পি আই এম নেতাদের মিথ্যাচার, দম্ভ ও নিষ্ঠুরতা, সি পি আই এম গুণ্ডাবাহিনী ও ঘাতকবাহিনীর হাতে গ্রামবাসীদের রক্তপাত, গ্রামের মানুষদের শাহাদাত বরণ, গ্রামের মেয়েদের ইজ্জতহানি এবার ভোটের অংকেও যে নিজেকে প্রকাশ করছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। মার্চ মাসে 'কলকাতা' টিভির তথাগত দত্তর বাড়িতে ব্রাত্য বসু, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তথাগতর হৈ হৈ করে আমাকে লোকসভার ভোটে দাঁড়ানোর জন্য পীড়াপীড়ি থেকে আমি টের পেতে শুরু করি যে তৃণমূল নেত্রী ও তাঁর নগরসমাজের অনুগামীরা ২০০৯ সালের বড় ভোটের দিকে তাক্ করছেন। আমার চিরকেলে স্বভাব যেহেতু নির্বাচনবিমুখ, ভোটবিতৃষ্ণ, তাই আমি নিজে ওঁদের মতো ভাবছিলাম না। কিন্তু আশেপাশে তাকিয়ে বুঝতে পারছিলাম সি পি আই এম ও অন্য বামফ্রন্টি দলগুলোকে পরের ভোটগুলোতে হারানোর লড়াই ভেতরে ভেতরে শুরু হয়ে গিয়েছে। এক সন্ধেবেলা ব্রাত্য বসু, জয় গোস্বামী আর আমি পার্ক স্ট্রিটের ফ্লুরিজ-এ কফি খেতে গিয়েছিলাম 'কলকাতা' টিভির অফিস থেকে। সেখানে আলাপ আলোচনার মধ্যে ব্রাত্য খুব স্পষ্ট করেই বললেন মমতাকে ভোটে জেতানো দরকার। স্বাভাবিক প্রত্যয়ের সঙ্গেই বললেন তিনি কথাটা। আমার ভাল লাগল। জয় গোস্বামীরও একই মত। ব্রাত্য ও জয় দুজনেই খুব রসিক মানুষ। দুজনের সঙ্গেই ফোনে কথা হত। জয়ের সঙ্গে রাজনীতির কথা হত না তেমন। সেটা হত ব্রাত্যর সঙ্গে। এর

কদিন পরেই মমতা আমায় ফোন করে খুবই নরম সুরে বললেন, ২১ জুলাই আমাদের শহীদ দিবসের সভায় যাবে, প্লীজ? তুমি গেলে খুব ভাল হয়। আমি তোমায় নিয়ে যাব। ঐ দিনটি নিতান্তই তৃণমূল কংগ্রেসের একটি বিশেষ দিন যা তাঁরা প্রত্যেক বছর পালন করে থাকেন। এমনভাবে বললেন মমতা যে আমি না বলতে পারলাম না। না বলতে বোধহয় চাইলামও না। লোকে আমাকে তৃণমূল বলবে এই ভাবনা তখন নেহাতই বাহুল্য আমার কাছে। অনেকে আমায় তার অনেক আগে থেকেই তৃণমূল বলছিল এবং তাতে আমার কোনও সমস্যা হচ্ছিল না। সি পি আই এম ছাড়া আর যা খুশি তাই বলো বাপু, কিছু যায় আসে না আমার।

ব্রাত্যকেও বলেছিলেন মমতা। ব্রাত্যর বরং একটু সমস্যা হচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল। তিনি ঠিক ভেবে উঠতে পারছিলেন না ২১ জুলাই-এর শহীদ দিবসের সভায় যাওয়াটা ঠিক হবে কিনা। অবশ্য আমি যাচ্ছি বলে একটু ভরসাও পাচ্ছিলেন ব্রাত্য। ঐ দিন আমরা মমতার বাড়িতে গেলাম এবং মমতা আমাদের নিয়ে গেলেন ধর্মতলায় সভাস্থলে। গাড়িতে আর কেউ ছিলেন না। যাওয়ার পথে রাস্তায় দেখলাম অসংখ্য তৃণমূল সমর্থক ট্রাকে করে চলেছেন ধর্মতলার দিকে। মমতাকে দেখতে পেয়ে তাঁরা আনন্দে দিশাহারা। মমতা যথারীতি চালকের পাশে, ব্রাত্য আর আমি পেছনে। ময়দানের পাশ দিয়ে গাড়ি ছুটছে। রাস্তায় ছোট-বড় গাড়ির অন্ত নেই। তারই ফাঁকফোকর দিয়ে 'দিদি দিদি' করতে করতে ছুটে আসছে মানুষ, ট্রাক থেকে নেমে, টেম্পো-ভ্যান থেকে নেমে। মমতা উত্তেজিত। বকছেন সকলকে। কী হচ্ছে কী? এক্ষুনি তো গাড়িচাপা পড়বি তোরা। কেউ কেউ মমতার গাড়িটাকে একটু ছুঁয়ে যাচ্ছে। ব্রাত্য সম্ভবত সেই প্রথম মমতার সঙ্গে একই গাড়িতে কোথাও যাচ্ছেন। মমতাকে দেখলে, নাগালের মধ্যে পেলে সাধারণ মানুষের যে কী হয়, ব্রাত্য তা এত কাছ থেকে দেখেননি। অবাক হয়ে দেখছেন ব্রাত্য। তাঁকে বলছি আমি: দ্যাখো ব্রাত্য, আমাদের দিকে কেউ ভুলেও তাকাচ্ছে না। আসলে আমরা কেউ না। বুঝেছ? মমতাই সব। আমাদের দেশের জনগণ আর মমতা।

ধর্মতলায় হুলুস্থূল কাণ্ড। মমতার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সভায় যাওয়া মানে প্রায় শহীদত্বলাভের আগের মুহূর্ত। সমানে মনে হয়—এই

বুঝি গেলাম। অনেক মানুষ একত্রিত হলে কি সকলের শরীর থেকে এমন একটা শক্তি বেরিয়ে আসে যে-শক্তি স্থির থাকতে জানে না, শুধু এগোতে জানে? ঐ রকম মুহূর্তে আমি একাধিকবার দেখতে চেষ্টা করেছি মানুষের মুখ। দেখেছি—আশ্চর্য, বেশিরভাগ মুখের পেশি শক্ত হয়ে থাকে; আলাদা কোনও ভাব থাকে না মুখে; মনে হয় সকলে যেন অজানা কিছু-একটা ঘটবে বলে অপেক্ষা করছে; বেশিরভাগ মুখে না থাকে আনন্দ, না থাকে দুঃখ, না থাকে স্বাভাবিক কোনও ভাব। কয়েকবার আমার ভয়ও করেছে। মনে হয়েছে যে কোনও মুহূর্তে এই মানুষগুলোই এমন একটা কিছু করে বসতে পারে যা তারা সচেতনভাবে করতে পারবে না, কিন্তু করবে, করে ছাড়বে, তারপর মুখের একই ভাব নিয়ে তারা অল্প কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখবে কী তারা করে বসল, তারপর তারা শান্ত হয়ে চলে যাবে, ফিরেও তাকাবে না। চলে যেতে যেতে অনেকটা দূরে গিয়ে হয়তো কেউ কেউ ফিরে তাকাবে। মনে করার চেষ্টা করবে কী ঘটে গেল।

২০০৮ সালের ২১ জুলাই ধর্মতলায় জনসমুদ্রের চাপ ছিল অসহনীয়। সব কিছু পেরিয়ে মঞ্চে উঠে দেখি সোমেন মিত্র এসেছেন। প্রদেশ কংগ্রেস ছেড়ে তখন প্রগতিশীল ইন্দিরা কংগ্রেস দল খুলেছেন তিনি। অনেক দিন পর তাঁকে দেখলাম। মমতা তাঁকে একেবারে সামনে বসিয়ে দিলেন। মঞ্চের দিকে তাকিয়ে জনসমুদ্র প্রথম দেখতে পাচ্ছে সোমেন মিত্রকে। ব্রাত্য তখনও একটু দোটানায় ভুগছেন। আমি ভাষণ দেওয়ার পর তাঁরও ডাক পড়ল। প্রায় কাতর মুখে আমায় আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, কবীরদা, বলব?

খুব ভাল ভাষণ দিলেন তিনি।

২১ জুলাই-এর দিন দুই পরেই ব্রাত্য আমায় ফোন করে জানালেন, যে দলের সঙ্গে অথবা যাঁদের সঙ্গে তিনি সম্প্রতি নাটক করছিলেন তাঁরা আর কাজ করতে চান না ব্রাত্যর সঙ্গে। কারণ? তিনি ২১ জুলাই তৃণমূলের শহীদ দিবসের সভায় গিয়েছিলেন, মঞ্চে উঠেছিলেন, সরকার-অনুমোদিত বামপন্থীরা যাঁদের ব্রাত্য মনে করেন তাঁদের পাশাপাশি তৃণমূলের মঞ্চে বসেছিলেন ব্রাত্য বসু।

পরের দিন আমি লিখলাম :

ব্রাত্য বসুও ব্রাত্যই হলে
একুশে জুলাই সভায় গিয়ে
প্রগতিশীলরা চায় না তোমায়
ঠাট্টা করবে তোমায় নিয়ে

তৃণমূল শহীদ দিবসের এক মাসের মধ্যে মমতার সঙ্গে বিজ্ঞানীদের বৈঠক হয়েছিল। বিজ্ঞানীদের সঙ্গে বৈঠক করে মমতা কী বুঝলেন তা নিয়ে আমাদের মধ্যে কোনও কথা হয়নি। মমতা তখন সিঙ্গুর অবরোধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আমি তৈরি করছি আমার নতুন গানের অ্যালবাম 'প্রতিরোধ'। বন্ধুবর, ক্যান্সার-চিকিৎসক ডাক্তার স্থবির দাশগুপ্ত আমায় তার আগে থেকেই জানাচ্ছেন—তাঁর এক বন্ধু জমি অধিগ্রহণ বিষয়টি নিয়ে একটি নাটক লিখেছেন, নাটকটি তিনি বিভিন্ন পথসভায় করতে চান, তৃণমূলের সভাতেও। তৃণমূলের কাকে যে বলি। সুস্থ রাজনৈতিক লড়াইয়ের পাশাপাশি যুগমুহূর্তোপযোগী সৃজনশীল সাংস্কৃতিক কাজ না হলে গণ-আন্দোলন সজীব থাকে না। এই ব্যাপারটি কমিউনিস্টরা আমাদের দেশে সবচেয়ে ভাল বুঝেছেন। গণ-নাট্যের সৃজনশীল কাজগুলি না থাকলে বামপন্থী রাজনৈতিক মতবাদ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠত কি? কংগ্রেস ঘরানায় সাংস্কৃতিক উদ্যোগ বলতে কিছুই প্রায় নেই। তৃণমূলের পরিমণ্ডলে? এই বিষয়ে ২০০৮ সালের জুলাই অগাস্ট মাসে একবার মমতার সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করেছিলাম। মমতা আমায় বলেছিলেন: কী করি বলো তো কবীরদা? গ্রামে গ্রামে সি পি আই এমের অত্যাচারের মোকাবিলা করব? নাকি ভাল গান নিয়ে চিন্তাভাবনা করব?

আমি তাঁকে বলেছিলাম, সব কিছু নিয়ে কেবল তুমি ভাবনাচিন্তা করবে কেন?

তিনি কিছু বলেননি।

আমি খেয়াল করছিলাম তৃণমূল দলের লোকদের মধ্যে এক ধরনের ভয় কাজ করে। মমতাকে সবাই খুব ভালবাসেন আবার ভয়ও পান। হয়তো শৃঙ্খলা-রক্ষার জন্য এটাই দরকার। কিন্তু সাংস্কৃতিক কাজকর্মের বেলাতেও

যদি শুধু মমতার মুখাপেক্ষী হতে হয় তো মুশকিল। এটাও আবার মনে হচ্ছিল—তৃণমূলের জীবনেও বড্ড অল্প সময়ে অনেক কিছু ঘটে যাচ্ছিল। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, বিশেষ করে নন্দীগ্রামের বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থান তো শুধু তৃণমূল বা মমতার একক অবদান নয়। নন্দীগ্রামে তৃণমূলের উপস্থিতি কমই দেখেছিলাম টিভি সাংবাদিক হিসেবে সোনাচূড়ায় গিয়ে। বরং সবুজ প্রধান নামে এক তরুণ কংগ্রেসীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল যাঁর সঙ্গে গ্রামবাসীদের যোগাযোগ ভাল বলে মনে হয়েছিল। সিঙ্গুরে বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তৃণমূলের কিন্তু সিঙ্গুর-আন্দোলনে এম কে পি, এস ইউ সি আই, নকশালপন্থী এবং কিছু এন জি ও-রও জোরালো ভূমিকা ছিল। 'তারা' চ্যানেলের 'মতামত' অনুষ্ঠানটি আমরা যখন সিঙ্গুর থেকে প্রথম লাইভ সম্প্রচার করি তখন শাসকদলের লোকজন আমাদের ওপর যে কোনও মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারত। কিন্তু আমাদের রাস্তা দেখিয়েছিলেন এবং কিছু লোকজন দিয়ে সাহায্য করেছিলেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের কয়েকজন অনুগামী। সুব্রতবাবু সে সময়ে কংগ্রেসে ছিলেন।

গণ-আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ওঠায় তৃণমূলের সাংগঠনিক কাজকর্ম দ্রুত বাড়তে থাকে। এইভাবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে তাঁদের প্রভাবেরও পরিসর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সে সময়ে কৃষি-জমি রক্ষা কমিটিকে নেতৃত্ব দিতে থাকেন দক্ষতার সঙ্গে। তেমনি এটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যে ঐ কমিটিতে যুক্ত থাকা বিভিন্ন দল ও ব্যক্তি তাঁর নেতৃত্ব মেনেও নেন। কোথাও কোনও বিরোধিতার চোরাস্রোত ছিল না। ব্যক্তিগত ভাবে আমার মনে হয়েছিল কৃষি-জমি রক্ষা কমিটি থেকে মজদুর ক্রান্তি পরিষদের সরে যাওয়া বা সরে যেতে বাধ্য হওয়াটা সম্মিলিত আন্দোলনের পক্ষে একটা উল্লেখযোগ্য ক্ষতি। সুখের বিষয়, গণ-আন্দোলনে এম কে পি কিন্তু তাঁদের লড়াই বীরবিক্রমে চালিয়ে গিয়েছেন। সিঙ্গুরে কী মারই না খেয়েছেন তাঁদের অ্যাক্টিভিস্টরা।

আন্দোলনের জঙ্গমের কারণে সাংস্কৃতিক কাজকর্মের দিকটা দলগতভাবে অবহেলিত হচ্ছিল। ব্যক্তিগত পর্যায়ে যে যা পারছিলেন করছিলেন। কিন্তু একটা ব্যাপার পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল: ১৯৭৭ সাল থেকে এই রাজ্যের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের রাজনৈতিক দিকটা সি পি আই এম এতোটাই এককভাবে কুক্ষিগত করে রেখেছে যে তাদের বাইরে

উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ছিলই না বলা চলে। আমি নিজে, ১৯৮৯ সালে জার্মানি থেকে ফেরার পর এক নাগাড়ে পলিটিকাল গান বেঁধেছি, গেয়েছি, রেকর্ডও করেছি। কিন্তু আমার গানে বা আমার মানসিকতায় সি পি আই এম দলের প্রতি জি-হুজুর ভাব না থাকায়, বরং অনেক সময়ে সরকারবিরোধিতা ও প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা থাকায় আমাকে এবং আমার গানগুলিকে কোণঠাসা করে রাখা হয়েছিল, হচ্ছিল। শাসকরা বিরুদ্ধবাদী সংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক বিরুদ্ধবাদিতাকে সন্দেহের চোখে দেখেন, ভয় পান।

মজার কথা, ২০১০ সালে, তৃণমূল নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে বিরোধিতার জেরে স্থানীয় কোনও কোনও তৃণমূল নেতা তাঁদের দলের ছেলেমেয়েদের ফরমান দেন তৃণমূলের কোনও সভায় কবীর সুমনের গান বাজানো চলবে না। অথচ, লোকসভার ভোটের অনেক আগে থেকেই আমার 'নন্দীগ্রাম' অ্যালবামটি সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম সমেত বাংলার অনেক গ্রামে, জেলা শহরে, কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে বাজানো হয়েছিল।

সিঙ্গুরের অনেক লড়াকু মানুষ 'শালবল্লার বেড়ায় আগুন বিরোধী নিশান ওড়া, ল্যাজে যদি তোর লেগেছে আগুন স্বর্ণলংকা পোড়া' গানটি শিখে নিয়ে গাইছিলেন। একাধিক সভায় সিঙ্গুরের বেচারাম মান্না এই গানটি নিখুঁতভাবে গেয়েছেন। 'নন্দীগ্রাম' ও 'প্রতিরোধ' অ্যালবামের বিক্রয়লব্ধ অর্থ আন্দোলনের কাজেই লেগেছে, আমি তা নিইনি, যদিও সঙ্গীত প্রযোজনা করতে অনেক টাকা লাগে, যেটা আমি নিজের ঘর থেকেই দিয়েছিলাম।

অর্থাৎ ঘুরেফিরে আমারই একটি গান তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে বারবার—অন্তত আমার কাছে :

'শাসক যে রঙেরই হোক
ভয়ানক,
তার চোখ
সব দিকে থাকে,
কে তার সমর্থক কে তার বিরোধী
সে হিসেব রাখে।'

আঠারো

২০০৬ সালের যে দিনে সিঙ্গুরের বিদ্রোহী গ্রামবাসীরা ন্যানো কারখানার চৌহদ্দি ঘেরা শালবল্লার বেড়ায় আগুন লাগান তার পরের দিন, আমার অনেক বছরের বন্ধু, সাংবাদিক আশিস ঘোষ 'দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন লিখেছিলেন। সেটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় খেলে গিয়েছিল কাজী নজরুল ইসলামের লাইন : 'ল্যাজে যদি তোর লেগেছে আগুন স্বর্ণলংকা পোড়া' গানের প্রথম লাইনটা লিখেছিলাম তারপর : 'শালবল্লার বেড়ায় আগুন বিরোধী নিশান ওড়া।'

২৪ অগাস্ট, ২০০৮ সিঙ্গুরে শুরু হওয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধরনায় মঞ্চ থেকে যখন এই গানটি গাইছি, হঠাৎ মনে হল আমার গলার পেছনে যেন ছায়ার মতো আর-একটা গলা। আমার কণ্ঠেরই মতো আর-একটি কণ্ঠ। প্রথমে ভাবলাম, যে ছেলেটি মঞ্চের নিচে যন্ত্রপাতি নিয়ে বসে ধ্বনিপ্রক্ষেপণ করছেন তিনি একটু বেশি রিভার্ব (প্রতিধ্বনি) মিশিয়ে দিচ্ছেন, ফলে রিভার্ব যন্ত্রের কারণেই আমার কণ্ঠের প্রতিধ্বনি শুনছি আমি। গান থামিয়ে ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলাম আমি। ছেলেটি জানালেন, কোনও রিভার্ব মেশাচ্ছেন না তিনি।

মঞ্চের এক পাশ থেকে দোলা সেনের গলা: 'এই সুমন, এই দ্যাখো, বেচারাম গাইছে তোমার সঙ্গে।' এইবারে বুঝলাম ওটা রিভার্ব নয়, একজন রক্তমাংসের মানুষের কণ্ঠ। আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে এমনভাবে গাইছিলেন তিনি গানটা যে আমার মনে হচ্ছিল নিজের গলার প্রতিধ্বনি শুনছি। কী চমৎকার সুরে তালে লয়ে যে গাইতে লাগলেন সিঙ্গুরের বেচারাম মান্না! দোলার পাশে দাঁড়িয়ে মমতা দুই হাতে তাল দিচ্ছেন। তাঁর

মুখে তৃপ্তির স্মিত হাসি। মমতার হাসি ছড়িয়ে পড়ছে মঞ্চের সামনে বসে ও দাঁড়িয়ে থাকা অসংখ্য গ্রামবাসীর চোখেমুখে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই— দেখছি, শুনছি, অবাক হয়ে শুনছি দস্তুরমতো গাইছেন গানটা :

'ফসলের গান গেয়েছিল যারা সাম্যের ধ্বজা ধরে
এখন তারাই পোড়ায় ফসল পুঁজির দালালি করে
ভেবেছিল ওরা পার পেয়ে যাবে বাংলায় আগাগোড়া
ল্যাজে যদি তোর লেগেছে আগুন স্বর্ণলংকা পোড়া।'

কয়েকজন বসে বসে গাইছিলেন প্রথমে। দাঁড়িয়ে উঠলেন তাঁরা এবার। আমি আর অতটা জোর গলায় গাইছি না, মূল গায়েনের ভঙ্গিতে বাকি গানটা গাইছেন সিঙ্গুরের গ্রামবাসীদের এক নেতা বেচারাম মান্না। আমার সঙ্গে আর নয়, **তাঁর সঙ্গে** গলা মেলাচ্ছেন অসংখ্য গ্রামবাসী:

'লাঙল যাদের জমিও তাদের ওরাই বলত আগে
এখন ওদের তেষ্টা মিটতে চাষীর রক্ত লাগে
জাগো বিদ্রোহ ছোটো প্রতিশোধ-কামনার খ্যাপা ঘোড়া
ল্যাজে যদি তোর লেগেছে আগুন স্বর্ণলংকা পোড়া।

আমার মনে পড়ছে, বহু বছর আগে, সেই ১৯৮৩ সালে আমেরিকার গণশিল্পী পীট সীগার আমায় বলেছিলেন: সুমন, যদি ঠিকমতো গান বাঁধতে পারো তো একটা দিন আসবে যখন হঠাৎ আবিষ্কার করবে তুমি আর গাইছ না, তোমার গান তোমারই সামনে গাইছে অন্যরা, তুমি শুধু তোমার গিটারটা বাজাচ্ছো সুরে-ছন্দে, বড়জোর কিছুটা হার্মোনাইজ করছ গলা দিয়ে, মূল গান, মূল সুরটা গাইছে জনতা। তখন তুমি বুঝতে শুরু করবে তোমার গান ফোক সং হয়ে উঠেছে।

আমার চোখের সামনে কানের সামনে কথাগুলো ফলে যাচ্ছে। চিৎকার করে, অথচ সুরে ছন্দে গাইছেন বেচারাম, গাইছেন সিঙ্গুরের বিদ্রোহীরা— 'জাগো বিদ্রোহ—জাগো বিদ্রোহ ছোটো প্রতিশোধ-কামনার খ্যাপা ঘোড়া—'

এসো মুকুন্দদাস, তোমার নাতিপুতিদের একবার দেখে যাও শুনে যাও, এসো পীট সীগার, তোমার ছেলেমেয়েদের একবার দেখে যাও শুনে যাও, মানুষ আর গান এখনও লড়াই করছে এ ওকে জাপ্টে ধরে—এসো

ভিক্তর হারা, চিলির মাটিতে তোমায় কবর দেওয়া হয়েছিল, ফাশিস্তরা তোমায় অত্যাচার করে তোমার জিভ ছিঁড়ে দিয়ে, গিটার বাজানো হাতদুটো কেটে দিয়ে মেরে ফেলার পর—এই দ্যাখো, এই সিঙ্গুরে তুমি বেঁচে আছো : তোমার এই শ্যামলবরণ লড়াকু কম্পানিয়েরা।

কম্পানিয়েরাদের মধ্যে, তাদের গলার শিরা ফুলিয়ে গাওয়া গানে এসো রবীন্দ্রনাথ, তুমি বলেছিলে 'সঙ্গীতে এতটা প্রাণ থাকা চাই যাতে তার ওপর সমাজের আর সমাজের ওপর তার প্রভাব পড়ে, যাতে সমাজের বয়সের সঙ্গে তার বয়স বাড়ে'—দ্যাখো, আমরা সত্যি সত্যিই প্রাণবন্ত সঙ্গীত তৈরি করতে পেরেছি কিনা—

আর গুনগুন করতে পারলাম না, সজোরে গেয়ে উঠলাম, আর আমার চেয়েও দৃপ্ত কণ্ঠে, আমার চেয়েও সুঠামভাবে গেয়ে উঠলেন বেচারাম ও আমাদের সিঙ্গুর-সহযোদ্ধারা :

'কাজী নজরুল তোমার বাক্য ধার করে আমি গাই
জনজাগরণ দেখে আজ আমি এই গান বেঁধে যাই—'

কত বছর আগে, সঙ্গীত ও গান নিয়ে আমার মনে যখন বিভিন্ন প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল, বিশ শতকের সেই সাতের দশকের গোড়ায় যখন মনে হয়েছিল যে গানগুলো ছেলেবেলা থেকে শুনছি, গাইছি সেগুলো দিয়ে হবে না, আমায় যদি গাইতেই হয় তো আমায় গান বাঁধতে হবে, গানকে তার বিনিময়মূল্যসর্বস্বতা (বাজারি-দামসর্বস্বতা) থেকে বের করে এনে তাকে তার ব্যবহারিক মূল্যে নিয়ে যেতে হবে। সিঙ্গুরের জনজাগরণে আমি দেখতে-শুনতে পাচ্ছি আমার তৈরি করা গান তার নিজের জোরে এবং তাকে যারা কোনও ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে নয় তাদের জীবনের অঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করতে চায় তাদের জোরে (কোনও চলচ্চিত্র, বেতার, বিজ্ঞাপনের সাহায্য ছাড়াই) একটা **ব্যবহারিক মূল্য** পাচ্ছে।

আমি থেমে গিয়েছি, বেচারাম মান্না গেয়ে যাচ্ছেন, আমার চেয়ে ঢের ভাল গাইছেন :

'কাজী নজরুল তোমার বাক্য ধার করে আমি গাই
জনজাগরণ দেখে আজ আমি এই গান বেঁধে যাই
এখনও স্মৃতিতে তোমার কথাই প্রতিবাদী সুরে মোড়া

ল্যাজে যদি তোর লেগেছে আগুন স্বর্ণলংকা পোড়া
শালবল্লার বেড়ায় আগুন বিরোধী নিশান ওড়া।'

আমার গিটারগুলোর জন্য আমার মন কেমন করছে। মনে হচ্ছে এখন যদি ওদের একটাও আমার হাতে থাকত তো বেচারাম আর গ্রামবাসীদের সঙ্গে ঠিকঠাক সঙ্গত করা যেত।

"They sentenced me to twenty years of boredom
For I wanted to change the system from within
Now I come to reward them
First we take Manhattan then we take Berlin."

—Leonard Cohen

বেচারা সি পি আই এম আর তাদের বশংবদরা। কত চেষ্টাই না করে গেল তারা এতগুলো বছর শুধু আমার গলাটা বন্ধ করতে। বেচারা এই রাজ্যের বড় বড় প্রতিষ্ঠান আর পত্রিকা হাউস। কত কেচ্ছাই না করল আমাকে আর আমার সৃষ্টিগুলোকে অপমান করতে। বেচারা অসংখ্য বাঙালি, যারা শুধু আমার গানগুলোকে লাথি মেরে মেরে কাটিয়ে দিল প্রায় কুড়িটা বছর। আরও কয়েক শো বছর কাটিয়ে দেবে তারা লাথি মেরে আর অপমান, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে।

২০১০ সালের অক্টোবরের ২৮ তারিখে লিখছি এই অংশটা। দিন সাতেক আগে একটা এস এম এস এলো। প্রেরককে আমি চিনি না। তিনি লিখছেন: 'আজ আমার জন্মদিন উপলক্ষ্যে আমার সি পি এম করা বাবা আপনার ৫০টি গানের একটি সিডি দিয়ে আমাকে বললেন: এইসব ছাইপাঁশ বেশি না শোনাই ভাল।' আজ আমি উপলব্ধি করলাম : সি পি আই এম কোনও দল নয়, ওটা একটা স্বভাব। আপনি আমার প্রণাম নিন। খুব সুস্থ থাকুন।'

'সি পি আই এম কোনও দল নয়, ওটা একটা স্বভাব'—এমন প্রাজ্ঞ উক্তি জীবনে খুব কম শুনেছি, যদি আদৌ শুনে থাকি।

যুবকটিকে মনে মনে অনেক আদর করে এবং এই বইটি আরও কয়েকজনের সঙ্গে তাঁকেও উৎসর্গ করে আমি লিখলাম: এই স্বভাব কিন্তু শুধু সি পি আই এমের নয়, প্রায় সকলেরই।

বড় ভয়ংকরভাবে এই স্বভাবটাই ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের মধ্যে। এই

স্বভাবটা আছে বলেই এ-দলে ও-দলে ভাগ হয়েও আসলে একই ভাবে ভাবি, সিদ্ধান্ত নিই, যে আমার বশংবদ নয়, ধামাধরা নয়, যে আমার মন জুগিয়ে চলে না—তার প্রতি একই বিদ্বেষ পোষণ করি, একইভাবে তাকে করি কোণঠাসা, তার মুখে লেপে দিই কালিঝুলি, তার নামে ছড়াই কুৎসা, তার কাজগুলোকে মারি লাথি, তাকে নিয়ে বিদ্রূপ করি, মনে মনে ভাবি ব্যাটা মরলে বাঁচি। আর যে আমার লাথিঝ্যাঁটা খেয়ে, আমার বোকামিগুলোকে সহ্য করে উঠতে বসতে কুর্নিশ করে আমায়, তাকে দিই শিরোপা, গজমোতির হার। এই স্বভাবটা আমাদের সবার মধ্যেই অল্পবিস্তর ছড়িয়ে পড়েছে বলে একদিকে সি পি আই এম বলে ছাইপাঁশ, আর উল্টোদিকে তৃণমূলপন্থী নেতাঘনিষ্ঠ এক প্রবীণ নামজাদা শিল্পী, তাঁর বিরুদ্ধে আমি কিছু না বলা সত্ত্বেও, তাঁকে একটিও কটু কথা না বলা সত্ত্বেও আমাকে আমারই বাড়িতে বসে চোখ লাল করে, চিৎকার করে শাসাতে পারেন, '২০১১ সালের পর তোমার চরম সর্বনাশ হয়ে যাবে'। স্বভাব। আর কিছুই না স্বভাব। সি পি আই এম চায় তার বিরুদ্ধে কিছু বলা চলবে না। আর এই বিশিষ্ট পরিবর্তনবাদী ও ক্রান্তিবিশারদ চান তৃণমূলের কোনও নেতিবাচক ব্যাপারেও ট্যাঁ-ফুঁ করা চলবে না। তিনি একা নন। তাঁর মতো আরও অনেকেই আছেন। ছবি আঁকা থেকে সরাসরি ব্যবহারিক রাজনীতিতে সেঁধিয়ে গিয়ে ২০১১ সালের আগেই তখন আমায় জ্ঞান দিতে পারেন (একই রকম চোখ লাল করে, অথচ লাল রং তাঁর ভীষণ অপছন্দ, একই রকম চিৎকার করে) : তোমার আন্ডারে সাতটা বিধানসভা। সেখানে কোনও গোলমাল দেখা দিলে দায়িত্ব তোমার। ভাবো একবার, নন্দলাল বসু বা কান্‌ডিন্‌স্কির মানসপুত্র শেষে কৌটিল্য- ম্যাকিয়াভেলি-হ্যারল্ড লাস্কি চটকে হাল-ভারতের রেয়ালপলিটিকের দরিয়ায় একই সঙ্গে ব্যাক্‌স্ট্রোক আর বাটারফ্লাই সাঁতরাতে চাইছেন। তুমি, আমার ছেলে, বলবে হয়তো এ-কী দুর্মতি! আমি, তোমার পিতৃতুল্য এক গানওলা বলব (তোমারই জবানে): স্বভাব। নেহাতই স্বভাব।

স্বভাবটা আবার বিচিত্র, ছেলে আমার। এই ব্যক্তিটিই আবার ঐ ঘটনার বছরখানেক আগে থেকে আমায় নিয়মিত ভজাচ্ছিলেন— 'বড় বাড়িতে' যাওয়ার জন্য, লোকসভার ভোটে দাঁড়ানোর জন্য। 'তুমি ছাড়া ঐ

পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে আর কে বলবে বাংলার দুর্দশার কথা?' আহা! বাংলার দুর্দশার সূত্রগুলো যে আগে খোলসা করা দরকার সেটা কে বলবে, কোথায় বলবে। দুর্নীতি নামে আমাদের এক আত্মার আত্মীয় যে আমাদের রাজ্য ও জাতির দুর্দশার বড় একটি কারণ, আমি যে সেই দুর্নীতির কথাই বলছিলাম, ২০১১ সালের পর আমার চরম সর্বনাশ ঘটানোর অঙ্গীকারদাতার মাথায় সেটা ঢোকেনি। কেন? কারণ—স্বভাব।

প্রফেট সুকুমার রায়ের 'লক্ষণের শক্তিশেল' নাটকটা একবার পড়ে দ্যাখো।

দেখবে, রাবণের বাণে লক্ষণের পতন ও মূর্ছা। নাট্যকারের নির্দেশ: 'রাবণ কর্তৃক লক্ষণের পকেট লুণ্ঠন'। এমনই এক মুহূর্তে মঞ্চে হনুমানের প্রবেশ। ঢুকেই হনুমান কী বলছেন? 'এই, দেখে ফেলেছি, দেখে ফেলেছি।'

আমার স্বভাব যদি ঠিক হত, পলিটিকালি কারেক্ট হত তাহলে বিস্তর কষ্ট করে, অনেক বাধা পেরিয়ে সি পি আই এমের বিরুদ্ধে ভোটে জিতে সাংসদগিরি নামে রঙ্গমঞ্চে চির-হনুমান (কোনওদলে যদি তুমি ঠিকঠাক থাকতে চাও তো চির-হনুমানের রোলটাই তোমায় করে যেতে হবে, নইলে, হুঁ হুঁ বাওয়া, অমুক সালের পর—) হয়ে ঢুকে পকেট লুণ্ঠন বা যে লুণ্ঠনই দেখে ফ্যালো, 'এই, দেখে ফেলেছি দেখে ফেলেছি' বলা চলবে না।

আমার স্বভাবটাও দ্যাখো, ছেলে, তুমি যাকে খুব ভালোবাসো, যাকে তুমি তার পরেই এস এম এস-এ জানিয়েছ 'এরাই আপনার মৃত্যুর পর আপনার নামে ব্রিজ বানাবে, রাস্তার নাম দেবে, সভা করবে, বড় বড় কথা বলবে' তার নিজের স্বভাবটা একবার ভেবে দ্যাখো: আমিও কেমন নাড়ুগোপাল হয়ে, ফেনা ওঠা দুধে ভেজানো উড়কি ধানের মুড়কি হয়ে শেষবেশ মেনেও নিলাম। কেন? স্বভাব! চরম ও পরম পীড়াপীড়ির মুখেও 'না' বলতে পারা, 'না' বলে যাওয়ার অক্ষমতা। এটাও তো স্বভাবই। জঘন্য একটা স্বভাব আমার।

তুমি কিচ্ছু ভেবো না, ছেলে, বাংলাদেশের কবি সৈয়দ সামসুল হক তাঁর 'বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা' কাব্যে যেমন লিখেছিলেন : 'আবার বাংলার তালুক যাবে।'— আমার গানের তালুক আগেও গিয়েছে, পরেও যাবে।

আর, ২০০৮ সালের অগাস্ট মাসে সিঙ্গুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধরনা মঞ্চে বেচারাম মান্না ও কয়েক শো গ্রামবাসী যে 'শালবল্লার বেড়ায় আগুন' গাইছিলেন সেটা আমার গানের তালুক নয়, বাংলার সংগ্রামী গ্রামবাসীদের লড়াইয়ের তালুক। এই তালুক কিন্তু সহজে যাওয়ার নয়। আমরা যদি মনে করে থাকি রাজনৈতিক ক্ষমতা বদলের সঙ্গে সঙ্গে ঐ তালুকটা আর থাকবে না তাহলে আমরা April Fool নই, 2011 Fool.

আমার আদরের, এখনও না-দেখা, শুধু এস এম এস পাঠানো ছেলেটা, মনে রেখো, তোমার সি পি এম করা বাবা কিন্তু তোমার জন্মদিনে আমার গানেরই সিডি দিয়েছেন তোমায়। মুখে যাইই বলুন এই ছাইপাঁশের স্রষ্টা ও শিল্পীর ছাইপাঁশের গানগুলোই তোমায় উপহার দিয়েছেন। সি পি আই এম আর আমার মধ্যে রাজনৈতিক শত্রুতার সম্পর্কই তো রয়েছে। তাও। এই কাজটা অন্য কোনও দলের লোক হয়তো নাও করতে পারেন। আমার গান সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই, রেগেমেগে ছাইপাঁশও ভাবে না তো করবে কোত্থেকে। আমার মতো জাতশত্রুর প্রধান হাতিয়ার ও সংকেত নিজের ছেলের হাতে তুলে দিতে গেলে, নিজের ঘরে যেচে নিয়ে আসতে গেলে একদিকে লাগে এক স্নেহশীল বাপের মন, অন্যদিকে লাগে বুকের পাটা।

> "I am guided by the stars in the heaven
> I am guided by the birth-mark on my skin
> I am guided by the beauty of our weapon
> First we take Manhattan then we take Berlin."
>
> —Leonard Cohen

আমার না-দেখা ছেলেটা, মনে রেখো: আমার/আমাদের অস্ত্রের সৌন্দর্য, রূপ। সঙ্গীতের সৌন্দর্য, রূপ। আমার, আমাদের অস্ত্র।

উনিশ

২৪ অগাস্ট ২০০৮ থেকে ৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আমায় দু বার যেতে হয়েছিল সিঙ্গুরে মমতার ধরনা মঞ্চে মমতার অনুরোধে। সেই মঞ্চেই প্রথম দেখতে পাই এস ইউ সি আই নেতা প্রভাস ঘোষ বসে আছেন। মঞ্চের বাইরে এস ইউ সি আই এর অনেক অ্যাক্টিভিস্ট তাঁদের দলের ফ্ল্যাগ নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। প্রগতিশীল ইন্দিরা কংগ্রেস নেতা সোমেন মিত্রকেও দেখলাম মঞ্চে। বেশি কথা বলেন না তিনি। মঞ্চে আমি এদিক ওদিক হাঁটাহাঁটি করছি দেখে সোমেনদা আমায় একটা চেয়ারের কাছে নিয়ে গিয়ে দুই কাঁধের ওপর দুই হাত দিয়ে চাপ দিতে লাগলেন, যাতে আমি বসে পড়ি। মুখে একটি কথাও বললেন না। এমনকি তেমন হাসলেনও না। ভোটে জিতে দিল্লি যাওয়ার পর সোমেনদার সঙ্গে আরও পরিচয় হয়। কী যে স্নেহশীল মানুষ তিনি। আমি যে রাজনীতির লোক নই, এসবের কিছুই যে বুঝি না এটা সোমেন মিত্রই বোধহয় সবচেয়ে ভাল বুঝেছেন। ভবিষ্যতে রাজনীতির সঙ্গে আমার কোনও যোগ থাকবে বলে মনে হয় না (এখনই বলতে গেলে নেই)। ২০০৬ সাল থেকে অনেককেই দেখে নিলাম। সোমেন মিত্রকে আমি মনে রেখে দেব সারাজীবন কোনও রাজনৈতিক কারণে নয়, তাঁর অকৃপণ স্নেহশীল স্বভাবের জন্য।

এস ইউ সি আই নেতা প্রভাস ঘোষের সঙ্গে আমার পরিচয় সেই 'তারা' চ্যানেলের 'লাইভ দশটা'য়-এর আমল থেকে। 'মতামতে'ও তিনি আমাদের অতিথি হয়েছেন একাধিকবার। এস ইউ সি আই নেতা মানিকবাবুও। সিঙ্গুরে মমতার মঞ্চে এস ইউ সি আই নেতাদের দেখে ভাল লেগেছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের মানুষ সি পি আই এমের

নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে সিঙ্গুরের কৃষিজীবীদের স্বার্থে এক মঞ্চে বসছেন, দূরত্বগুলো সাময়িকভাবে হলেও ঘুচে যাচ্ছে— এটা দেখেই ভাল লাগছিল।

ভাল লেগেছিল দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখেও। একটা টোকা মাথায় দিয়ে এক পাশে বসেছিলেন তিনি। রিজওয়ানুর রহমানের মা ও বোনও মঞ্চে ছিলেন। মমতাকে পাশে নিয়ে রিজওয়ানুর রহমানের মা বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। অসীম গিরি প্রায় রোজই যেতেন সিঙ্গুরে। মমতার মঞ্চে গান গেয়েছিলেন তিনি। যতদূর মনে পড়ে, মমতার লেখায় সুরে 'তোমার নাম আমার নাম নন্দীগ্রাম নন্দীগ্রাম' গানটিও গেয়েছিলেন অসীম।

ঐ দিন মমতার মঞ্চেই মমতার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন অপর্ণা সেন, শাঁওলী মিত্র এবং অর্পিতা ঘোষ। মঞ্চের তলায় একটা ঘর তৈরি করা হয়েছিল। সেই ঘরেই তাঁদের বৈঠকটি হয়। মঞ্চে সিগারেট খাওয়া যায় না বলে ঐ ঘরে নেমে গিয়ে পেছন দিকের পর্দা সরিয়ে আমায় বাইরে যেতে হচ্ছিল। ব্রাত্য বসুও এসেছিলেন সেদিন। তাঁরা আসার আগে কোথা থেকে যেন খবর এলো পুলিশের এক বড় কর্তা আসছেন বাহিনী নিয়ে। সিঙ্গুর অবরোধের মঞ্চগুলি তিনি নাকি ভাঙবেন। মমতা খুব রুষ্ট হলেন এই খবরটা পেয়ে। মোটামুটি ঠিক হয়ে গেল যে পুলিশ বাহিনী এসে যদি ভাঙচুর করতে চায় তাহলে শারীরিকভাবে প্রতিরোধ করা হবে। ওরকম কোনও বাহিনী আসেনি সেদিন। এলেন বরং অপর্ণা, শাঁওলী, অর্পিতা। তাঁরা বসলেন মমতার মুখোমুখি। ব্রাত্যও এলেন। তিনি বসলেন অন্য দিকে। আমি সেদিন ভিডিও ক্যামেরায় ছবি তুলছিলাম। মমতা আমাকে তাঁর এই অতিথিরা আসার আগেই ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন ঐ ঘরে। আমি গিয়ে দেখি মমতার দুই দেহরক্ষী মেঝেতে সতরঞ্চি পেতে শুয়ে আছেন। শরীর খারাপ কিনা জানতে চাওয়ায় তাঁদের একজন বললেন কদিন ধরে তাঁদের ওপর দিয়ে খুব ধকল যাচ্ছে, তাই মমতা তাঁদের ঐখানে শুয়ে জিরিয়ে নিতে বলেছেন।

মমতা আমায় আগেই বলেছিলেন যে কয়েকজন অতি বিশিষ্ট মানুষ আসবেন, তবে মঞ্চে সামিল হতে নয়। তাঁরা নাকি আসবেন 'জানতে'। সিঙ্গুর ধরনার কোনও মঞ্চেই কেউ সামিল নাও হতে পারেন। এই অধিকার

সকলেরই আছে। কিন্তু 'অতি বিশিষ্ট কিছু ব্যক্তি' মমতার মঞ্চে আসবেন অথচ তাঁরা আসলে মঞ্চে আসবেন না, মমতার কাছ থেকে সিঙ্গুর সম্পর্কে 'জানবেন'— এই ব্যাপারটা আমার একটু বেখাপ্পা লাগছিল। মমতাকে আমি বলেছিলাম, এত মানুষ ধরনা দিচ্ছেন, তুমি নিজে একটানা থাকছো এখানে, আরও অনেকে থাকছেন দিনে রাতে, আর 'অতি বিশিষ্ট' এই ব্যক্তিরা একবার সংহতিও জানাবেন না সকলের সঙ্গে—এটা তুমি মেনে নিচ্ছো কেন।

আমার মেজাজ চড়ছে দেখে মমতা শোভন চট্টোপাধ্যায়কে বলতে লাগলেন, কানন, কবীরদাকে শিগ্‌গিরি কফি দাও। যাও কবীরদা, তুমি কফি আর সিগারেট খেয়ে এসো, আমি ঠিক সামলে নেব।

এমনিতেই মমতার ঝঞ্ঝাটের শেষ নেই, আমি আর কথা বাড়ালাম না, কিন্তু মেজাজটা একটু বেঁকে রইলই। ব্রাত্যকে হাতের কাছে পেয়ে ওকেই বোধহয় দু কথা শুনিয়ে দিলাম। বেচারা ব্রাত্য কী আর করবে। ও আমার সঙ্গে তর্ক করল না। আমি কিন্তু গজগজ করেই গেলাম। মমতা ইতিমধ্যে আমার অনেক রূপই দেখেছেন, তাই আমায় তিনি আর ঘাঁটালেন না। 'মঞ্চে আসছে— অথচ মঞ্চে আসছে না' ব্যাপারটায় আমি কিন্তু ঘেঁটেই রইলাম।

অপর্ণা সেন, শাঁওলী মিত্র ও অপির্তা ঘোষ যখন মমতার সঙ্গে কথা বলছিলেন আমি ছবি তুলছিলাম। অপর্ণা সেন এতে কিঞ্চিৎ রুষ্ট হলেন বোধহয়। তিনি হাত দিয়ে ইঙ্গিত করতে লাগলেন যাতে আমি আর ছবি না তুলি। আর তুললাম না। তিনি বা অন্য দুজন বুঝতে পারেননি যে আমি আসলে তাঁদের ছবি তুলছিলাম না অত। ছবি তুলছিলাম আমি মমতার। Mamata, the phenomenon. মনে মনে গজগজ করতে করতে আমি দেখছিলাম কতটা শিষ্টাচার ও ধৈর্যের সঙ্গে মমতা বোঝাচ্ছেন সবকিছু। সমীর পুততুণ্ডও ততক্ষণে এসে পড়েছিলেন, মাঝেমাঝে তিনিও বোঝাচ্ছিলেন। সেদিন সিঙ্গুরের মঞ্চে মমতার ও জনতার যে ভিডিও আমি তুলেছিলাম তার কিছু কিছু অংশ আমি আমার 'মমতা যেখানে যায়' গানটির মিউজিক ভিডিও তৈরির কাজে ব্যবহার করেছি।

অপর্ণা সেন, শাঁওলী মিত্র আর অর্পিতা ঘোষ তারপর মঞ্চে উঠতে বাধ্য হন, কারণ বেরোনোর অন্য কোনও রাস্তা ছিল না। তাঁদের মঞ্চে

দেখে, বিশেষ করে, আমার ধারণা, অপর্ণা সেনকে দেখে মঞ্চের সামনে দাঁড়ানো অসংখ্য মানুষ হর্ষধ্বনি করতে লাগলেন। তিনজনের একজন (নাকি তিনজনই?) মাইক্রোফোনে জানিয়ে দিলেন: 'আমরা কিন্তু মঞ্চে আসিনি, আমরা এসেছিলাম জানতে।'

'এসেছিলে তবু আসো নাই জানায়ে গেলে' —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সি পি আই এমের নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ঘনিয়ে ওঠা গণ-আন্দোলনে ঐ তিনজনেই সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। শাঁওলী মিত্র-অর্পিতার নাট্যগোষ্ঠীর 'পশু খামার' নাটকটির অভিনয় সি পি আই এমের অ্যাক্টিভিস্টরা বা সি পি আই এম-ঘনিষ্ঠ কেউ কেউ বন্ধ করে দিয়েছিলেন এক সময়ে। তা নিয়ে পত্রিকায় লেখালিখি হয়েছিল। অপর্ণা সেনও জনসভায় ভাষণ দিয়েছিলেন জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে। মেট্রো চ্যানেলে অনুষ্ঠিত একটি সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে, আমার মনে আছে, তিনি বলেছিলেন: ধরুন যদি টিভোলি কোর্টের বাসিন্দাদের বলা হয় আপনাদের সকলকে ওখান থেকে চলে যেতে হবে, ঐ জায়গাটা সরকার নিয়ে নেবে, তখন কেমন লাগবে। তাঁর ভাষণ দেওয়ার ভাবাবেগহীন, বাগাড়ম্বরমুক্ত, বাস্তবনির্ভর, সহজ-সাবলীল ধরন আমার ভাল লেগেছিল। সিঙ্গুরের ধরনা-মঞ্চে তিনি যদি কিছু বলতেন তো গ্রামবাসীরা একটু অন্য আঙ্গিকের কিছু বক্তব্য শুনতে পেতেন।

২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপুল সাফল্যের পর এমন কাউকে কাউকে বিলক্ষণ মমতা-নিযুক্ত কমিটিতে সদস্যপদ নিতে দেখা গিয়েছে যাঁদের মন মমতা সম্পর্কে সংশয়মুক্ত ছিল না। অন্তত ২০০৭ সালের ১৪ নভেম্বরের মহামিছিল পর্যন্ত তো নয়ই। অপর্ণা সেন কোনও পদ পেয়েছেন বা নিয়েছেন এই মর্মে কোনও খবর মিডিয়ায় আসেনি বোধহয়।

আমার মনে আছে, সেদিন আমার ভাষণের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে ঘোষকের ভূমিকা নিয়েছিলেন। মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে তিনি বলেছিলেন, কবীর সুমন নিজেই একটি আন্দোলন। তিনি যা বলেন তা থেকে আমি শিখি। তিনি কারও পরোয়া করেন না তাই সোজাসাপটা কথা বলেন। ভাষণ দিতে গিয়ে আমি প্রথমেই বলেছিলাম

আমার ভাষণ ও বক্তব্যের সঙ্গে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা এই মঞ্চে আসীন কারও কোনও সম্পর্ক নেই। আমি যা যা বলব এগুলো নিতান্তই আমারই কথা, কোনও দলের কথা নয়, কারণ আমি কোনও দলের নই।

সেই সন্ধেতে সিঙ্গুর থেকে বিদায় নেওয়ার আগে গ্রামের এক যুবক আমাকে জানান, তিনি জমি-আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় সি পি আই এমের লোকজন তাঁর শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে নাকি এমন ভয় দেখিয়েছেন যে শ্বশুরবাড়ি থেকে যুবকটির বিরুদ্ধে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা রুজু করা হয়েছে। তাঁর স্ত্রীকে আর আসতে দেওয়া হয় না তাঁর কাছে। অথচ যুবকটি তাঁর স্ত্রীকে ভালোবাসেন, তাঁকে বাদ দিয়ে বেঁচে থাকার কথা ভাবতেও পারেন না। কথাগুলি বলতে বলতে ঝরঝর করে কাঁদছিলেন সেই যুবক।

এটাও তাহলে হল রাজনৈতিক লড়াইয়ের, বিরুদ্ধবাদীদের শায়েস্তা করার, শাস্তি দেওয়ার একটা পদ্ধতি। সংসদীয় রাজনীতি।

কুড়ি

সিঙ্গুর ধরনার পরিণামে ৭ সেপ্টেম্বর কলকাতার রাজভবনে রাজ্যপালের উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে বৈঠক হল, বলতে গেলে তারই মধ্য দিয়ে সূচিত হল সি পি আই এম সরকারের পরাজয়। টেলিভিশনের পর্দায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের যে মুখ, ওরা ৩০ আমরা ২৩৫-এর সি পি আই এম-মুখ্যমন্ত্রী, সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম আন্দোলন চলাকালে টেলিভিশনে ভাষণ-দানরত 'ভারতের মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি করে পুকার' বুদ্ধদেবের কোনও মিলই ছিল না। রাজ্যবাসী দেখলেন এক পরাজিত, বিব্রত, ম্লানমুখ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে।

যে বিরোধী নেতাকে সি পি আই এম দীর্ঘকাল 'কালীঘাটের ময়না' সমেত বিভিন্ন নামে ডেকে দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার লিখে এসেছে, যাঁর নামের প্রতি ইঙ্গিত করে এক প্রবীণ সি পি আই এম নেতাকে বলতে শোনা গিয়েছে 'কেউ যেন নিজের মেয়ের নাম মমতা না রাখে', যিনি পুলিশের মারে আহত হবার পর আর-এক প্রবীণ সি পি আই এম নেতা মিডিয়ার সামনে শারীরিক ভাষা প্রয়োগ করে বলেছিলেন 'ওর অত বুকেই বা লাগে কেন', ২০০৭ সালের ১৪ নভেম্বরের মহামিছিলে যাঁর হাঁটা চলবে না বলে দাবি জানিয়েছিলেন বিভিন্ন প্রগতিশীল 'বুদ্ধিজীবী' অন্তত একজন সিনিয়র কবি এবং একাধিক নামজাদা অভিনেত্রী ও নাট্যকর্মী, সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ ও দেহের ভাষা ছিল শান্ত। দীর্ঘকাল কায়মনোবাক্যে সি পি আই এমের বিরুদ্ধে লড়াই করে অবশেষে মমতা পৌঁছোতে পারলেন বিজয়ীর জায়গায়।

সেই মর্যাদা মমতা অর্জন করে নিয়েছিলেন অবশ্যই। কিন্তু তিনি একা

নন। সিঙ্গুর জমিরক্ষা আন্দোলনের বিভিন্ন দলের অসংখ্য অ্যাক্টিভিস্ট এবং অনেক দলহীন অ্যাক্টিভিস্টের লড়াই, আত্মত্যাগ, রক্তদানও অর্জন করে নিয়েছিল সি পি আই এম ও বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে বিজয়ীর মর্যাদা। রাজভবনে সবার অলক্ষ্যে দাঁড়িয়েছিলেন তাপসী মালিক, রাজকুমার ভুল। ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনেও সি পি আই এম বিরোধী প্রার্থীদের কাঁধে নিঃশব্দে হাত রেখে দাঁড়িয়েছিলেন সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের শহীদরা, গণধর্ষিত বীরাঙ্গনারা। নন্দীগ্রামের কোনও মাদ্রাসার পড়ুয়া, নীল পাঞ্জাবি, সাদা পায়জামা পরা সাদা টুপি মাথায় চাপানো যে ছোট্ট ছেলেটা মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে আমার মুখে 'কোথায় যাচ্ছিস রে?' শুনে তার মুঠো পাকানো ডান হাত এক ঝটকায় আকাশের দিকে তুলে ঝলমলে মুখ করে বলেছিল 'কৃষি' সেও ছিল আমাদের হাত ধরে।

তার সেই ভঙ্গিটাই প্রতিরোধ।

"Poesie ist eine Art Wiederstand.
Ich hatte Poesie im Kopf
Und harte Eier in der Hose."

—Juergen Theobaldy

(কবিতা এক ধরনের প্রতিরোধ।
আমার মাথার ভেতরে ছিল কবিতা
আর প্যান্টের ভেতরে শক্ত ডিম।)

আমার মাথার ভেতরে ছিল, আছে, থাকবে গান, বাজনা। আমার নতুন অ্যালবাম 'প্রতিরোধ' এর গানগুলো তৈরি করছি। যন্ত্রাণুষঙ্গের ট্র্যাকের পর ট্র্যাক।

একজোট হয়ে প্রতিরোধ হোক
হোক শেষ সংগ্রাম
মুক্ত সকালে নিশানের হবে
তাপসী মালিক নাম।

আমার গানগুলোর ভিডিও সংস্করণ তৈরি করছি নিজে। প্রত্যেকটা কাজই খুব সময়সাপেক্ষ। অন্য কোনও কাজে আমি আর নেই, শনি রবিবার গান শেখানো ছাড়া। আমার মনে হয়েছিল আমার এই গান-ভিডিওগুলো সি পি আই এমের বিরুদ্ধে প্রচারে কাজে লাগবে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের

দু একজন আমার ভিডিও কপি করে নিলেন। মনে আছে, একবার তৃণমূলের ববি হাকিমের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় তাঁকে খান পাঁচেক ভিডিও দিয়েছিলাম একটি সিডিতে। মমতাকে একদিন প্রস্তাবটা দেওয়ায় তিনি বললেন, আগে আমাকে একবার দেখিয়ে নিও।

ঠিকই তো। ওঁদের প্রচারে ব্যবহার করার আগে তো একবার দেখিয়ে নেওয়া দরকারই। সরকারি পরিভাষায় 'ভেটিং'। ভেটিং-এ অনুমোদন তবেই সরকার বা রাষ্ট্র ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি অবশ্য ওঁকে দেখিয়ে নিইনি। আমার সৃষ্টি আমি কারুর কাছে দাখিল করি না কোনও ছাড়পত্রের জন্য। আমার লেখা পঁচিশটি গানের লিরিক আমি শেষ দাখিল করেছিলাম ১৯৯০ সালে আকাশবাণীর স্বপ্না মণ্ডলের অনুরোধে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে গীতিকার হিসেবে অনুমোদনের জন্য। তারপর থেকে কেউ আমার কোনও কাজ 'ভেট' করতে চায়নি। পাঁচটি বাংলা চলচ্চিত্র, দুটি তথ্যচিত্র এবং দু বার একটি রাজনৈতিক দলের প্রচারের জন্য গান লিখে সুর করে গেয়ে বাজিয়ে দিয়েছি ১৯৯১ সাল থেকে। কিন্তু কোথাও 'ভেটিং'-এর দরকার পড়েনি।

আমার তৈরি গানের অ্যালবাম 'প্রতিরোধ' বেরোল সেপ্টেম্বর মাসে। আর অক্টোবর মাসে তৃণমূল কংগ্রেসের কয়েকজন নেতা আমায় অনুরোধ করলেন কয়েকটি পথসভা করে দেওয়ার জন্য। আমি রাজি হলাম এই শর্তে যে আমি যাতে গিটার নিয়ে গান গাইতে পারি তার উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে। এই পর্যায়ের প্রথম সভাটি হল হাজরা পার্কে। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের কয়েকজন বড় নেতাও ছিলেন, যেমন সৌগত রায়। আমি খবর পেয়েছিলাম মমতা নিজে দেখছিলেন যাতে সভা-অনুষ্ঠানগুলি সুষ্ঠুভাবে হয়। সভায় উপস্থিত তৃণমূল নেতা ববি হাকিম ও অরূপ বিশ্বাসকে আমি বলেছিলাম সি পি আই এমের হাতে যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের বড় বড় কাট্ আউট তৈরি করাতে। পুজোর সময়ে সেই কাট্আউটগুলি বিভিন্ন জায়গায় রাখা যেতে পারে। অনেক লোক দেখতে পাবে। দু জনেই আমায় বলেছিলেন তাঁরা অবশ্যই কাজটি করবেন।

দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটি হল শ্যামবাজারের মোড়ে। পৌঁছে দেখি তৃণমূল নেতাদের বক্তৃতা চলছে। আমাকে মঞ্চে উঠতে দেখেই বক্তারা ভাষণ

থামিয়ে দিলেন। আমি বললাম, চলুক না ভাষণ। একজন নেতা বললেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে দিয়েছেন কবীর সুমন মঞ্চে উঠলেই যেন অন্য সবকিছু বন্ধ হয়ে যায়।

খুব প্রাণবন্ত অনুষ্ঠান হল শ্যামবাজারের মোড়ে। অনেক গান গাইলাম আমি, সেই সঙ্গে বক্তব্য রাখলাম। মাঝে সি পি আই এমের লোকাল কমিটি থেকে মিছিল বেরোলো। খুব জোরে জোর স্লোগান দিতে দিতে কয়েকবার আনাগোনা করল সেই মিছিল। তা সত্ত্বেও আমি গান আর ভাষণ চালিয়ে গেলাম। প্রচুর লোক হয়ে গিয়েছিল। স্থানীয় তৃণমূল নেতারা খুব দৌড়োদৌড়ি করছিলেন যাতে যানবাহন চলাচলে কোনও ব্যাঘাত না ঘটে। পুলিশও সহযোগিতা করছিলেন। মমতার নির্দেশে ঐ অনুষ্ঠানটির ভিডিও রেকর্ডিং করা হচ্ছিল। মমতা চেয়েছিলেন সেই ভিডিও রাজ্য জুড়ে তৃণমূলের প্রচারে ব্যবহার করতে। দুঃখের বিষয়, রেকর্ডিং-এ বেজায় ত্রুটি ছিল, ফলে ভিডিওটি সম্ভবত আর ব্যবহার করা যায়নি।

ঐ সভার পর মমতার সঙ্গে আমার আর যোগাযোগ ছিল না অনেকদিন। তৃণমূল কংগ্রেস বা অন্য কোনও দলেরও কেউ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। মমতার ফোন পেলাম নভেম্বর মাসের কোনও এক দিন। ইস্রায়েল তখন গাজা স্ট্রিপের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাচ্ছে। মমতা জানালেন তার বিরুদ্ধে একটা জনসভা হবে, তিনিও থাকবেন সেখানে, আমিও যেন যাই। ময়দানের এক পাশে সভাটা হচ্ছিল। পৌঁছে দেখি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষণ দিচ্ছেন। আরও কেউ কেউ ভাষণ দিলেন, যেমন ইমাম বরকতি সাহেব। সরদার আমজাদ আলি সাহেবও ছিলেন সেখানে। আমি দেখতে পেলাম সকলেই ইস্রায়েলের আক্রমণের বিষয়টাকে নিছক গাজা ভূখণ্ডের ইসলামী জনগণের ওপর ইহুদী রাষ্ট্রের জুলুমবাজি হিসেবে দেখছেন। মার্কিন সমর্থনপুষ্ট ইস্রায়েল যে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থই চরিতার্থ করছে, গাজা ভুখণ্ডের ওপর যে একসময়ে মিশরও যথেষ্ট জুলুমবাজি করেছে, যদিও মিশরও ইসলামী, গাজায় যে একটি ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিও ছিল এবং ইস্রায়েলের মতো কিছু জোরালো ইসলামী শক্তিও যে আসলে ধর্মনিরপেক্ষ প্যালেস্টাইন মুক্তি সংগঠন ও তাঁদের মিত্রদের বরদাস্ত করতে পারেনি কোনওদিন—এই দিকগুলির উল্লেখও করছেন না কেউ। অর্থাৎ হয়

ঐ অঞ্চলের ইতিহাস ও রাজনীতি সম্পর্কে বক্তাদের বিশেষ ধারণাই নেই, আর নয়তো ইচ্ছে করেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আড়ালে রেখে দিচ্ছেন তাঁরা। ইসলাম-আক্রান্ত ইসলাম-আক্রান্ত রব তুলে তাঁরা নিছক অতি-সরলীকরণ করছেন। ফলে শ্রোতারা আসল তথ্যগুলো জানতে পারছেন না।

মমতা এসে পড়লেন। এসেই আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, চলো তুমি স্মারক-প্রদীপগুলো জ্বালাবে। আমি অবাক, কারণ আমি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নই। মমতা আমার কোনও আপত্তিই শুনবেন না। শেষে আমি বললাম, আমি রাজি যদি তুমিও আমার সঙ্গে প্রদীপ জ্বালাও। অগত্যা মমতাও আমার হাত ধরে প্রদীপগুলো জ্বালাতে লাগলেন। তারপর তিনি আমায় বললেন, এবার তুমি বলো। আমার ভাষণে আমি গাজা ভূখণ্ডের ইতিহাস, গাজার জনগণের অনেক বছরের সংকট, আমেরিকা ও ইস্রায়েলের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ও আগ্রাসন, একাধিক আরব দেশের দালালি, ঐ অঞ্চলে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলির কোণঠাসা অবস্থা ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করলাম। মমতার পাশে এসে বসতেই তিনি আমায় বললেন, তুমি এগুলো বললে, আমিও ভাল জানতাম না, অন্যরাও তো কীসব বলছে, আসল সমস্যার সঙ্গে কোনও সম্পর্কই নেই।

এর ঠিক দু তিন মিনিটের মধ্যে খবর এলো এক ট্যাক্সি-চালককে পুলিশ সামান্য কারণে বেধড়ক মেরেছে। মমতা আমায় বললেন, কবীরদা আমায় যেতে হবে স্পটে। বলেই মুখটা আমার মুখের খুব কাছে এনে চাপা গলায় বললেন, কবীরদা, তুমি যাদবপুর কেন্দ্র থেকে লোকসভা ভোটে দাঁড়াও, প্লীজ।

আমি (প্রায় আঁৎকে উঠে): সে কী! আমি তো এসবের লোকই নই। আমি পারব না, কিছুতেই পারব না।

মমতা: প্লীজ, কবীরদা, সব দায়িত্ব আমার। আমি সব সামলাবো, তোমায় কিছু ভাবতে হবে না।

আমি: প্লীজ, মমতা, এ হয় না। আমি এসবের লোক নই।

মমতা: এ নিয়ে আমরা পরে কথা বলব। এখন তুমি কাউকে কিছু বলো না। প্লীজ, আমার জন্য ভোটে দাঁড়াও, আমায় জিতিয়ে দাও

যাদবপুরে। তোমার বাড়িই তো ওখানে। কোনও প্রবলেম হবে না। আমায় এখন ছুটতে হবে। পরে কথা বলব। তুমি দাঁড়াও, আমার জন্য।

আমি আর কিছু বলার আগে মমতা প্রায় ছুটে চলে গেলেন মঞ্চ থেকে। আমি হাঁ করে বসে তাঁর হন্‌হন্‌ করে হেঁটে গিয়ে গাড়িতে ওঠাটা দেখলাম। মনে হল একবার মুখ ফিরিয়ে তাকালেন তিনি মঞ্চের দিকে।

এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে গেল ব্যাপারটা যে আমি হকচকিয়ে গেলাম। এরকম গোলমেলে অবস্থায় আমি কোনওদিন পড়িনি। সেই মার্চ মাসে অনুষ্ঠানের কয়েক দিন আগে 'কলকাতা' টিভির তথাগত দত্তর বাড়িতে ব্রাত্য বসু বলেছিলেন আমার লোকসভার ভোটে দাঁড়ানো উচিত, লোকসভায় যাওয়া উচিত। মমতাও তাতে সায় দিয়ে সোৎসাহে বলছিলেন আমার ভোটে দাঁড়ানোটা জরুরি। তার পর মাঝের সাত মাস কিচ্ছু বলেননি তিনি। তাঁর হয়ে অন্য কেউও কিছু বলেননি। আজ আবার সেই প্রসঙ্গ। এবারে এমনকি কেন্দ্রটাও উল্লেখ করলেন। সেই সঙ্গে 'আমায় জিতিয়ে দাও যাদবপুরে'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমায় বলছেন 'আমায় জিতিয়ে দাও'।

আমার মনে আছে, ট্যাক্সি ধরে ময়দান থেকে ফেরার পথে আমি মনে মনে বারবার বলছিলাম— অসম্ভব। অসম্ভব, মমতা। আমি আর সবকিছু করতে পারব, কিন্তু ভোটে দাঁড়াতে পারব না।

ঠিক দু দিন পরে আমি মমতাকে এস এম এস-এ জানালাম, আমি ভাল করে ভেবে দেখেছি। ভোটে দাঁড়াতে পারব না। আমায় এ অনুরোধ করো না। আমি রাজনীতির লোক নই। আমি পলিটিকাল অ্যাক্টিভিস্ট। পলিটিশিয়ান নই, কোনওদিন হতে চাই না, পারবও না।

মমতা এর উত্তর দিলেন কয়েক ঘণ্টা পরে। ওঁর সেই এক কথা। 'গ্রেট ফ্রেন্ড, তোমায় ভোটে দাঁড়াতেই হবে। তুমি জিতবেই যাদবপুরে। প্লীজ দাঁড়াও।' আমি আবার আপত্তি জানাচ্ছি। মমতা আবার সেই একই কথা লিখছেন।

কয়েকদিনের মধ্যে শুভাপ্রসন্ন আমায় ফোন করলেন।

শিল্পী শুভাপ্রসন্নর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ২০০৩ বা ২০০৪ সালে 'তারা' চ্যানেলের 'লাইভ দশটায়' অনুষ্ঠানে। কলকাতা শহর, নাগরিক

জীবন, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে একটু কেমন-কেমন সুরে তিনি বলেছিলেন কাজী আবদুল ওদুদের কথা যাঁর ঘরে তিনি দেখেছিলেন মুরগি ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্পিট্‌স্‌ কুকুর ঘুরে বেড়ালে বোধহয় আধুনিক নগরজীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকত। যাই হোক, সি পি আই এম বিরোধী গণ-আন্দোলনের একটি পর্যায়ে তিনি শাসকদলবিরোধী ভূমিকা নিতে থাকেন এবং একটি টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠানে বলিষ্ঠভাবে বলেন যে তিনি তৃণমূল। যথেষ্ট দাপটের সঙ্গে তিনি বিভিন্ন সভায় ও টিভি চ্যানেলের আলোচনায় সি পি আই এম ও বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার করে গিয়েছেন। আরও অনেকের সঙ্গে আমিও তাঁর তারিফ করেছি। গণ-আন্দোলনের জোয়ারে তাঁর সঙ্গে আমার আবার দেখা হল। শুভাপ্রসন্ন আমায় ফোন করে বললেন, আমার উচিত লোকসভা ভোটে দাঁড়ানো। অনেকক্ষণ ধরে নানান যুক্তি দেখালেন তিনি। আমি তাঁকে বললাম, তোমার উচিত ছিল উকিল হওয়া। বলাবাহুল্য, গণ-আন্দোলনের সহযোদ্ধা হিসেবে তার আগেই বিভিন্ন জায়গায় আমাদের দেখা হয়েছে, একই মঞ্চ থেকে আমরা দুজনেই ভাষণ দিয়েছি, আমাদের মধ্যে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, গড়ে উঠেছে সংহতি। মমতাকে যেমন, তেমনি শুভপ্রসন্নকে আমি বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে আমি রাজনৈতিক লোক, কিন্তু রাজনীতির লোক নই। একেবারে অন্য ভাষায় কথা বলি আমি। আমার ধরনধারন, হাবভাব, চালচলন, কথাবার্তা, ধ্যানধারণা সবই আলাদা। ব্যক্তিগত জীবনেও আমি অন্য ধরনের লোক। রাজনীতিকদের জীবনচর্যার সঙ্গে আমার জীবনচর্যার কোনও মিল নেই। আমার সঙ্গে বনিবনা হবে না রাজনীতিকদের। নানান অসুবিধেই দেখা দেবে।

শুভাপ্রসন্নর যুক্তি ছিল, রাজনীতিতে এখন নতুন ধরনের মানুষ দরকার। সি পি আই এম ও তাদের সরকারকে উৎখাত করতে হবে। রাজনীতিক হিসেবে মানুষ যাঁদের চেনে তাঁদের ওপর মানুষের আর ততটা আস্থা নেই। এখন নতুন ব্যক্তিত্ব দরকার রাজনীতিতে। তিনি এও বললেন, তুমি যদি দাঁড়াও যাদবপুরে আমরা জিতবই।

আমি তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম : আসলে আমার কোনও দল নেই। অতীতেও ছিল না। এখনও নেই। ভবিষ্যতে থাকবে বলে মনে হয়

না। আলাদা কোনও আনুগত্য আমার কোথাও, কারুর প্রতিই নেই। মূলত আমি সঙ্গীতশিক্ষার্থী, সঙ্গীতকার, আর কিছুটা সাংবাদিক। স্বাধীনচেতা মানুষ আমি। কারুর পরোয়া করি না। মমতার সঙ্গে আছি মানে এই নয় যে যে-কোনও অবস্থায় আমি তাঁর প্রতি অনুগত থাকব। তাঁকে সমর্থন করছি, কারণ আমি মনে করি আগে, যে-করে হোক সি পি আই এমকে তাড়ানো দরকার। তারপর দেখা যাবে। সি পি আই এম ক্ষমতা থেকে যাওয়ার পর যারা আসবে তারাও যদি স্বৈরাচারী হয় তাহলে আবার রাস্তায় নামব। মমতা স্বৈরাচারী হলে, যা খুশি তাই করলে, গণতন্ত্রের অবমাননা করলে মমতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করব।

শুভাপ্রসন্ন আমার প্রতিটি কথা মেনে নিলেন। বললেন, দ্যাখো, ঐ যে বললে না আগে সি পি আই এম-টা যাক্— ঐ কারণেই তোমায় ভোটে দাঁড়াতে হবে। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে তুমি যদি দাঁড়াও সি পি আই এম হারবেই। এখানে মমতা জিতেছিল, তুমিও জিতবে। আগে সি পি আই এম-টাকে তাড়াই এসো।

আমার সঙ্গীতের কী হবে?

শিল্পী শুভাপ্রসন্ন বললেন, সঙ্গীতচর্চা করার যথেষ্ট সময় পাবে তুমি। কয়েক মাস তো মোটে লোকসভার অধিবেশন। তার ফাঁকে ফাঁকে প্রচুর সময় পাবে। আর দেখবে, মমতা এমন ব্যবস্থা করবে যে কেউ তোমায় বিরক্ত করবে না।

সত্যি বলতে, শুভাপ্রসন্ন একশোয় একশো ভাগ সহমর্মিতা, সংহতি, দরদ নিয়ে কথা বলেছিলেন। শেষে বললেন, তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে একবার কথা বলো। মন খুলে সব কথা বলো। দ্যাখো উনি কী বলেন। সাবিনা সেই মুহূর্তে ঢাকায় ছিলেন। তার কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর আসার কথা। অপেক্ষায় থাকলাম।

মমতা আমায় কাউকে কিছু জানাতে বারণ করে দিয়েছিলেন। আমি তাই কাউকেই বলিনি কিছু। কিন্তু অবাক কাণ্ড, আমার দুই অনুজপ্রতিম সাংবাদিক বন্ধু আমায় ফোন করে হাসতে হাসতে বললেন, দাদা, ভোটে দাঁড়াচ্ছো, আমাদের একবার জানালে না? আমি লড়ে গেলাম কথাটা খণ্ডন করতে। কে বলেছে? যত সব গুজব।

পরের দিন আমার খুব কাছের এক সাংবাদিক ফোন করে বললেন, সুমনদা, খবর পেয়েছি। আপনি চেষ্টা করুন শহরে না দাঁড়াতে। বসিরহাটে দাঁড়াতে পারেন। আমি গম্ভীরভাবে বললাম, এ সবের কিছুই জানি না আমি।

ঐ সময়ে আমি একটি বাংলা ছবিতে ছোট্ট একটি পার্ট করছিলাম। বাড়ির কাছেই শুটিং ছিল। সেই ছবির প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত এক সাংবাদিক (আমার বেশ কাছের মানুষ) আমায় শুটিং-এর অবসরে বললেন, ফাইনালি তাহলে দাঁড়াচ্ছেন ভোটে। খবর বেরিয়ে গিয়েছে। আপনি হয়তো এখনই কিছু বলতে চাইছেন না, আমাকে কিছু বলতে হবেও না, কিন্তু খবরটা আমি পেয়ে গিয়েছি। অনেক বছর হল তো এই লাইনে।

মমতা আমায় কাউকে কিছু বলতে বারণ করে দিলেও, বুঝলাম, তৃণমূল শিবির থেকেই খবর চুঁইয়ে বেরিয়ে গিয়েছে, যদিও কোন্ কেন্দ্র থেকে আমার দাঁড়ানোর কথা হচ্ছে সেই খবরটা বেরোয়নি। আমি দেখলাম, সাংবাদিকদের মধ্যে যখন খবরটা ছড়িয়েছে তখন আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছে কথাটা হাল্কাভাবে পাড়া যেতে পারে।

আমার নবীন বন্ধুরা মোটের ওপর কিন্তু কিন্তু করতে লাগলেন। একজন বয়স্ক বন্ধু একটু ভেবে বললেন, রাজনীতি তোমার পোষাবে না, কিন্তু এমনিতেও কী বা করছ, পাঁচ বছরের জন্য একটা চাকরি করছ এই মনে করেও এম পির কাজটা করতে পারো। অর্থাৎ তিনি ধরেই নিয়েছেন যে আমি জিতছি। আর একজন বয়স্ক বন্ধু বললেন, ভোটে একবার দাঁড়িয়ে দেখতে পারো কী হয়। অসীম একমাত্র বললেন, ভুলেও দাঁড়িয়ো না। মমতার যদি অতোই ইচ্ছে হয় উনি তোমায় রাজ্যসভায় পাঠান না! আমাদের কাছে তোমার যে স্থান, তুমি ভোট চেয়ে চেয়ে বেড়াচ্ছ এটা আমি মানতে পারছি না। আর একজন বয়স্ক বন্ধু বললেন, গত কিছু মাসে দেখেছি তুমি আগের চেয়ে ভাল আছো। গান শেখাচ্ছো, বাড়িতেই আছো, পড়াশুনো করছ, শান্তিতে আছো। ভোটে দাঁড়ালে কিন্তু এই শান্তি আর থাকবে না।

সাবিনা এসে পড়লেন। সব কথা তাঁকে খুলে বলায় তিনি ভেবেচিন্তে বললেন : জীবনে অনেক কিছুই তো করেছ। এটাও না হয় করে দ্যাখো একবার। তাছাড়া, মমতা নিজে যখন বলছেন।

শুভাপ্রসন্ন আবার ফোন করায় সাবিনার মত তাঁকে জানিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, সাবিনা উচিত কথাই বলেছেন। সেই দিনই শুভাদা আমায় বললেন ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁর রায়চকের বাড়িতে একটা বন্ধু-সমাবেশ হবে, সেখানে গান গাইতেই হবে। শুভাদা আমায় বললেন, শহরের কিছু গণ্যমান্য মানুষকে তিনি আমন্ত্রণ জানাবেন, তাঁদের সামনে আমি গান গাইব আর গণ-আন্দোলনের পক্ষে বক্তব্য রাখব। শুভাদা আমায় বললেন, তোমার পুরো পারিশ্রমিক আমি দিতে পারব না, কিন্তু তুমি প্রফেশনাল লোক, কিছু টাকা তোমায় দেব, নিতে হবে কিন্তু।

খুব ভাল লেগেছিল তাঁর এই মনোভাব ও প্রস্তাব।

একুশ

আমি বুঝতে পারছিলাম শুভাপ্রসন্ন নিছক বিনোদনের জন্য আমাকে ডাকছেন না তাঁর রায়চকের বাড়িতে। শিল্পী হিসেবে তাঁর যথেষ্ট নাম ডাক। 'কংসরাজের বংশধর'দের সঙ্গেই তাঁর ওঠাবসা নিশ্চয়ই। অতীতে একাধিকবার দেখেছি কোনও কোনও পশ্চিমী দেশের দূতাবাসে তাঁর যাতায়াত আছে। এক সময়ে কলকাতায় ভয়েস অফ জার্মানির সংবাদদাতা ছিলাম। একাধিক দূতাবাসে আমারও যাতায়াত ছিল। পেন্টারদের তো বিদেশী দূতাবাসগুলির সঙ্গে সম্পর্ক রাখা যথেষ্ট জরুরি— তাঁদের ছবির প্রদর্শনীর জন্য। বিদেশে একটা প্রদর্শনী ভালমতো হলে একটা না একটা ছবি, কপাল ভাল হলে কয়েকটা ছবি বিক্রী হবেই। এটা পেন্টারদের আয়ের একটা প্রধান উৎস। আমি অনুমান করছিলাম শুভাপ্রসন্নর বাড়িতে বিদেশের কূটনীতিক দু একজন আসবেনই। আমি এও অনুমান করতে পারছিলাম কলকাতা ও সম্ভবত দিল্লিরও কয়েকজন ভারী ওজনের লোক আসবেন— রাজনীতি ও অর্থনীতির দিক দিয়ে ওজনদার। এরকম এক যুগমুহূর্তে, সি পি আই এমের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ-আন্দোলন যখন শাসকদলকে বাধ্য করেছে রাজভবনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে, সারা দুনিয়ার সামনে নতিস্বীকার করতে, কূটনৈতিক কৌশলে নিজের এলেম দেখিয়ে অনেককে তাক্ লাগিয়ে দেওয়া শুভাপ্রসন্ন যে ফিল্মস্টার ও বাজারি বিনোদনশিল্পীদের খেদমৎ করবেন না এ তো জানা কথা। সি পি আই এমের বিরুদ্ধে নিয়মিত সরব হতে হতে এবং খোলাখুলি মমতা ও তৃণমূলের পক্ষ নিতে নিতে তিনি মমতার খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর ওপর নির্ভর করতে শুরু করেছিলেন তৃণমূলনেত্রী। দীর্ঘকাল সি পি আই এমের বিরুদ্ধে

কায়মনোবাক্যে লড়াই করে এসে, গ্রামবাংলায় এমনকি শহরগুলিরও প্রান্তিক পল্লীগুলির জনমানসে এক জোরালো ভাবমূর্তি সাফল্যের সঙ্গে গড়ে তুলে, ইতিহাসের অবদান সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থানের প্রাণপ্রবাহকে দর্শনীয় রাজনৈতিক তৎপরতা ও চালের দক্ষতায় কাজে লাগিয়ে মমতা যে ২০০৯-এর গোড়ায় অদৃষ্টপূর্ব এক ক্ষমতা-অবস্থানে উপনীত হতে পারলেন সেই অবস্থানে শুভাপ্রসন্নর সঙ্গে তাঁর নির্ভরতার সম্পর্ক এক ঐতিহাসিক ঘটনা। আমার মতো এক ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রকে, মমতা যাকে অনেকগুলি মাস 'গ্রেট ফ্রেন্ড' বলে এসেছেন, যার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে সংগ্রাম করেছেন, সেই ব্যক্তিকে লোকসভার ভোটে দাঁড়ানোর ব্যাপারে রাজি করাতে মমতা—অন্য কারুর না—এই শুভাপ্রসন্নরই শরণ নিচ্ছিলেন। ধরা যাক, কারুর একটা মাধ্যমে তিনি সরাসরি সাবিনার সঙ্গে গোপনে কথা বলতে পারতেন, যাতে নিজের ঘরে আমি একটু হলেও প্রতিরক্ষাহীন হয়ে পড়ি। অথবা তিনি মহাশ্বেতা দেবীকে বলতে পারতেন আমার সঙ্গে কথা বলতে বা সরাসরি নির্দেশ দিতে। সে দিকে না গিয়ে তিনি যে শুভাপ্রসন্নকে এই দায়িত্ব দিলেন এটা একদিকে প্রমাণ করে তাঁর রাজনৈতিক বুদ্ধি কতোটা প্রখর, আর অন্যদিকে দেখিয়ে দেয় অতি স্পর্শকাতর ও সূক্ষ্ম বিষয়ে তিনি কার ওপর নির্ভর করছিলেন ঐ সময়ে। এ হেন শুভাপ্রসন্ন ঐ মুহূর্তে, ২০০৯ সালের জানুয়ারির মাঝামাঝি, ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বময় লোকসভার ভোটের মাত্র তিন-চার মাস আগে তাঁর রায়চকের বাড়িতে একটি, ধরা যাক, নতুন বছরের সম্মেলন বা মিলনভোজ করছেন, সেখানে আমাকে বলছেন একা গান গাইতে আর কথা বলতে— এর পেছনে রাজনৈতিক কূটকৌশল থাকতে বাধ্য। কোথাও একটা, কারুর বা কিছুর একটা শীলমোহর হয়ে ওঠার কথা যেন এই অনুষ্ঠানটির। আমার এক বন্ধু আছেন যিনি সিটু করেন। এ রকম শিক্ষিত, রসিক ও খোলামনের মানুষ আমি কম দেখেছি। তিনি আমায় অনেক দিন ধরে বলে আসছেন যে কবীর সুমন তাঁর বন্ধু বলে তাঁর স্বদলীয়দের কাছ থেকে কুকথা শুনতে হয়। আশ্চর্য, ভোটে জিতে সংসদে যাবার পর সেন্ট্রাল হলের ধূমপায়ীদের ঘরে সি পি আই এমের সাংসদদের সঙ্গে আমি জমিয়ে আড্ডা দিই বলে, শুনেছি, তৃণমূলের কোনও কোনও সাংসদ আমাকে সন্দেহের চোখে

দেখেন। আনন্দবাজার পত্রিকার একটি খবরে পড়েছিলাম কোন্ এক তৃণমূল সাংসদ যেন নালিশ করেছেন সাংসদ সীতারাম ইয়েচুরির সঙ্গে আমার বন্ধুতা আছে বলে। অর্থাৎ, উদ্ভট অসহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে কোনও পক্ষই কম যান না। আমি যে কোনও দিন কোনও দলের সঙ্গে ভিড়িনি, আজও যে আমি কোনও দলের সঙ্গে একাত্মবোধ করি না এবং ভবিষ্যতেও করব বলে মনে হয় না, এটা তার প্রধান একটা কারণ। যাই হোক, আমার সেই সিটু-করা বন্ধু আমায় গণ-আন্দোলনের সময়ে হাসতে হাসতে জানিয়েছিলেন তাঁর সিটু-সি পি আই এম বন্ধুরা নাকি শুভাপ্রসন্নকে 'রাসপুটিন' বলে থাকেন। এতে শুভাপ্রসন্নর রাগ করা উচিত নয়। Sense of humour চলে গেলে তো সবই চলে গেল। রাজনীতিতে আবার ঐ বস্তুটিই সবচেয়ে কম থাকে, প্রায় থাকে না বলাই ভালো। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে সেন্স অফ পলিটিক্সের সঙ্গে সেন্স অফ হিউমর যাঁদের আছে, অভিজিৎ কুণ্ডু তাঁদের অন্যতম। সব দিক বিবেচনা করে আমি তাঁকেই আমার সঙ্গে যেতে বললাম। আমি তাঁকে বললাম সব দিকে খেয়াল রাখতে এবং ছবি তুলতে। এই রকম অনুষ্ঠানের ছবি থাকা দরকার আমাদের কাছে।

অনুষ্ঠানের আগের দিন মমতা আমায় ফোন করে জানালেন তিনি বোলপুরে। বোলপুর থেকে কলকাতায় ফিরে তার পর রায়চকে যাবেন, তাই আমি যেন গান দেরিতে শুরু করি। সেটা সম্ভব ছিল না। অন্য অভ্যাগতরা এসে পড়বেন ঠিক সময়ে। সেটাই হল। আমি অনেক আগে চলে গিয়েছিলাম সাউন্ড চেক নেব বলে। গিয়েই দেখি এস ইউ সি আই এর তরুণ নস্কর বসে আছেন। একে একে অন্যরাও এলেন। রাজনীতিকদের মধ্যে তৃণমূলের দীনেশ ত্রিবেদী আর বিজেপির তথাগত রায়কে দেখলাম। তথাগত রায়কে আমার ভাল লাগে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা, জ্ঞান আর রসবোধের জন্য। দীনেশ ত্রিবেদীও রসিক মানুষ। মনে আছে, লোকসভার হলে তাঁর সঙ্গে যেদিন প্রথম দেখা হল (আমরা হল থেকে বেরোচ্ছিলাম কফি খাব বলে) তিনি আমায় বলেছিলেন : *"Dada,* I feel sorry for you. This is not your place. Seeing you here is like seeing a tiger in a cage. This place has no soul. It's only a body."

নাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা বিভাস চক্রবর্তী ও সুমন মুখোপাধ্যায়কে (আমার অনেক দিনের স্নেহভাজন বন্ধু সুমন চলচ্চিত্র পরিচালনাও করছেন) দেখছি। দেখছি 'দৈনিক স্টেট্‌সম্যানে'র সম্পাদক মানস ঘোষকে। 'তারা' চ্যানেলের কর্তা রথীকান্ত বসু আছেন। আছেন সপরিবারে জয় গোস্বামী। ব্রিটেন, জার্মানি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল কন্সালরাও এসেছেন। এসেছেন আরও অনেকে, যাঁদের সবাইকে আমি চিনি না। মমতা এখনও আসেননি। গান শুরু হচ্ছে। আমি একটি নাইলন তারের ক্লাসিকাল গিটার নিয়ে গাইছি।

দু ঘণ্টা ধরে গান, গানের পর গান আর সেই সঙ্গে কথা। গণ-আন্দোলনের কথা। সি পি আই এমের অপশাসনের কথা। কথা বলছি বেশিরভাগটাই ইংরিজিতে যাতে সবাই বুঝতে পারেন—অনেক অবাঙালিও আছেন যে। লড়াইয়ের কথা। শহীদদের কথা। ধর্ষিত বীরাঙ্গনাদের কথা। বাংলার জনমানসে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সি পি আই এম—শাসনমুক্ত নতুন যুগকে বরণ করে নেওয়ার ইচ্ছের কথা। ভালবাসার কথা। বন্ধুতার কথা। পরিবেশচিন্তার কথা। গাছপালা, প্রাণীদের কথা। শ্রমজীবী মানুষদের কথা। তাঁদের প্রতি বেইমানির কথা। গণ-সংগ্রামীদের কথা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। নন্দীগ্রামের বীর যোদ্ধাদের কথা। বিদ্রোহ, অভ্যুত্থানের কথা। প্রতিরোধের কথা। আশার কথা। যন্ত্রণার কথা। তাপসী মালিকের কথা। সেই সঙ্গে গান আর গান। বেশিরভাগই রাজনৈতিক গান, আবার প্রেমের গানও।

মমতা এসে পৌঁছোচ্ছেন আমার গান শেষ হয়ে যাওয়ার ঠিক পরে। ঠিক যেন ঘড়ি ধরে। গান, গিটার আর ভাষণ-ভাষ্যের মধ্য দিয়ে জমি তৈরি। তৈরি হয়ে গিয়েছে অনুকূল পরিবেশ, পরিমণ্ডল। মমতা আসছেন। দুপুরের খাওয়ার তোড়জোড় চলছে তখন। মমতার নালিশ, কী হবে, গান শোনা হলো না যে। সাউন্ড সিস্টেম খুলে নেওয়া হয়েছে। আমি বললাম, খাওয়াদাওয়ার পর গাইব মমতার জন্য।

এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারেন না তিনি। শ্রোতা হিসেবে আমার 'গ্রেট ফ্রেন্ড'কে মনোযোগী মনে হয় না আমার। তাও স্বভাবসিদ্ধ ছটফটানি দমিয়ে রেখে কয়েকটা গান শুনলেন। মুখের পেশি

শিথিল। চোখের কোণে মাঝেমাঝে অদ্ভুত এক ছেলেমানুষি। হঠাৎ এক টুকরো হাসি। সেই হাসির খানিকটা ঠোঁটে, খানিকটা চোখে। পরের মুহূর্তেই মুখ গম্ভীর। মমতা। বাংলার অসংখ্য সাধারণ মানুষ যাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছেন। মমতা। মুহূর্তের মধ্যে যিনি হয়ে উঠতে পারেন ক্রুদ্ধ জাগুয়ার। পরের মুহূর্তেই যিনি কোমল। খুব সাধারণ ঘর থেকে এসে যিনি আজ উপনীত হয়েছেন ঐতিহাসিক অসাধারণত্বে। আজ এবং অদূর ভবিষ্যতে যিনি দিয়ে যাবেন এই রাজ্যের রাজনীতির গতিছন্দে প্রধান ঝোঁকগুলো। এক্সেন্ট। যাঁর ওপর নির্ভর করবে অনেক কিছু। একদিন, আজ থেকে বহু বছর পরে, আজ তাঁর বিরোধীরা যাইই বলুন এবং আমার এই লেখাটি পড়ে যতো অবাকই হোন আর যতো বক্রোক্তিই করুন, যাঁর নামে গ্রামের মেয়েরা হয়তো ব্রত উদযাপন করবেন।

তোমার সঙ্গে কথা আছে, কবীরদা।

মমতা আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন সামিয়ানার পেছন দিকে। ঐ জায়গাটা ফাঁকা, কেউ নেই। কে যেন হোঁচট খেয়ে চোট পেয়েছে পায়ে। জানতে পেরে মমতা তাঁর ব্যাগ থেকে বের করে দিচ্ছেন ওষুধ— এক্ষুনি খেয়ে নিতে বলো। শোনো কবীরদা, তোমায় ভোটে দাঁড়াতেই হবে। কোনও আপত্তি আমি শুনব না। তোমার গানবাজনায় কোনও ব্যাঘাত হবে না। দেখে নিও একটুও বিরক্ত করব না তোমায়। দ্যাখো, তাপস পাল তো বিধায়ক হয়েছে। ও ওর সিনেমার জগৎ নিয়ে থাকে, কোনও অসুবিধে হয় না। প্লীজ, কবীরদা, যাদবপুর।

মমতা, আমি রাজনীতির লোক নই। আমি ভয়ানক ইন্ডিভিজুয়ালিস্ট। কোনও কিছু মানি না, কাউকে মানি না। আমি মিউজিশিয়ান আর অ্যাক্টিভিস্ট। আমাকে সেটাই থাকতে দাও।

তুমি তাইই থাকবে। শুধু ভোটে দাঁড়াও। আমার জন্য দাঁড়াও। তুমি জিতবে। জিতবেই। আমি সব জেনে বুঝে বলছি। যাদবপুর তো আমারই কন্সটিটুয়েন্সি। তোমাকে ভাবতেই হবে না। আমি থাকব সব সময়ে তোমার পাশে। তুমি শুধু ভোটে দাঁড়াও। বাকি চিন্তা আমার।

কিছুতেই বোঝাতে পারছি না মমতাকে অথচ সমানে চেষ্টা করে যাচ্ছি বোঝাতে—আমি রাজনীতির লোক নই; আমি ইন্ডিভিজুয়ালিস্ট, একরোখা,

একগুঁয়ে, খামখেয়ালি, নিজের মর্জি মতো চলি। দল, সংগঠন মানি না, কাউকে মানি না। আমি থাকলেই ঝামেলা। চেষ্টা করছি বোঝাতে।

রাজনীতির লোক তোমায় হতে হবে না। তুমি যেরকম সেরকমই থাকবে। হয়েছে? তুমি শুধু ভোটে দাঁড়াও, আর কিচ্ছু ভাবতে হবে না তোমায়।

আমার প্রায় কান্না পাচ্ছে। ভালবাসার কাছে আমি বরাবরই বড় দুর্বল। মমতাকে আমি ভালবাসি। ফলে ওর সামনে আমি দুর্বল। আমি ওকে যাইই বলি না কেন ও তা মানবে না। ও ঠিক করে ফেলেছে আমাকে ও রাজি করিয়ে ছাড়বে। আর আমার চিন্তা অন্য। বড্ড ঘটনাবহুল জীবন যে আমার, বড্ড বেশি ঘাটের জল খেয়েছি যে, বড় বেশি আর বড্ড অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, বড় বেশি হারিয়েছি যে, অনেকদিন পর যাও-বা একজন বন্ধু পেলাম শিগ্‌গিরিই তাকে আমি হারাব। ভোটে দাঁড়িয়ে যদি হেরে যাই, সে একরকম। যদি জিতে যাই তাহলেই মুশকিল। মমতার দল, সম্ভবত মমতার সঙ্গেও আমার ঠোকাঠুকি লাগবে। নানান পর্যায়ে, বিভিন্ন স্তরে ব্যক্তিত্বের সংঘাত দেখা দেবেই, দিতে বাধ্য। মতবাদগত সমস্যাও দেখা দেবে।

দার্শনিক ফ্রীডরিশ্ নিট্‌শে বলেছিলেন কোনও লোকের জীবনে যদি দেখা যায় একই ঘটনা বারবার ঘটছে তাহলে তার সূত্রটা খুঁজতে হবে ঐ ঘটনাগুলোর মধ্যে নয়, ঐ লোকটার মধ্যে। 'না' বলতে পারার অক্ষমতার কারণে জীবনে যে কত অঘটন ঘটেছে, কত কী যে এদিক ওদিক হয়ে গিয়েছে। ভালবাসার কাছে আমি এত দুর্বল যে আমার মুখ থেকে 'না' বেরোতে চায় না। মমতাকে আমি 'না' বলেও সেই 'না' টাকে ওর সামনে খাড়া রাখতে পারছি না। ওর ধাক্কায় আমার 'না' টলে যাচ্ছে। তাও আমি শেষ লড়াইটা লড়ছি।

আর বেশি ভেবো না, কবীরদা। আমি এখন চলে যাব। তোমার সঙ্গে কথা হবে পরে।

খুব ক্লান্ত লাগছিল আমার। এইসব ভোট-টোটের জন্য তো আমি মমতার অনশন মঞ্চে যাইনি, তার পর মমতার সঙ্গেও থাকিনি। গণ-আন্দোলনে শরিক হয়েছি তার আগে থেকে। বিভিন্ন গণ-আন্দোলনে সামিল হয়েছি অতীতে। কোনওদিন ভোটের কথা ভাবিনি। ভোটে

দাঁড়ানোর প্রশ্নই ওঠেনি। একরাশ ক্লান্তি চোখে নিয়ে মনে হলো নেত্রীর মতো নয়, বিজয়িনী কিশোরীর মতো ছন্দ তোলা পা ফেলে ফেলে বাইরে চলে গেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাড়ি যাওয়ার পথে অভিজিৎ আমায় বলল, যা বোঝার বুঝে নিয়েছি। মমতা তোমায় নিশ্চই ভোটে দাঁড়ানোর জন্য জোরাজুরি করছিলেন? এখানে যারা ছিল তাদের মধ্যে অনেকেই তোমার প্রতিটি মুভমেন্ট লক্ষ্য করছিল। এক জায়গায় একজন অন্যদের বলছিল: He believes in what he is saying. তুমি তখন গান গাইছিলে।

বিষয়টা নিয়ে আলোচনার জন্য কিছু খাবার কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। অভিজিৎ বলল : তুমি ভোটে দাঁড়াও।

বাইশ

র‍্যাডিকাল রাজনীতিতে জীবনের অনেকগুলো বছর জড়িত থাকা আমার বন্ধু অভিজিৎ কুণ্ডু আমায় যাইই বলুন আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। তিনি বলছিলেন, একবার সাংসদ হতে পারলে উন্নয়নমূলক কাজ করা সম্ভব। প্রথমত সেই কারণেই রাজনীতিতে যাওয়া যায়। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিপুল সংখ্যক দরিদ্র ও দিশাহীন মুসলিম এবং দলিত শ্রেণীর উন্নয়নের কথা ভাবছিলেন অভিজিৎ। বস্তুত, আমি সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি আমার কলকাতার সেক্রেটারি হয়েছেন, হয়ে দাঁড়িয়েছেন সাংসদ তহবিলের অনুদান-সুপারিশে স্থানীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে যাবতীয় কাজকর্মের প্রধান নির্বাহী শক্তি। এক বছরের মধ্যে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে অভিজিতের তৎপরতায় ও তত্ত্বাবধানে যে পরিমাণ কাজ হয়েছে তা পশ্চিমবাংলায় একটি দৃষ্টান্ত। সারা ভারতেও এত কাজ এত অল্প সময়ে বেশি মানুষ করতে পারেননি। যাই হোক, ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে আমায় ভোটে দাঁড়ানোর উৎসাহ দিয়ে অভিজিৎ যা বলছিলেন তা আমি মন থেকে মানতে পারছিলাম না। তার প্রধান কারণ আমার প্রকৃতি ও স্বভাবের সঙ্গে ব্যবহারিক রাজনীতি খাপ খায় না। ব্যবহারিক রাজনীতি ও রাজনৈতিক তত্ত্ব এক জিনিস নয়। উন্নয়ন ছাড়াও কিছু তাত্ত্বিক কথাও বলছিলেন অভিজিৎ। ঐ তত্ত্বগুলির সঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে। কিন্তু আমি বরাবর লক্ষ্য করেছি, আমাদের দেশে বাস্তবে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে রাজনীতি যেভাবে হয়ে থাকে তার সঙ্গে রাজনৈতিক তত্ত্বের মিল প্রায় নেই বলা ভাল।

আমার খুব কাছের মানুষরা আমার ভোটে দাঁড়ানোর বিষয়ে কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলেন। বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা নবীন তাঁরা ভেবে পেলেন

না ঠিক কী করা উচিত। কেউ বললেন দাঁড়াও, কেউ বললেন দাঁড়িও না। বয়সে ও অভিজ্ঞতায় যাঁরা আরও বড় তাঁদের মধ্যে দু একজন বললেন, ভোটে দাঁড়ানো উচিত নয়। অসীম গিরি, যেমন, মোটেও চাইছিলেন না আমি প্রার্থী হই। অন্যরা বললেন, দাঁড়াও, কারণ এমনিতেও তো তুমি গান শেখানো ছাড়া খুব একটা কিছু করছ না।

কলকাতা বইমেলায় সহযোদ্ধা কল্যাণ রুদ্রর সঙ্গে দেখা হল। তাঁকে জানালাম, মমতা আমায় লোকসভা ভোটে দাঁড়াতে বলছেন। তুমি বলো কী করা উচিত।

'দাঁড়ান সুমনদা, অভির (দত্ত মজুমদার) সঙ্গে একবার কথা বলে আপনাকে পরে জানাব।'

দিন দুই পরে কল্যাণ আমায় জানালেন, অভি ও তাঁর মতে আমার ভোটে দাঁড়ানো উচিত। তাঁরা ভেবে দেখেছেন তাঁদের ভাবনাচিন্তা ও গবেষণার জগতে এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলি নিয়ে রাজনীতিকরা সংসদে হয়তো কিছু বলবেন না। আমি সাংসদ হলে আমি হয়তো বাংলার বিজ্ঞানীদের কণ্ঠ হয়ে দাঁড়াতে পারব ভারতের লোকসভায়।

সত্যি বলতে, মনে মনে চেয়েছিলাম কল্যাণ ও অভি বলুন—একদম না, সুমনদা। ভোট, রাজনৈতিক দল, লোকসভা আপনার জায়গা নয়। কল্যাণের কাছে অন্য সুর শুনে দমে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল—এই রে, এই যুক্তিটাকে তো কাটতে পারব না।

এইরকম একটা জলহাওয়ায় ২১শে ফেব্রুয়ারি এসে পড়ল। কলকাতায় কার্জন পার্কে যে ভাষা-দিবস উদ্‌যাপন করা হয়ে থাকে সেখানে তথাকথিত বামপন্থীদের ভূমিকাই বড়। আমাদের মমতাকেন্দ্রিক শিবিরে আমরা ঠিক করলাম আমরাও ভাষাদিবস উদ্‌যাপন করব দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কে। তৃণমূল কংগ্রেস দল কখনও ভাষা দিবস উদ্‌যাপন করেছেন কিনা জানি না, কিন্তু ২০০৯ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঐ দলের কোনও কোনও নেতা দেশপ্রিয় পার্কে চলে এলেন সম্ভবত মমতার কারণে। উপস্থিত ছিলেন সুনন্দ সান্যাল, দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সস্ত্রীক শুভাপ্রসন্ন, ব্রাত্য বসু, পূর্ণেন্দু বসু, অর্পিতা ঘোষ, দোলা সেন। সহনাগরিকরাও এসেছিলেন আমাদেরই মধ্যে কারও না কারও ডাকে। কবি সৈকত চক্রবর্তী

ছিলেন দর্শকদের আসনে। যতদূর মনে আছে মহাশ্বেতা দেবীও এসেছিলেন কিছুক্ষণের জন্য। মমতা এসেছিলেন পরের দিকে। তাঁর সঙ্গে বেশি লোকজন আসেনি। দেশপ্রিয় পার্কে পৌঁছে তিনি সবার পেছনে চুপচাপ বসেছিলেন। অনেকে হয়তো খেয়ালও করেননি যে তিনি ঐখানে বসে আছেন। দর্শকদের একেবারে সামনে একটা টেবিল পাতা ছিল। তার এক দিকে দর্শকদের দিকে মুখ করে বসে ব্রাত্য বসু অনুষ্ঠান পরিচালনা করছিলেন। বেশ চলছিল, হঠাৎ ব্রাত্য মমতাকে আহ্বান করলেন। রাজনীতিক বা নেত্রী হিসেবে নয়, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও কবি হিসেবে। মমতা, দৃশ্যত বিব্রত, একটু ইতস্তত করতে করতে এসে বসলেন। সেই সন্ধেতে মমতা ঘোষণা করলেন, দেশপ্রিয় পার্কে একটি ভাষাসৌধ তৈরি হবে। তিনি সে জন্য অর্থ জোগাবেন। সৌধটি নির্মাণ করবেন শুভাপ্রসন্ন।

ইতিমধ্যে ভোটে দাঁড়ানোর বিষয়টি নিয়ে ভাবতে ভাবতে আর আলোচনা করতে করতে আমারই প্রায় সৌধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। মমতা আমায় এস এম এসের পর পাল্টা এস এম এস পাঠাতে লাগলেন। প্রত্যেকটিতেই অনুরোধ—তুমি দাঁড়াও। আমিও পাল্টা এস এম এস পাঠাতে লাগলাম বিভিন্ন যুক্তি ও কারণ দর্শিয়ে—কেন আমার ভোটে দাঁড়ানো উচিত নয়। বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গেও বৈঠকের পর বৈঠক। কেউ কেউ বলতে লাগলেন, সাংসদ হতে পারলে তুমি নানা রকম কাজ করার সুযোগ পাবে। অনুজপ্রতিম বন্ধু ও সাংবাদিক পার্থ দাশগুপ্ত বললেন, কবীরদা, মমতাকে বলুন আপনাকে এক ভোটে হলেও জিততে হবে। সেই নিশ্চয়তা উনি দিতে পারবেন কিনা। এস এম এসে সেই নিশ্চয়তা দিলেন মমতা। আমি তাঁকে বললাম, আমি একাধিকবার বিয়ে করেছি। আমাদের দেশে যৌন নীতিবোধ এখনও এত উদ্ভট যে কেউ একাধিকবার বিয়ে করলেই অনেকে বলে—চরিত্র খারাপ। আমার সম্পর্কে সি পি আই এম এসব বলবেই। মমতা সঙ্গে সঙ্গে এস এম এস করলেন: সি পি আই এম কী বলে কিছু আসে যায় না। তুমি জিতবেই।

শিল্পী শুভাপ্রসন্নর সঙ্গেও একাধিকবার কথা হলো ফোনে। আমি শেষ চেষ্টা করতে গেলাম এড়াতে। শুভাদা আমার কোনও আপত্তিই শুনতে চাইলেন না। যে কেউ বলতে পারেন আমি ততদিনে নির্ঘাৎ মেনে নিয়েছি

যে আমি ভোটে দাঁড়াব, নয়তো যে যাই বলুন, যতো জোরালো যুক্তি দিয়েই বলুন, আমি যদি বলে দিতাম—আমি ভোটে দাঁড়াব না, দাঁড়াব না, দাঁড়াব না, এবং আর কোনও কথা যদি না হতে দিতাম, তাহলে কি কেউ আমায় খুন করত?

আমি জানি, কারও মনেই আমি এই বিশ্বাস এনে দিতে পারব না যে আমি সত্যিই চাইছিলাম না ভোটে দাঁড়াতে, আবার একই সঙ্গে আমার আন্দোলন-সহযোদ্ধাদের কষ্টও দিতে চাইছিলাম না।

একদিন, বেলা এগারোটা নাগাদ মমতা আমায় এস এম এস করা শুরু করলেন ভোটে দাঁড়ানোর ব্যাপারে আমি হ্যাঁ-বাচক সিদ্ধান্ত নিয়েছি কিনা জানতে। আমি আবার অসম্মতি জানাতে শুরু করলাম। মমতা আর আমি দুজনেই যে যার পক্ষে যুক্তি দেখাতে লাগলাম। কতবার যে আমরা টেক্সট্ করলাম তার ঠিক নেই। সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ মমতা আমায় ছোট্ট একটা টেক্সট্ পাঠালেন: Please don't say No.

আমার তরুণ বন্ধু সৈকত তখন আমার সঙ্গে বসেছিলেন আমার ঘরে। আমরা গল্প করছিলাম। জীবনে এমন কোনও কোনও মুর্হূত আসে, মানুষের যখন আর কিছু করার থাকে না। এক লহমায় চলচ্চিত্রের ফ্ল্যাশ্‌ব্যাকের মতো আমার মনে পড়ে গেল: মমতার অনশন মঞ্চে আমি গিয়েছি/জীবনে প্রথম মমতাকে এত কাছ থেকে দেখছি/অনশনক্লিষ্ট মমতা বিছানা থেকে উঠে নমস্কার করার চেষ্টা করছেন আর আমি তাঁকে বলছি উঠবেন না উঠবেন না, শুয়ে থাকুন/মমতা কাকে একটা ডেকে বলছেন কবীরদাকে একটা চেয়ার দাও, চা দাও//অনশন ভাঙার আগের সন্ধেতে মমতা এত অসুস্থ যে আমি আর যাচ্ছি না তাঁর সামনে/দোলা এসে বলছেন, গান গাও, মমতা তোমার গান শুনতে চাইছেন/হারমোনিয়াম বাজিয়ে আমি গাইছি/'ডেকো না আমারে ডেকো না'/কলকাতার ধোঁয়াশামাখা শীতের সন্ধে নেমে আসছে বিষণ্ণ জনসমাবেশে/'আমার দুঃখ জোয়ারের জলস্রোতে নিয়ে যাবে মোরে সব লাঞ্ছনা হতে'//পরের দিন একটু বেলায় আমার টেলিফোনে একটি মেয়ের গলা, অচেনা : কবীরদা, আমি মমতা বলছি, আমি নার্সিংহোমে, তুমি ভেবো না, তোমাদের চ্যানেলে খবরটা দিয়ে দিতে পারো, আর কারও সঙ্গে এখনও কথা বলিনি//

ভূমি-উচ্ছেদ-প্রতিরোধ কমিটি সি পি আই এমের কবল থেকে সোনাচূড়া ছিনিয়ে নেওয়ার পর মমতাকে আমি খবর দিচ্ছি/মমতা শান্তভাবে বলছেন তোমার আনন্দ হচ্ছে, কবীরদা? আমার হচ্ছে না/যারা চলে গেল তারা তো আর ফিরবে না, কবীরদা//১৪ই মার্চ ২০০৭ নন্দীগ্রামে গণহত্যার আগের রাতে মমতা আর আমি জেগে আছি, এস এম এস-এর পর এস এম এস/রাত আড়াইটে তিনটে নাগাদ মমতা আমায় বলছেন—কবীরদা, তোমার বয়স হয়েছে, তুমি ঘুমোও, কাল সকাল সাতটা থেকে আমি ঘুমাবো, তুমি জাগবে//কবীরদা তুমি আমায় আজ্ঞা করো মমতা আমি তোমায় বলছি 'সেজ' মেনে নাও, আমি এক ঘণ্টার মধ্যে ন্যাশনাল মিডিয়া ডাকব, কাল সকালে তুমি আশি কোটি টাকা পাবে, তুমি তোমার টেলিভিশন চ্যানেল খুলতে পারবে, তুমি হবে ডায়রেক্টর//পারলে না বলতে কবীরদা, পারলে না তো? এই হলো কবীর সুমন আর এই হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়/চলো কবীরদা, আমাদের কিছু হবে না, চলো চা খাই//কবীরদা, এখানে গণতন্ত্র-টনতন্ত্র কিস্‌সু হবে না, আর একটা চান্স নেব/তারপর অস্ত্র তুলে নেব/GR8 frnd, solidarity...

"Please don't say No."

সৈকতকে টেক্সটা দেখালাম। এর পর আর 'না' বলা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। আমার মৃন্ময়ী, আমার সৈকত, আমার সুযোগ, আমার দ্রুপদ, আমার সর্বেন্দ্র, আমার অর্ণব, আমার অভ্র, আমার অরিজিৎ, আমার অভির হয়ে, এই উদ্ভট সময়ে আমার সন্তানতুল্য যে বন্ধু-সহনাগরিকদের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, রসবোধ ও সংহতি আমায় আজও বেঁচে থাকতে বলে, গান লিখতে, সুর করতে, গাইতে আর বাজাতে বলে—সব্বার, সবকিছুর হয়ে সৈকত মাথা নিচু করলেন।

উপসংহার

কিছুদিন পরে, 'কলকাতা' টিভির স্টুডিওয় আছি একটা অনুষ্ঠানের জন্য। একজন এসে খবর দিলেন বাইরে কয়েকজন আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। জরুরি। বাইরে বেরিয়ে দেখলাম দুজন পুরুষ আর দু জন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। একজন বললেন, দাদা, আমার নাম ছত্রধর মাহাতো, আর ওনার নাম লালমোহন টুডু। দুই মহিলার নামও বললেন তিনি। বললেন, একবার লালগড়ে যেতে হবে আপনাকে। আরো কেউ কেউ যাবেন কলকাতা থেকে।

আমার পক্ষে তখন লালগড় যাওয়া সম্ভব নয়। আমি যদি যাই সি পি আই এম প্রচার করতে শুরু করবে কবীর সুমন মাওবাদী। অতীতে আমি প্রকাশ্যে পীপ্‌ল্‌স ওয়ারকে সমর্থন জানিয়েছিলাম, যদিও নিজেকে আমি কমিউনিস্ট বলি না। এদিকে মমতাকে আমি জানিয়ে দিয়েছি আমি ভোটে দাঁড়াব। আমি লালগড়ে গেলে মমতা রাজনৈতিক দিক দিয়ে ঝামেলায় পড়বেন। তাছাড়া, আমার একটা মার্জিনাল কার্ডিয়্যাক মায়োপ্যাথি আছে। বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে শুকনো মরশুমের ধুলো খেতে খেতে লালগড় যাওয়া এবং আসা আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে।

অসীম গিরি একটা গাড়ির ব্যবস্থা করেছিলেন। আমি যেতে পারলাম না। বন্ধু, সহযোদ্ধা অসীম দুঃখ পেলেন। যেদিন অনেকে লালগড় গেলেন, তার আগের রাতে মমতা আমায় ফোন করে জানতে চাইলেন আমিও যাচ্ছি কিনা। আমি না বলায় তিনি একটু স্বস্তি পেলেন মনে হলো।

আজ, ২ নভেম্বর ২০১০। লালমোহন টুডু আর নেই। ভারত সরকারের যৌথবাহিনী তাঁকে মিথ্যে এনকাউন্টারে খুন করেছে। ছত্রধর মাহাতো আজ ইউ এ পি এ আইনে জেলে আটক।

একদিন যাঁরা কলকাতা থেকে লালগড় গিয়েছিলেন জনসাধারণের কমিটির নেতা ছত্রধর মাহাতোর সঙ্গে দেখা করতে, কথা বলতে, সেই বাঙালি শিল্পী ইনটেলেকচুয়ালদের অন্তত একজন, ছত্রধরকে পুলিশ ইউ এ পি এ আইনে আটক করার পর বলেছিলেন, আইন আইনের পথে চলুক।

যৌথ বাহিনী লালগড়ে এবং অন্যত্র আদিবাসীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করার পর আমি ঠিক করি সংসদ ভবনের প্রবেশ পথে আমি যৌথ বাহিনীর অভিযান বন্ধ করার দাবিতে পোস্টার হাতে দাঁড়াব। মমতা তখন আমায় এস এম এস করে জানান ওসব চলবে না। তিনি জানান মাওবাদীরাও মানুষ মারছে। আমার ঐভাবে প্রতিবাদ করা চলবে না। তখন আমি তাঁকে এস এম এস করি : "I don't support any killing at all. But the State is the biggest terror. The State is killing and terrorising the adivasis and the marginalized in Chattisgarh and in Bengal. I have always opposed the State. If marginalized people are pushed to the wall they will take up arms. That's self defence. The State is mighty." (18th Feb 2010)

"Please allow me this (সংসদ ভবনের প্রবেশ পথে পোস্টার হাতে দাঁড়ানো). I am not causing any disturbance anywhere. You know I was not interested in MPship. I was a free man. But now I am a prisoner. I agreed to contest because you insisted. I have my conscience. I support the UPA, BUT I OPPOSE THIS WAR ON OUR TRIBALS AND MARGINALIZED PEOPLE. I CAN'T LIVE WITH IT. TIME IS RUNNING OUT." (18 Feb 2010)

"My conscience urges me to protest against Operation Green Hunt and the UAPA Act. Since there is no other way of projecting it at the Parliament I intend to stand at the main entrance of the Parliament Bhavan with a poster on 23 Feb ; PLEASE STOP THE OPERATION GREEN HUNT & REPEAL THE UAPA. Regards." (18 Feb 2010)

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমায় একাধিকবার এস এম এস করে বলেন যে মাওবাদীরা মানুষ মারছে। সেটা আমি মেনে নিচ্ছি কী করে? একবারও তিনি 'অপারেশন গ্রীন হান্ট', ছত্তিসগড় ও জঙ্গলমহলে যৌথবাহিনীর অত্যাচার সম্পর্কে কিছুই বলছিলেন না, আর তাতেই আমি অবাক হচ্ছিলাম। আমাদের কাছে খবর আসছিল যে যৌথবাহিনীর সেপাইরা আদিবাসীদের গ্রামে গ্রামে পাতকুয়োগুলোতে মলমূত্র ত্যাগ করছে, যাতে সেইসব কুয়োর

জল গ্রামবাসীরা আর ব্যবহার করতে না পারেন। মাওবাদীরা যে মানুষ মারছেন সে-সম্পর্কে আমি মমতাকে এস এম এস-এ লিখেছিলাম :

"Of course that's unacceptable. But how can the State justify the killing of Adivasis? The Operation Green Hunt is killing and terrorizing our Adivasis & the marginzalized." (19 Feb 2010)

ঐ সময় নাগাদ তৃণমূল সাংসদরা সংসদ ভবনের চত্বরে গান্ধীমূর্তির কাছে 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস'এর বিরুদ্ধে পোস্টার সমেত বিক্ষোভ করেন। মুখ্য সচেতক সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এস এম এস-নির্দেশ মোতাবেক আমি অসুস্থ শরীর নিয়েও সেই বিক্ষোভে অংশ নিই। সুদীপ আমায় বলেছিলেন 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস' বলতে তৃণমূল নেতৃবৃন্দ বুঝছেন তৃণমূল কর্মীদের ওপর সি পি আই এম সরকারের পুলিশ ও সি পি আই এম বাহিনীর সন্ত্রাস। আমি বলেছিলাম, এই সুযোগে আদিবাসীদের ওপর যৌথবাহিনীর অত্যাচারের বিষয়টাও কি আনা যায় না? আমায় বলা হয়েছিল এই বিক্ষোভে সেটা বিষয়ই নয়। আমি তখন মমতাকে টেক্সট করেছিলাম : "If you oppose the State sponsored killings why can't we speak against the Operation Green Hunt and the UAPA that allows the State to arrest anyone? I don't support the Maosists. But the CPIM, RSS all have killed thousands. And the State has now declared war on the people. Adivasis are being raped and butchered. I have to protest. Or else what am I doing here anyway? (19 Feb 2010)

ফ্ল্যাশব্যাক: বাংলার অত্যাচারিত মানুষের কথা সংসদে তোমার মতো করে আর কে বলবে কবীরদা?'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন কিছুতেই আমায় সংসদ ভবনের সামনে পোস্টার হাতে যৌথবাহিনী আর ইউ এ পি এ আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে দিতে চাইছেন না, এস এম এসে আপত্তি করছেন, আমি তখন তাঁকে টেক্সট করেছিলাম (রোমান হরফে বাংলায়) :

'আমি গণ-আন্দোলনের লোক। পলিটিকাল অ্যামবিশন নেই। আমি টি এম সি থেকেও আসিনি। আমায় জোরজার করে এসবে এনেছ। আমি চাইনি। আমি আমার মতো করে প্রতিবাদ করবই। আমায় তোমরা বা অন্য কেউ খুন করে ফেলতে পারো। আমি ভয় পাই না। ২৩ ফেব্রুয়ারি আমি

পোস্টার নিয়ে দাঁড়াব সংসদের দরজায়। আমায় বরং এক্সপেল করে দাও। মেনে নেব। এক্সপেল মি।' (১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১০)

এই মর্মে আমি মমতা ও সুদীপকে ফ্যাক্সও পাঠিয়েছিলাম। তার জবাবে মাননীয় মুখ্যসচেতক আমায় ফ্যাক্স করেই জানিয়েছিলেন যে সাংসদ কমিটিতে আমার প্রস্তাব ও পরিকল্পনা নিয়ে আগে আলোচনা হওয়া দরকার, তার আগে যেন আমি কিছু না করি। দলনেত্রী ও মুখ্যসচেতকের সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান জানিয়ে আমি একাধিকবার কমিটি বৈঠকের দিনক্ষণ জানতে চেয়েছি। আমার দুর্ভাগ্য আমায় আজও জানানো হয়নি, অর্থাৎ বৈঠকটি হওয়ার কথা উঠেছিল ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে কিন্তু তা আজও (২ নভেম্বর ২০১০) হয়নি। আমি কিন্তু তৃণমূলের উচ্চতম স্তরের সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান জানিয়ে সংসদ ভবনের সামনে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দেখাইনি।

এইখানে অফ্ ভয়েসে একটি গান ভেসে আসছে :

তুমি গান গাইলে
বিশেষ কিছুই হলো না
যা ছিল আগের মতো রয়ে গেল,
তুমি গান গাইলে, তবু
ফাটা মাটির বুকে ঝরল না জল
যা ছিল ফসল
চলে গেল বকেয়া ঋণের হাত ধরে,
তুমি গান গাইলে, তবু
খিদে পেল অনেকের, খাওয়া জুটল না।
তুমি গান গাইলে, তবু
বাজেটের টাকা গেল সামরিক খাতে,
জঙ্গি বিমান এলো বোমার পসরা এলো
খাবার এলো না
তুমি গান গাইলে।
ভূমিহারা কৃষকের কিশোরী মেয়েটা
শহরের রাস্তায় একলা দাঁড়াল
তুমি গান গাইলে,

বেকারবংশী ঐ পাড়ার ছেলেটা
গামছা গলায় দিয়ে ঝুলে পড়ল
তুমি গান গাইলে।

লালমোহন টুডুকে যৌথ বাহিনী মেরে ফেলার পর তাঁর মৃতদেহ ফেলে রাখা হয়েছিল একটা মর্গে। সেই সময়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছিল। লালমোহন টুডুর মেয়ে সেই পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। আসলে, মেয়ের পরীক্ষার আগে যৌথবাহিনীর হাত থেকে পালিয়ে থাকা বাবা একবার বাড়ি আসছিলেন মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে। আইন ও গণতন্ত্রের রক্ষী যৌথ-বাহিনী সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন। বাবার মৃতদেহ মর্গে পচছে এই সত্যটি মাথায় রেখে লালমোহন টুডুর মেয়েকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে হচ্ছিল।

খবর পেয়েছিলাম পুলিশ লালমোহনবাবুর স্ত্রীর হাতে মৃতদেহ তুলে দিতে চাইছে না। উল্টে তাঁকে হুমকি দিচ্ছে যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঐদিকে গেলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে।

এই খবর পেয়ে আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরপর এস এম এস পাঠাতে থাকি : "PCAPA Chairman Lalmohan Tudu's body is still lying at the Jhargram morgue. He was killed by the Joint Forces on 22 Feb. For heaven's sake intervene. He deserves a befitting cremation. He is a martyr. Two more Adivasis were killed by the Joint Forces. Bodies disappeared. Friends, rise up in revolt." (27 Feb 2010)

"Friends, the body of Lalmohan Tudu, President of PCAPA, killed by the joint forces, is lying at the Jhargram morgue since Feb 22. Please intervene so the police hands over his body to his relatives. Does he not deserve a decent cremation?" (28 Feb, 2010)

"Lalmohan Tudu's body is rotting at the Jhargram morgue. The police isn't handing over his body to his wife who is not being allowed to go to the morgue. Please intervene. (1 March 2010)

ঐ এস এম এসগুলো আমি মমতার সঙ্গে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও পাঠাচ্ছিলাম, তাই 'ফ্রেন্ডস' লিখছিলাম।

লালমোহন টুডু আমায় আমন্ত্রণ জানাতে এসেছিলেন, চেয়েছিলেন

আমি যেন লালগড়ে যাই। সাদামাটা চেহারার বিনয়ী সংগ্রামী মানুষটিকে জীবনে সেই প্রথম দেখেছিলাম। আমি জানতাম না প্রথম দেখাটাই হয়ে দাঁড়াবে শেষ দেখা। জীবনে প্রথম ও শেষ 'পলিটিকালি কারেক্ট' কাজ করেছিলাম, হে সংসদীয় গণতন্ত্রের দেবতা, লালগড়ে না গিয়ে! লালমোহন টুডুর মৃতদেহ পুলিশ যাতে ছেড়ে দেয়, তাঁর স্ত্রী যাতে স্বামীর মৃতদেহ সৎকার করার সুযোগ পান—নেত্রী আপনি হস্তক্ষেপ করুন। এস এম এস-এর পর এস এম এস পাঠিয়েও যখন কোনও সাড়া পেলাম না তখন একদিন আমি বিজ্ঞানী কল্যাণ রুদ্র ও কবি প্রসূন ভৌমিককে ফোন করে বললাম, আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে নেত্রী যদি হস্তক্ষেপ না করেন তাহলে আমি মিডিয়া ডেকে, সব কিছু জানিয়ে পদত্যাগ করব। তার পর কী হবে না হবে সে জন্য আমি আর দায়ী থাকব না। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি গণ-আন্দোলনে যিনি আমাদের এক অভিভাবক সেই তরুণ সান্যাল মহাশয়ের একটি এস এম এস পেলাম যেটি আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠানো হয়েছিল, আমার কাছে এল 'ফরওয়ার্ডেড' হয়ে। তরুণ সান্যাল মহাশয়কে কেউ একজন আমার সিদ্ধান্তটা জানিয়ে থাকবেন। তিনি তার পর মমতাকে টেক্সট্ করে অনুরোধ করেন লালমোহন টুডুর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে। তিনি লেখেন : মমতা, লালমোহন টুডুর বিষয়ে দয়া করে হস্তক্ষেপ করুন। সারা বাংলার বাম-গণতান্ত্রিক মানুষরা অপেক্ষা করছেন আপনার এই সদর্থক ভূমিকার জন্য। আপনি আর শুধু এম পি নন। আপনি বাংলার আশা। তরুণ সান্যাল।

আমার চরমপত্র প্রদানের দু ঘণ্টার ভেতর, অনেক কাল পরে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমায় ফোন করে জানান তিনি হস্তক্ষেপ করছেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম—ধন্যবাদ, নেত্রী।

তাঁকে প্রথম দেখেছিলাম কানোরিয়া শ্রমিক আন্দোলনের সময়ে উলুবেড়িয়ার ময়দানে। তিনি রাজনীতির মানুষ। নেত্রী। আমি একজন সঙ্গীতশিল্পী ও অ্যাক্টিভিস্ট।...

প্রতিবাদী গায়ক ও সাংসদ সুমনের প্রতি জঙ্গলমহলের প্রতিরোধী জনতার খোলা চিঠি

প্রিয় বন্ধু,

আপনাকে যখন এই চিঠি আমরা লিখছি তখন রাষ্ট্রের যৌথবাহিনী আমাদের হত্যা করার মহান দায়িত্ব পালন করছে। আমরা জঙ্গল মহলের বাসিন্দা—এই জল-জঙ্গল-জমি-বাদানকে আমরা রক্ষা করে আসছি। শত অত্যাচার সত্ত্বেও আমরা বেঁচে আছি বাঁচার স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরে। আমাদের অপরাধ আমরা অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছি। মানুষের পরিচয় ও অধিকার দাবী করেছি, আমাদের সম্পদের ওপর আমাদের অধিকারের কথা ঘোষণা করেছি এবং আমাদের উপর চলা পুলিশ, সিপিএম ও তাদের হার্মাদ বাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছি।

এই পরিস্থিতিতে কেন আপনাকেই শুধু আপনাকেই এই চিঠি। বন্ধু, সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রাম যেখানেই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে আপনার কণ্ঠ, আপনার গীটার সর্বদা সেই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে পক্ষেই সুর বেঁধেছে। আপনার 'আমি'কে আপনি বন্ধক রাখেননি। সাংসদ হবার পরও আপনার কণ্ঠ লালগড়ের পক্ষে, জঙ্গলমহলের মানুষের পক্ষেই রয়েছে। দল ও সাংবিধানিক গণ্ডী আপনার কণ্ঠকে স্তব্ধ করেনি। আপনার গাওয়া 'ছএধরের গান' এখন জঙ্গল মহলের ঘরে ঘরে। প্রত্যেকটি প্রতিরোধী আদিবাসী জনতার অনুপ্রেরণা আপনার গান। তাই এই প্রোহকালে আদিবাসী জনতা আরও বড় দায়িত্ব নেবার দাবী নিয়ে আপনার কাছে চিঠির মাধ্যমে আবেদন রাখছে।

বন্ধু,

আমরা শান্তিপ্রিয়, আমরা শান্তি চাই। এই পরিস্থিতিতে আপনার কাছে আমাদের আবেদন সংসদে আপনি জঙ্গলমহলের পক্ষে, ইউ.এ.পি.এ আইনের বিরুদ্ধে, যৌথবাহিনীর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে সোচ্চার হোন।

আমরাও আলোচনা চাই কিন্তু সম্মানজনক আলোচনা।

আমাদের ১৩দফা দাবীকে যথার্থ মর্যাদা দিয়ে মেনে নিতে হবে।

আন্দোলনের সমস্ত নেতা ও কর্মীদের নিঃর্শত মুক্তি দিতে হবে।

যৌথবাহিনী প্রত্যাহার করতে হবে।

হার্মাদদের ক্যাম্পগুলি ভেঙে দিতে হবে।

প্রকৃত উন্নয়ন প্রক্রিয়া শুরু করে জঙ্গলমহলে আলোচনার পরিবেশ তৈরী করতে হবে।

আমরা এই চিঠির মাধ্যমে আপনাকে আন্তরিকভাবে আবেদন করছি—আপনি উদ্যোগী হয়ে জনমত সংগঠিত করতে এগিয়ে আসুন। আমাদের দাবীগুলির ভিত্তিতে সরকারকে বাধ্য করুন আলোচনায় বসতে। প্রয়োজনে মধ্যস্থতা করুন। আমরা বিশ্বাস রাখি বাংলার প্রতিবাদী ও গণতান্ত্রিক জনমত আপনার পাশে থাকবে। আপনার বলিষ্ঠ হস্তক্ষেপের অপেক্ষায় রইল জঙ্গলমহলের জনগণ।

জল জোহার,

পুলিশী সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটি পক্ষে

লালমোহন টুডু,

অসিত মাহাতো

সন্তোষ পাত্র

৭/২/২০১০

কবীর সুমন ১৯/জি, বেঙ্গবাগান বাই লেন, কলকাতা ৭০০০৪৭

মাননীয়া
কুমারী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
সভানেত্রী
সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস

বিষয় : 'অপারেশন গ্রীন হান্ট'

মাননীয়া,

স্বাভাবিকতা বজায় রাখার কারণে আমি 'তুমি' বলেই সম্বোধন করছি।
আমাদের পরিচয় হয়েছিল গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে। আমি ছিলাম প্রথমে একজন টেলিভিশন অনুষ্ঠান সঞ্চালক, পরে, সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম বিষয়ে এক নাগাড়ে গণমুখী ও বামফ্রন্ট সরকারবিরোধী টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রচার করার কারণে আমার কাজ চলে যাওয়ায় (আমি বাধ্য হই চাকরি ছেড়ে দিতে) একজন গণ-আন্দোলনকারী। ভোট দাঁড়ানোর কোনও ইচ্ছে আমার কখনোই ছিল না। তুমি আমায় এই প্রস্তাব দেওয়ার পর থেকে আমি প্রবল আপত্তি করেছিলাম। আমি তোমায় আগাগোড়া বলেছিলাম যে আমি রাজনীতিক নই, রাজনীতিকরা যে ভাষায় কথা বলেন সেই ভাষায় আমি কথা বলি না। তুমি আমায় বলেছিলে 'বাংলার অত্যাচারিত মানুষের কথা তোমার মতো করে আর কে বলবে পার্লামেন্টে।' প্রায় এক বছর আমি আমার অসম্মতি জানিয়েছিলাম। শেষে, তোমার একটানা পীড়াপীড়ি আমার সম্মতি আদায় করে নেয়। আমি বরাবর স্বাধীনচেতা মানুষ। নিজের মত আমি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে অভ্যস্ত - কী মুখের কথায়, কী লেখার ভাষায়, কী গানের উচ্চারণে। আমার স্বভাব, বাকভঙ্গি ও মনোভাব সম্পর্কে তোমার মনে স্পষ্ট ধারণা থাকারই কথা। বাংলার 'সিভিল সোসাইটির' একজন প্রার্থী হিসেবে আমি তৃণমূলের প্রতীকচিহ্নে ভোটে দাঁড়িয়েছিলাম। প্রার্থী হিসেবে তুমি আমার নাম ঘোষণা করার পর আমি দলের সদস্যপদ গ্রহণ করেছিলাম। তোমার মনে থাকার কথা, সেই সন্ধেতেই তোমার অফিসে তুমি আমায় জিজ্ঞেস করেছিলে কোনও টেলিভিশন চ্যানেলে আমি আমার গায়ের জামা খুলে বলেছি কি না যে আমি মাওবাদী। আমি বলেছিলাম 'না।' তুমি আমায় বলেছিলে, 'দু'মাস তুমি একদম চুপ করে থেকো, তারপর তোমার যা খুশি ব'লো আর ক'রো।' - তোমাকে আমি একজন লড়াকু নেতা হিসেবেই চিনেছিলাম সি পি আই এমের বিরুদ্ধে এবং সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের সংগ্রামী জনগণের সমর্থনে আমাদের সম্মিলিত সংগ্রামে। আমি বুঝেছিলাম কোন্ স্পিরিটে তুমি কথাটা বলছ।
আমি মাওবাদী নই। কিন্তু মাওবাদীদের ওপরে নিষেধাজ্ঞা চাপানোর বিরুদ্ধে আমি। তেমনি, লালগড়ে পুলিশি অত্যাচার বিরোধী জনসাধারণের কমিটির সঙ্গে আমি সংহতিতে আছি। আমি গণ-আন্দোলনের লোক ও সাংস্কৃতিক কর্মী। আমাদের দেশের আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগণ স্বাধীনতার ৬২ বছর পরেও যে কী শোচনীয় অবস্থায় পড়ে আছেন তা আমরা জানি। ৮০'র দশকের মাঝামাঝি থেকে দেশের অর্থনীতির নব-উদারীকরণের মধ্য দিয়ে মুষ্টিমেয় ধনীদের হয়েছে ধনবৃদ্ধি, আর গরীব, প্রান্তিক মানুষ ও জনজাতিগুলি ক্রমান্বয়ে কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে। বৈষম্য দিনে দিনে বাড়ছে। উন্নয়ন কোথায়? আমি মনে করি না নকশালপন্থীরা দেশের নিরাপত্তার প্রধাণ দুষমণ। আমার ধারণা, ব্যাপক ক্ষুধা, অপুষ্টি, চিকিৎসার অভাব, শিক্ষার অভাব, কর্মসংস্থানের অভাব ভারতের আসল শত্রু। আমি একটি গান বেঁধেছিলাম : 'কিছুই পড়ে না পাতে/ তাই বন্দুক নিলে হাতে/ শালবনের দস্যি ছেলে/ এত সাহস কোথায় পেলে।' - ভারতের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে 'অপারেশন গ্রীন হান্ট' শুরু করেছেন, ইউ পি এ সরকারের সমর্থক হয়েও আমি তার বিরোধী। একই ভাবে আমি জংগলমহল বা আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে যৌথবাহিনী পাঠানোরও বিরোধী। একই তীব্রতায় বিরোধী আমি ইউ এ পি এ আইনের। 'হান্ট' বা শিকার শুরু হয়ে গিয়েছে। ভারতের একজন করদাতা নাগরিক, সংবেদনশীল স্বাধীনচেতা মানুষ ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমি আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি সংসদ ভবনের প্রবেশপথে নীরবে একটি কাগজ হাতে দাঁড়িয়ে থাকব। তাতে লেখা থাকবে 'Please stop the Operation Green Hunt & repeal the UAPA'। আমার প্রতিবাদ আমি এইভাবে সকলের গোচরে আনব। তোমাকে আমি আগেই জানিয়ে রাখলাম।

তোমার সুস্বাস্থ্য ও সাফল্য কামনা করছি।
শ্রেণীগত ও অন্যান্য শোষণবিরোধী গণ-আন্দোলন দীর্ঘজীবী হোক।

বিনীত
কবীর সুমন ১৮.০২.২০১০

কবীর সুমন ১৯/জি, বৈষ্ণবঘাটা বাই লেন, কলকাতা ৭০০০৪৭

মাননীয় শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ
মুখ্য সচেতক, তৃণমূল কংগ্রেস সংসদীয় দল

মাননীয় মহাশয়,

আপনার ১৯/০২/২০১০ তারিখের চিঠির জন্য ধন্যবাদ। আপনার প্রস্তাবকে মান্য করে আমি ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ তারিখ সংসদ ভবনের বাইরে অপারেশন গ্রীন হান্ট ও ইউ এ পি এ আইনের বিরুদ্ধে প্ল্যাকার্ড হাতে প্রতিবাদ জানানোর সিদ্ধান্ত আপাতত স্থগিত রাখলাম। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ : সংসদীয় দলের বৈঠক যেন যথাশীঘ্র সম্ভব ডাকা হয়। আপনি তো জানেনই অপারেশন গ্রীন হান্টের কারণে আমাদের দেশের আদিবাসী, প্রান্তিক ও দরিদ্র মানুষদের ওপর কী পরিমান অত্যাচার ও জোরজুলুম চলছে। আপনি মুখ্য সচেতক। আপনার প্রস্তাব এবং তৃণমূল কংগ্রেস দলকে সম্মান জানিয়ে আমি ২৩ তারিখে প্রতিবাদজ্ঞাপন থেকে বিরত থাকব। কিন্তু আপনাকে আমি স্পষ্ট জানিয়ে দিতে চাই সংসদীয় দলের বৈঠকে আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হলেও বা আমার মতের পক্ষে একজনও না থাকলেও আমি যে আঙ্গিকে প্রতিবাদ করব বলে ভেবেছি ঠিক সেইভাবেই প্রতিবাদ করব - সংসদ ভবনের বাইরে, নীরবে, প্ল্যাকার্ড হাতে। দীর্ঘকাল পৃথিবীর নানান গণ-আন্দোলনে অংশ নিয়ে, বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করে, কিছু আদর্শকে সামনে রেখে, ৬১ বছর বয়সে আমি মনে করি আমার প্রধান দায় আমার বিবেকের কাছে। আশা করি আপনারা বৈঠকটি তাড়াতাড়ি ডাকবেন - ৬ই মার্চের মধ্যে।

আমার শরীর ভাল নয়। ডাক্তারের নির্দেশে আমি সংসদ অধিবেশনে ঘনঘন উপস্থিত থাকতে পারব না। এ-জন্য আমি মার্জনাপ্রার্থী।

নমস্কার নেবেন,
কবীর সুমন
কবীর সুমন ১৯/০২/২০১০

KABIR SUMAN
Member of Parliament
(Lok Sabha)

19/G, Baishnabghata Bye Lane,
Kolkata - 700047
~~Phone~~: 24997777
FAX:

To
The Hon'ble Home Minister
Shri P. Chidambaram
Government of India

Sub: Lalmohan Tudu's Dead Body

Sir,

The dead body of Lalmohan Tudu, the late President of the People's Committee Against Police Atrocities, who was shot dead at his residence on February 22, 2010, by the Joint Security Forces, is still lying at the Jhargram Morgue, Jhargram, West Bengal.

According to reports I have gathered over the last few days, Lalmohan Tudu's wife is not being allowed to go from her village to Jhargram by the police. I find it painful and shameful, too, that the body of a citizen of our country is being allowed to rot away at a morgue and the police is not rendering any help to his relatives. In the name of humanism and democracy I am requesting you to take an adequate measure so Lalmohan Tudu's dead body is finally allowed the dignity of a proper cremation.

Thanking you,
Sincerely
Kabir Suman 01.03.2010
I.C. no 510

KABIR SUMAN
Member of Parliament
(Lok Sabha)

19/G, Barshnabghata Iye Lane,
Kolkata - 700047
Phone: 24997777

Shri Sudip Bandyopadhyay,
Hon'ble Member of Parliament
LOK Sabha
Chief Whip of the AITMC

9.3.2010

Dear Sudip,

I hope you know that there is still no indication from the police regarding Lalmohan Tudu's cremation. It is possible that the body of the President of the People's Committee Against Police Atrocities who was murdered in cold blood by the Joint Security Forces on 22 February, 2010, is still there at the Jhargram morgue, simply rotting away. I hope you also know from media reports that the dead body of another leader of the PCAPA, Phulmoni Murmu, was discovered yesterday at Lalgarh. To think that yesterday was the International Women's Day! There are reports that the Joint Security Forces are systematically terrorizing and brutalizing our tribal people at Lalgarh and maybe also in other areas. You know I wanted to stage a silent demonstration against the Operation Green Hunt at the Parliament Home entrance and I postponed the act because you asked me to attend an MP committee meeting first and explain my point. I had asked you to hold the meeting before 6 March. But then an MP Com Meeting had to summoned because of the party's stand on oil price hike. So I asked you to call for the OGH meeting ~~on~~ on a later date but before 15 March. Meanwhile, Kishenji has proposed my name as a mediator and I have communicated to you my willingness to mediate which, I think, would be a service to the nation. You sent me an sms saying we would talk when we meet.

Time is running out, dear Sudip, and our tribal people and marginalized people are suffering at the hands of the Joint Security Forces. Please take a stand and hold a meeting as soon as you can. Please let me know one day in advance so I can buy a ticket for Delhi.

Thanking you,
Sincerely,
Kabir Suman 9.3.2010

বাইরে গণতন্ত্র আর দলের অন্দরে একনায়কতন্ত্র

কোনও সুস্থ ব্যবস্থার পরিচয় হতে পারে না